গ্রীক দর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার

মোহাম্মদ আবদুল হালিম

গ্রীক দর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার

মোহাম্মদ আবদুল হালিম

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৮২
[মে, ১৯৭৫]

বাএ ৬৩৪

প্রকাশনা
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা—২

মুদ্রণ
ইউনিক প্রিন্টার্স
৪২/২, আজিমপুর
ঢাকা—৯

প্রচ্ছদ
কাজী আবুল কাসেম

মূল্য : তের টাকা মাত্র।

Greek Darshan : Pragna-O-Prasar (Greek Philosophy : Its Wisdom & Extension) by Mohammad Abdul Halim ; Published by Fazle Rabbi, Bangla Academy, Dacca, Bangladesh ; Ist Edition, 1975. Price : Taka Thirteen only.

আমার পিতা

জনাব অধ্যাপক আবত্বর রশীদ সাহেব

যাঁর স্নিগ্ধ-দাক্ষিণ্যে আমার জীবন গতিময় ;

আমার প্রথম প্রচেষ্টাও

তাঁর স্নেহধন্য হ'ক।

ভূমিকা

জ্ঞানচর্চায় মাতৃভাষা প্রাধান্য পাওয়ার ফলে সম্প্রতি বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চার প্রবণতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। অথচ পাশ্চাত্য ও গ্রীক দর্শনের উপর নির্ভরশীল কোন পুস্তক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় নি এবং এই বিষয়ে কোন মৌলিক রচনাও বাংলা ভাষায় নেই।

দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতে গিয়ে আমি এসব সমস্যা আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে গ্রীক দর্শন অন্তর্ভুক্ত, অথচ বাংলা ভাষায় এবিষয়ে কোন গ্রন্থ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা অসুবিধার সম্মুখীন হন। এসব দিক চিন্তা করে, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রীক দর্শনের রূপ রেখা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রধানতঃ ছাত্রদের সমস্যাকে সামনে রেখেই এই গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কোন মৌলিক দর্শন গবেষণার দাবীও এ গ্রন্থকারের নেই। অনেক মণীষী লেখকের গ্রন্থ থেকে এর উপাদান আহরণ করা হয়েছে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সে সব প্রাজ্ঞ-দার্শনিকদের আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সিলেট সরকারী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক জনাব আবুল বশর ও শাহজাহান মনির সাহেবকে—যাঁরা এ পাণ্ডুলিপি পড়ে গ্রন্থটির ভাষা ও অঙ্গসৌষ্ঠবে আমাকে সাহায্য করেছেন। এ গ্রন্থ রচনায় যাঁরা আমাকে বিপুলভাবে উৎসাহ ও অণুপ্রেরণা যুগিয়েছেন—তাঁরা হলেন, সিলেট সরকারী মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ, জনাব মোহাম্মদ আলী ; চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ, জনাব মতিয়ুর রহমান ; কারমাইকেল সরকারী মহাবিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক, জনাব ছদর উদ্দীন ও আমার অগ্রজ বরিশাল সরকারী মহাবিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ।

[এক]

আমার প্রাত্যহিক জীবনের সবকিছুর সমভাগী অধ্যাপিকা সাহ্ওয়ার হালিম এ-গ্রন্থ রচনায়, বিশেষ করে পরিশোধন ও পরিমার্জন ব্যাপারে অহরহ সাহায্য দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে জিয়াউল হক (ইকবাল), সমিক জাহান চৌধুরী এবং আমার স্নেহভাজন ছাত্র নৃপেন্দ্র লাল দাস উল্লেখ্য। এ গ্রন্থের নামকরণ, অণুলেখন থেকে শুরু করে ভাষা-বিন্যাস ইত্যাদি বিবিধ কাজে তাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই সাহেবের পরামর্শ ও উপদেশাবলী আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

আশা করি প্রাথমিক প্রচেষ্টার দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটিকে পাঠক সমাজ সহানুভূতি ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পরিশেষে, যাদের জন্যে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে, তারা যদি উপকৃত হন, তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

বিনীত

মোহাম্মদ আবদুল হালিম

সিলেট সরকারী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ
৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১-১৫
আইওনীয় দর্শন	৭
থেলিস	৭
এ্যানাক্সিমেণ্ডার	১০
এ্যানাক্সিমিনিস	১৩
আইওনীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য দার্শনিক	১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলিয়াটিক্স্ সম্প্রদায়	১৬-২৯
জেনোফিনিস	১৬
পারমানাইডিস	১৮
জেনো	২৩
ইলিয়াটিক্স্ শাখার মূল্যনিরূপণ	২৭

তৃতীয় অধ্যায়

কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক	৩০-৪৬
হিরাক্লিটাস	৩০
পীথাগোরাস	৩৪
এমপিডকলেস	৪১

চতুর্থ অধ্যায়

এ্যানাক্সেগোরাস এবং পরমাণুবাদ	৪৭-৫৯
এ্যানাক্সেগোরাস	৪৭
পরমাণুবাদ	৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

তার্কিক সম্প্রদায় এবং সক্রেটিস	৬০-৮৬
সফিষ্টস বা তার্কিক সম্প্রদায়	৬০
সক্রেটিস	৭০

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্ধ সক্রেটিকস সম্প্রদায়	৮৭-৯২
এন্টিসথেনিস বা বৈরাগ্যবাদ	৮৭
আত্মসুখবাদ বা আত্মআনন্দবাদ	৮৯
এরিস্টপপাস	৮৯
মিগারা সম্প্রদায়	৯১
ইউক্লিড	৯১

সপ্তম অধ্যায়

চিন্তার প্রাধান্য (ভাববাদ)	৯৩—১৫৯
প্লেটো	৯৩
জীবনী ও গ্রন্থাবলী	৯৩
জ্ঞান-মতবাদ	৯৭
জড়বিজ্ঞান বা অস্তিত্ববাদ	১১৪
স্থূলজগতের মতবাদ	১১৪
মানবাত্মার মতবাদ	১১৭

নীতি বিজ্ঞান ১১৯
রাষ্ট্র ১২২
আর্ট বা শিল্প ১২৪
এরিস্টোটল ১২৫
যুক্তিবিগ্ধা বা তর্কশাস্ত্র ১২৬
আধ্যাত্মদর্শন ১২৭
জড়বিজ্ঞান বা প্রকৃতি দর্শন ১৪০
নীতি বিজ্ঞান ১৫১
রাষ্ট্র ১৫৪
সৌন্দর্য-বিজ্ঞান বা শিল্প মতবাদ ১৫৫

অষ্টম অধ্যায়
এপিকিউরিয়ান ১৫৯—১৬২

নবম অধ্যায়
ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য ১৬৩—১৬৯
বৈরাগ্য দর্শন ঃ জেনো ১৬৩
সংশয়বাদ ঃ পির্হো ১৬৮

দশম অধ্যায়
সাম্প্রদায়িক সংশয়বাদ ১৭০—১৭২
নব একাডেমী ১৭০
আর্কিসিলিয়াস ১৭০
কার্নিয়াডিজ ১৭০
পরবর্তী সংশয়বাদ ঃ ইনিসিডিমাস ও এগ্রিপা ১৭১

একাদশ অধ্যায়
বৈজ্ঞানিক আন্দোলন ১৭৩—১৯৬

ধর্মীয় আন্দোলন	১৭৬
মিশ্র দর্শন	১৭৬
নব্য প্লেটোবাদ	১৮২
প্লটিনাস	১৮৩
ঈশ্বর	১৮৩
সত্তার অবস্থাত্রয়	১৮৫
নীতিবিজ্ঞান	১৮৮
পরফিরি	১৮৯
যামব্লিকাস ও প্রোক্লাস	১৯২
গ্রন্থপঞ্জী	১৯৭—১৯৮
পরিভাষা	১৯৯—২১৬

গ্রীক দর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার

প্রথম অধ্যায়

গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানুষের প্রশ্নার্ত জিজ্ঞাসার উৎস থেকেই একদিন দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল ইতিহাসের এক ধূসরযুগে। ধর্মের নির্মোক ভেঙে, বুদ্ধির শাণিত অসিতে বস্তু-বলয়িত জ্ঞানের বিচিত্র-সম্ভাবনাময় বর্ণবিলাসকে বিজ্ঞানমুখী করে দর্শন তার যাত্রা শুরু করেছিল।

আজকে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চরম ক্রান্তিকালে এসেও দর্শন আমাদের কাছে তার স্বকীয় মহিমায় দীপ্র এবং স্ব-বৈশিষ্ট্যে বহমান। একটা ঐতিহাসিক ক্রমধারার মধ্যদিয়ে এসেছে বলে দর্শনশাস্ত্রের বিকাশ বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক জীবন চর্যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে।

বিভিন্নযুগে বিভিন্ন দার্শনিক আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের বোধ ও প্রজ্ঞার প্রসার করে গিয়েছেন। এই বিভিন্ন প্রচেষ্টার একটা ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্যেই দর্শন ইতিহাসের সার্থকতা নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক জগতকে এবং উপলব্ধিময় সত্তাকে মানুষের বোধগম্য করে তোলাই দর্শনের প্রধান উপজীব্য।

দর্শন-ইতিহাস চিন্তার প্রাথমিক সরণী বেয়ে এসে বর্তমান প্রজ্ঞার প্রাচীর প্রান্তে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যেই তার উন্নতির রেখাচিত্রও সুস্পষ্ট কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এ শুধুমাত্র ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দর্শন-ইতিহাস বলতে বুঝায়ঃ বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, বিভিন্ন চিন্তানায়কের অনুধাবন ও মননের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণাসমূহের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করা। ভূত, ভবিষৎ ও বর্তমানের ধর্মীয়, বৌদ্ধিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্রে সন্নিবেশিত করা, বিশেষ যুগের বিশেষ চিন্তাধারাকে চিহ্নিত করা দর্শন-ইতিহাসের কাজ। এটা মানব প্রজ্ঞার রেখাচিত্র।

ইতিহাস পাঠ দর্শন-চিন্তার প্রাথমিক পাঠ। ইতিহাসের ক্রম-বিকাশের ধারায় আমরা জানতে পারি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা যে ছিটেফোঁটা মুক্তবুদ্ধির আলোকে প্রথম জীবন-জগতের রহস্য উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয়ে ছিলেন তা মোটেই হাস্যকর নয়।

সত্তা সম্পর্কীয় সাধারণ ধারণাগুলো কি করে পরে জটিল ধারণার চিন্তারূপ সৃষ্টি করে একটা অমূর্ত ধারণার জন্ম দিল তা ইতিহাস পাঠেরই ফলশ্রুতি। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র দর্শনের ইতিহাসের পক্ষেই সম্ভব। যদি কোন ব্যক্তি পূর্ববর্তী দর্শনচিন্তাকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে একটা দর্শন পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তা তিনি কখনও পারবেন না। কারণ সভ্যতার প্রাথমিক স্তরের অস্পষ্ট মতবাদগুলোকে বাদ দিয়ে তিনি এগোতে পারবেননা।

ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শন আদিতে একাকার হয়ে অবস্থান করতো। বিভিন্ন ধর্মীয়, পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীগুলিই ছিল জগৎ ও জীবনকে জানার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। মানুষ কিভাবে তার স্থূল অভিজ্ঞতা দ্বারা এই বিশ্বের ব্যাখ্যা করে, রূপকথাগুলো যেন তারই ইতিকথা। মানুষ তার স্বীয় গঠনপ্রকৃতির বিভিন্ন রূপায়ণে এক মহান ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি খুঁজে বের করে। এটা গোষ্ঠীগত চিন্তার ফসল।

ক্রমপরিণতির ধারার এইসব লৌকিক পৌরাণিক রূপকথার খোলস ছেড়ে দর্শন আপন রূপ পরিগ্রহ করে। ইতিহাসের আলোকেই আমরা জানতে পারি যে, প্রাচ্যে হিন্দু, মিসরীয় ও চীনা দর্শনের মধ্যেও কেবল রূপকথা ও নৈতিক উপদেশই বিদ্যমান ছিল। তারাও কোন সুষ্ঠু দার্শনিক চিন্তা দিয়ে যেতে পারেননি। কবিতা ও হেঁয়ালীর চোরাবালিতেই প্রাচ্য দর্শন বহুকাল ব্যত্তায়িত হয়েছে। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও মনীষীরা অনেকটা অগ্রগামী ছিলেন।

আমাদের সমীক্ষা প্রথমেই গ্রীক দর্শন দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। যে লোকদের দর্শন আমরা এবারে পাঠ করতে যাচ্ছি তারা গ্রীসের পার্বত্য উপদ্বীপ অঞ্চলের অধিবাসী। এটা এমন এক দেশ যার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে স্বভাবতঃই শক্তিশালী ও কর্মঠ জাতিতে পরিণত করেছে। দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ তাদের দক্ষ নাবিক ও বণিক হতে সহায়তা করেছে। দ্বীপবাসী হওয়ায় তারা অনেকটা যাযাবরের মতো বাস করতো। ফলে গ্রীকরা উপনিবেশ বিস্তার

করেছিলো এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী মিসর, সিসিলি, দক্ষিণ ইতালী প্রভৃতি ভূখণ্ডে। এইসব উপনিবেশে অবাধ যাতায়াতের ফলে তারা ঐসব দেশের সামাজিক রীতিনীতি ধর্মীয় আচার ব্যবহার ইত্যাদি সহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় এবং ঐসব দেশের রাজনীতি অর্থনীতির উপর গ্রীক প্রভাব দ্রুত কার্যকরী হয়।

প্রাকৃতিক প্রভাব ও তীক্ষ্ণ মননশীলতার জন্যে গ্রীসীয় সভ্যতা এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ মানুষের প্রভাব ও সংকল্পকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে এক উদার বোধ, অনুসন্ধানী প্রবৃত্তি ও জিজ্ঞাসু প্রবণতার মাধ্যমে ত্বরান্বিত করে তোলে। ফলে মানবপ্রজ্ঞা এক সুষম একক ব্যক্তিত্বমুখী হয়ে উঠে।

এই সংগ্রাম বহুল প্রাকৃতিক পরিবেশ গ্রীসের জনগণকে যেমন সংগ্রামী করেছে, তেমনি করেছে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অমিতশক্তি, উদার উচ্চাশা সম্পন্ন এবং জ্ঞানানুরাগ ও সৌন্দর্য অনুভূতি তাঁদেরকে সংবেদনশীল মনন পরীক্ষার জন্যে উৎসাহী করে তোলে। ফলে ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে তারা অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে এই হেলেনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো মূল ভূখণ্ড ও উপনিবেশগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি জনপদেই প্রথমে গোষ্ঠীতন্ত্রের বিকাশ হয়। এই গোষ্ঠীতন্ত্র থেকেই আস্তে আস্তে রূপ লাভ করে অভিজাততন্ত্র। অভিজাততন্ত্রগুলো 'কালক্রমে বিবর্তনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের আদিরূপ পরিগ্রহ করে। মহাকবি হোমারের মহাকাব্য গুলোতে যে সামাজিক বর্ণনা পাওয়া যায় তা একটা জাতি, বর্ণ বা গোষ্ঠীর বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় সমস্ত জনপদের সম্পদ আর সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এরাই অভিজাত-তন্ত্র গঠন করে। পরবর্তীকালে এই অভিজাততন্ত্রই সরকারের রূপ পরিগ্রহ করে। পরে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে নাগরিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই নাগরিকশ্রেণী খ্রীস্ট পূর্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে

অভিজাততন্ত্রের নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ ও কলহ শুরু করে। তাদের মধ্যে যারা সাহসী ও কর্মযোগী ছিল, তারাই পরবর্তীকালে অভিজাত-তন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, এবং দেশ পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তারাই গণতন্ত্রের আদি উদ্গাতা বা জন্মদাতা।

গ্রীকরা তাদের সংস্কৃতির মধ্যেও সৃজনশীল মানবপ্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখে গেছে। জড় রীতিনীতির সমালোচনা ও নতুন চিন্তাধারা প্রচারের মাধ্যমে এক প্রগতিবাদী সাহিত্য ও শিল্পেরও পরিচর্য্যা করে। খ্রীস্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাসে যুগের নতুন ভাবনা ও বিশাল জীবনচিন্তা প্রকাশ পায়। হোমারের কালজয়ী মহাকাব্যে যে বস্তুনিষ্ঠ জীবনচর্যা ও আনন্দের অন্তহীন উৎসধারা বাহিত হতে আরম্ভ করলো, তা শিশুসুলভ রূপকথা ও কিংবদন্তীর মধ্যে আবদ্ধ মানুষের অভিজ্ঞতাগুলোকে নিঃশেষ করে দিল। লোপ পেলো অনেক কুসংস্কার। এখানে মহাকবি হোমারকে আশাবাদী তীক্ষ্ণ সমালোচক খুব বেশী আত্মগত হতে দেখা যায়। হোমারে আমরা প্রায়শই মানব-চরিত্রের নৈতিক উপদেশাবলীর সমাবেশ দেখতে পাই। তিনি মানুষের দুঃখ বেদনাকে তাৎক্ষণিক অনুভবের দ্বারা প্রকাশ করে গেছেন। যেখানে তাঁকে একজন উপদেষ্টা রূপে দেখতে পাই।

প্রকৃতপক্ষে এসময় থেকেই মানুষ মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হতে আরম্ভ করেছে। পুরোনো বিশ্বাস জড় সংস্কার সবকিছুকে ঝেড়ে ফেলে মানুষ পারিপার্শ্বিক সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও নীতিজ্ঞানের পাথেয়কে সঙ্গে করে এসে উত্তরণ করেছে স্বকীয় চিন্তার রাজ্যে। যেখানে সে তার নিজের মতবাদ ও মননকে প্রতিষ্ঠা করতে উৎসুক। এভাবেই মানব প্রজ্ঞা ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন লৌকিক জ্ঞানের ভেতর দিয়ে ক্রমে 'দর্শন'-এ রূপ নেয়ার চেষ্টা করেছে। এভাবেই দর্শন তার আপন রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকেও অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করেছে। ঐতিহাসিক অভিমত ঃ গ্রীক দর্শনকে ভিত্তি করেই আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে। দর্শন-ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ প্রাচীন গ্রীক দর্শন, দ্বিতীয়তঃ

মধ্যযুগীয় ক্রীশ্চান দর্শন ও তৃতীয়তঃ আধুনিক দর্শন।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ভিত্তিভূমি হলো ঃ

(ক) দার্শনিকদের রচনাবলী, অভাবে রচনার খণ্ডাংশ।

(খ) এসবের অভাবে দার্শনিকদের শিষ্যদের রচনাবলীতে যে সব দুষ্প্রাপ্য দর্শন-চিন্তা পাওয়া যায় সেগুলো। তাছাড়া

(গ) সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতির গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ধারণাবলী।

খ্রীস্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতক থেকে ৫২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন যুগ বা গ্রীক দর্শনের যুগের বিস্তৃতি।

গ্রীক দর্শনের যুগকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) আদিযুগ—(Pre Socratic Period)

(২) মধ্যযুগ—(Socrate to Aristotle)

(৩) অন্তযুগ—(After Aristotle)

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক থেলিস (Thales), এ্যানাক্সিমেনডার (Anaximander) এবং এ্যানাক্সিমিনিস (Anaximenes) একই মিলিশিয়ান দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাহ্যজগতের মূল রহস্য সন্ধানে এই তিন দার্শনিক তিনটি মতবাদ প্রচার করেন। দৃষ্টিগ্রাহ্য পৃথিবীর মূল উপাদান কি, এর উত্তরে থেলিস বলেন 'পানি', এ্যানাক্সিমিনিস বলেন' বায়ু', এবং এ্যানাক্সিমিডাস বলেন এর নির্দিষ্ট কোন আকার নেই; তিনি তার নাম দিলেন সীমাহীন (Boundless)।

এদের পরবর্তী দার্শনিক পিথাগোরাসের (Pythagoras) মতে সংখ্যাই (Number) হচ্ছে যাবতীয় দ্রব্যের ও বাহ্যজগতের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসের মূলতত্ত্ব। হিরাক্লিটাস (Heraclitus), পারমেনাইডিস (Parmenides) ও ইলিয়েটিক (Eleatic) দার্শনিকগণ জাগতিক পরিবর্তনকে দর্শনের মৌলিক চিন্তার অন্তর্ভুক্ত করেন্। গ্রীসের কূটতার্কিক বা সফিস্ট (Sophists) মানুষের জ্ঞান ও আচরণের সমস্যার প্রতি মনোযোগী হয়ে একটা নতুন দর্শনচিন্তার সূচনা করেন। প্রটেগোরাস একজন খ্যাতনামা সফিস্ট। তিনি বলেন, মানুষ নিজেই সবকিছুর মাপকাঠি। খ্রীস্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

এরা সংশয়বাদী ছিলেন।

সফিস্ট আন্দোলনের যুগেই মহামতি সক্রেটিসের আবির্ভাব। খ্রীস্ট পূর্ব ৪২০ থেকে ৩২০ খ্রীস্ট পূর্ব সক্রেটিস যুগ। 'আপনকে জানো' এই ছিল তাঁর নীতি। 'প্রত্যয়' থেকে সমস্ত জ্ঞান উদ্ভব হয়, সংবেদন থেকে নয়। এই 'প্রত্যয়ই' প্লেটোর ধারণা (Idea)। সক্রেটিসের প্রত্যয়কে ভিত্তি করেই প্লেটো তাঁর সামান্যবাদ (theory of Ideas) প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। আবার এরিস্টোটল প্লেটোর সমান্যবাদ গ্রহণ করেননি। তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন 'বিশেষের' উপর। বিশেষকে (particulur) তিনি সত্য বলে গ্রহণ করে আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে সামান্যে (universal) উপনীত হয়েছেন। এরিস্টোটলের রচনার ব্যাপকতা বহুদূরে বিস্তৃত। অভিজ্ঞতার জগতে সবকিছুই তাঁর দৃষ্টির দিগন্তে ধরা পড়েছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি তাঁর আলোচনায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে গ্রীকদর্শনের শেষ যুগ হলো এরিস্টেটল পরবর্তী দর্শনযুগ। খ্রীস্ট পূর্ব ৩২০ থেকে ৫২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। এথেন্স, রোম, আলেকজান্দ্রিয়া এই দার্শনিকদের কেন্দ্রস্থল। ধর্মীয় ও নৈতিক এই দুই ধারায় তখন দর্শনচিন্তা আলোচিত হতে আরম্ভ করে। সততাই মানব জীবনের পরমার্থ এই নীতিতে জেনো (Zeno) স্টোয়িক (Stoic) দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। এপিকিউরিয়াস (Epicurius) সুখ মানুষের একমাত্র কাম্য বলে এপিকিউরীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। এপিকিউরীয় দার্শনিকবৃন্দ জড়বাদী (Materialistic) এবং যান্ত্রিকতা-বাদী (Mechanistic)। স্টোয়িকদের মতে জগৎ স্থিত প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের প্রকাশ।

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্লেটোনিকবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রজ্ঞা যখন কল্পনার উপর প্রভাব বা আধিপত্য বিস্তার করে তখনই দর্শনের উদ্ভব হয়। স্বাধীন নিরপেক্ষভাবে প্রজ্ঞার কষ্টিপাথরে যাঁচাই করে বিজ্ঞের মত বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করাই হলো দর্শনের কাজ। গ্রীকদর্শনে দার্শনিকদের এই মহান ধর্মের প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়। বস্তুর উৎপত্তি বিশ্লেষণে এভাবে গ্রীকদের দ্বারা প্রাথমিক

প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও তাঁদের যুক্তিতে অসঙ্গতি ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা খুবই স্পষ্ট, তবু প্রাথমিকভাবে জীবনজগতকে জানার এ আগ্রহকে কোনভাবেই হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এদের এ প্রাথমিক চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই আজকের বৈজ্ঞানিক দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

আইওনীয় দর্শন (The Ionics)

এশিয়া মাইনরের দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে আইওনিয়া নামক দ্বীপে তিনজন বিখ্যাত দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। এই তিন দার্শনিক হলেন, থেলিস (Thales), এ্যানাক্সিমেন্ডার (Anaximander) ও এ্যানাক্সিমিনিস (Anaximenes)। এই তিন প্রাজ্ঞ পুরুষই গ্রীক-দর্শনের আদি প্রবক্তা। তাঁরা আইওনীয়ার অধিবাসী ছিলেন বলে পরবর্তীকালে তাঁদের দর্শন-মতবাদকে আইওনীয় স্কুল বা আইওনীয় দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। এই তিনজনই গ্রীকদর্শনের আদি পথিকৃৎ।

তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের পথে আজকের সূক্ষ্ম-দর্শন চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। তাই তাঁদের দর্শন আলোচনা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য।

থেলিস (Thales)

থেলিস দর্শনশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক ও আদিজনক। খ্রীস্ট পূর্ব ৬২৪ অব্দে থেলিসের জন্ম ও ৫৫০ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। থেলিস সুবিখ্যাত সলোন (Solon) ও ক্রসাসের (Croess) সমসাময়িক। অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি মিসর দেশে গিয়ে সেখানে জ্যামিতি অধ্যয়ন করেন। ইউক্লিড (Euclid)-এর জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়ে যে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা স্থান পেয়েছে তার কতিপয় প্রতিজ্ঞা থেলিসের নিকট পরিচিত ছিল বলে কথিত হয়। খ্রীস্ট পূর্ব ৫৮৫ অব্দে মে মাসে যে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়, তা তিনি পূর্ব থেকে দিন গুণে বলে দিয়েছিলেন। এ থেকেই জ্যোতিবিদ্যায় তাঁর

পারদর্শিতার কথা কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি একজন প্রকৌশলী রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কথিত আছে যে, ক্রসাস ও তার সৈন্যসামন্ত যাতে নদী অতিক্রম করে না আসতে পারে সেজন্য তিনি হেলিস্ (Halys) নদীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

এরিস্টোটল অবধি থেলিসের কোন লেখা পাওয়া যায়নি। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, সম্ভবতঃ তিনি কিছু লিখেননি। থেলিসের দর্শন মোটামুটি দু'টি প্রতিজ্ঞার (Propositions) উপর ভিত্তি করে আছে। প্রথমতঃ তিনি মনে করেন যে, পানি (Water) সমস্ত দ্রব্যের মূল ও আদি কারণ। দ্বিতীয়তঃ জগৎ হচ্ছে একটি ভাসমান চেপটা থাকার ন্যায় পানি থেকে সব কিছুর উৎপত্তি এবং পানিতেই সবকিছু বিলীন হচ্ছে। পৃথিবী মহাসমুদ্রে ভাসমান থেকে পানি হতে প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই পানির নানা রূপান্তর মাত্র। জগতের যে-সমস্ত দ্রব্য আমাদের গোচরীভূত হচ্ছে তার মধ্যে পানির গুণ এই যে, কঠিন তরল ও বায়বীয়, এ তিন-রকম অবস্থা পানি অতি সহজেই ধারণ করতে পারে। পানি কখনও বাষ্প হচ্ছে, কখনও বা জমে বরফ হচ্ছে। নদী, হ্রদ ইত্যাদি জলাশয় গ্রীষ্মকালে শুকোতে থাকে, বর্ষায় আবার প্লাবিত হয়। এ ছাড়াও সমুদ্রবক্ষে দ্বীপের উৎপত্তি, নদীগর্ভে নতুন ভূভা-গের সৃষ্টি, ভূমিকম্পে জলরাশির আবির্ভাব ও তিরোভাব এই সমস্ত ঘটনা পানির ক্রিয়ারূপেই গণ্য হচ্ছে। বস্তুতঃ পানিই সৃষ্টির মূল উপাদান। বস্তুমাত্রই পানির অবস্থাভেদে উৎপন্ন। পানিই যে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির উৎস, পানিই যে দ্রব্যের মূল ও আদি উপা-দান, বস্তুতঃ এটাই হল থেলিসের দর্শন ও বিজ্ঞানসম্মত মতামত।

এখানে স্বভাবতঃই দুটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে—প্রথমতঃ থেলিস কেন পানিকেই মূল এবং আদি উপাদান বলেন, দ্বিতীয়তঃ কি উপায় বা প্রক্রিয়াতে পানির রূপান্তর ঘটে। এই প্রশ্নগুলোর কোন নিশ্চিত উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। এরিস্টোটল বলেন, সম্ভবতঃ

সমস্ত বস্তুর মধ্যে জলীয় অংশটুকু দেখে থেলিস তাঁর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাদের উৎপত্তি পানি থেকে এবং পানিই এ প্রাণীজগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সব দ্রব্যের মূলে রয়েছে আর্দ্রতা এবং পানিই হচ্ছে আর্দ্রতার মূল কারণ। এই হল এরিস্টোটলের বিশ্লেষণ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এরিস্টোটল "সম্ভবতঃ" কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং এ সম্ভাব্যতার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিভাবে যে পানি হতে জগতের উৎপত্তি তার কোন যথার্থ ব্যাখ্যা থেলিস দিতে পারেননি। সম্ভবতঃ এরূপ ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি কোনদিন চিন্তাও করেননি।

প্রশ্ন হতে পারে কেন এই অস্পষ্ট ও অপরিপক্ক দর্শনের জন্যে থেলিসকে দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও আদিজনক বলা হবে? স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে, থেলিসের প্রকৃত মূল্য তাঁর পানি দর্শনের (Water Philosophy) জন্যে নয়। কোন রূপক বা গল্পের আশ্রয় না নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা প্রদানের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। থেলিস এ সমস্যা প্রথম উত্থাপন করে দর্শনের পথ ও গঠন প্রণালীর সূত্রপাত করেন। জগতের বহুবিধ প্রকাশের মধ্যেও যে এক আদিসত্তা লুকায়িত আছে এ ধারণা থেলিসের যুগে অত্যন্ত প্রবল ছিল। থেলিস থেকে এ্যানাক্সেগোরাস (Anaxagoras) পর্যন্ত সব দার্শনিকের সমস্যা ছিল এই আদিসত্তার স্বরূপ জানা, যা থেকে সমস্ত বস্তুর উদ্ভব। থেলিসের মতে পানিই হচ্ছে সেই আদিসত্তা। এ্যানাক্সেমেনডারের মতে সেই আদিসত্তা হচ্ছে অফুরন্ত বস্তু, এ্যানাক্সিমিনিসের মতে তা হচ্ছে বায়ু (Air), পীথাগোরাসের নিকট তা হচ্ছে সংখ্যা (Numbers), হিরাক্লিটাসের নিকট তা অগ্নি (Fire), এমপিডকলেসের কাছে তা হচ্ছে চার জাতীয় উপাদান (Four elements) এবং ডেমক্রিটাসের নিকট তা হচ্ছে পরমাণু (Atom)। এই ভাবে দেখা যায় যে, দর্শন ক্রমে বিশ্বতত্ত্ব হয়ে পড়ছে। বস্তুতঃ থেলিসই এই বিশ্বতত্ত্ব বিদ্যার প্রথম উদ্গাতা। থেলিসের গুরুত্ব দর্শন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রথম প্রশ্ন উত্থাপনকারী হিসেবে, দর্শনের যথাযথ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা সমস্যা সমাধানের জন্যে নয়।

মানুষ স্বভাবতঃই জড়বাদী। দর্শন হল ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয় চিন্তার একটা প্রবহমান গতি। অর্থাৎ জড় থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। থেলিস পানিকে আদিসত্তা বলার অর্থ হল জগতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেকে ইন্দ্রিয়মুক্ত করতে পারেন নি। শুধু থেলিসই কেন, আইওনীয় কোন দার্শনিকই নিজকে ইন্দ্রিয়মুক্ত করে অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানে উপনীত হতে পারেন নি। তবে একথা সত্য যে, এই ইন্দ্রিয় বা জড়কে কেন্দ্র করেই অতীন্দ্রিয় চিন্তার একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আইওনীয় সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়বাদের ধারাকে অনুসরণ করেই আমরা প্লেটো ও এরিস্টোটলের অতি উচ্চ অতীন্দ্রিয়বাদে পোঁছিতে পারি। দর্শন কতকগুলো আজে বাজে সূত্র বা খাপছাড়া মতামতের সমন্বয় নয়। দর্শন হ'ল অভিব্যক্তিবাদের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ যার প্রতিটি সোপান কালের অগ্রগতির তালে তালে বস্তু নতুন গুণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। উদ্দেশ্যটা (End) যদিও আমাদের নিকট এখন কিছুটা বোধগম্য মনে হচ্ছে, প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌দের নিকট কিন্তু তাই তখন অত্যন্ত দুর্বোধ্য ছিল।

গ্রীকদর্শনের প্রথম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা কেবল প্রকৃতি (Nature) এবং বহির্জগত (External world) দিয়েই ব্যস্ত। প্রকৃতির স্বরূপত্ব এবং এতে মানুষের ভূমিকা কতখানি, শুধু এ প্রশ্নই দর্শনের আলোচ্য বিষয় ছিল। মানব সমস্যা, এবং মানব ভাগ্য এবং মানবের নীতিজ্ঞান এইসব প্রশ্নের আলোচনা তারা খুব কম করেছে বা আদৌ করেনি। সফিস্টদের আগমনপূর্ব পর্যন্ত এসব সমস্যার কোন আলোচনা হয় নি। সফিস্টগণ এসে এসব সমস্যার আলোচনার মাধ্যমে গড়ে তোলে গ্রীক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আইওনীয় দার্শনিকগণ সবাইজড়বাদী। এ জন্য অনেক সময় তাদেরকে হিলোসিস্টস্ (Hylicists) বা জড়বাদী বলা হয়। গ্রীক হিউল (Hule) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বস্তু বা জড়।

এ্যানাক্সিমেনডার (Anaximander)

আইওনীয় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় দার্শনিক এ্যানাক্সিমেন্‌ডার। তিনি সাহসী মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন। সম্ভবতঃ খ্রীস্ট পূর্ব ৬১১ অব্দে তাঁর

জন্ম ও ৫৪৭ অব্দে তাঁর মৃত্যু। তিনি মাইলটাসের (Miletus) অধিবাসী এবং থেলিসের শিষ্য। তবে থেলিসের প্রায় এক যুগ পরে তাঁর আবির্ভাব। তিনি দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তাঁর কোন প্রবন্ধই এখন আমাদের হাতে নেই। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ভূগোলের মানচিত্র তিনিই প্রথম অঙ্কন করেন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে এরচেয়ে বেশী কিছু জানা যায়নি।

বিশ্ব জগতের আদিসত্তার নাম করতে গিয়ে থেলিস পানির কথা উল্লেখ করেছেন। জড় বা বস্তুই যে জগতের আদিসত্তা থেলিসের এই মতবাদের সাথে এ্যানাক্সিমেনডার একমত। তবে থেলিস যেখানে পানিকে আদিসত্তা বলে মনে করেন, এ্যানাক্সিমেনডার তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সৃষ্টির আদি উপাদান সলিল বা এজাতীয় কোন দ্রব্য নয়, এ এক অনন্ত অবিনশ্বর, অতীন্দ্রিয় এক অফুরন্ত বস্তু। সাধারণতঃ বস্তু বলতে আমরা কোন এক নির্দিষ্ট বস্তুকে বুঝি। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কেবল গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। এ্যানাক্সিমেনডারের আদিসত্তা যথার্থ বস্তু নিরাকর ও বৈশিষ্ট্যহীন। গুণগতভাবে অনির্দিষ্ট হওয়ায় পরিমাণেও অসংখ্য। এ্যানাক্সিমেনডার মনে করেন যে, এ বস্তু মহাশূন্যে অনন্তভাবে বিস্তৃত। আদিবস্তু অসীম, কারণ সীমিত হলে অসংখ্য পৃথিবীর সৃষ্টি ও লয়ের ভেতর দিয়ে তা এতদিনে শেষ হয়ে যেত। অগণনীয় পৃথিবীর (Innumberable worlds) প্রচলিত মত হিসাবে তিনি স্বীকার করেন যে, পৃথিবীগুলো একের পর এক আবির্ভূত হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে সৃষ্টি হয় এক পৃথিবীর। তার পর ঘটে তার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়েই ঘটে তার ক্ষয় এবং এ ক্ষয় থেকে ধীরে ধীরে ঘটে পৃথিবীর বিনাস বা লয়। এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে সৃষ্টি হয় অন্য এক নতুন পৃথিবীর। তারপর তারাও একদিন ক্রমবিকাশ ও ক্ষয় ঘটে এবং সৃষ্টি হয় আরেক নতুন পৃথিবীর। এইভাবেই অনন্ত কাল ধরে পৃথিবীর পর পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে চলেছে। প্রফেসার বার্নেট বলেন, এ্যানাক্সিমেনডারের পৃথিবীগুলো পর্যায়ক্রমিক না হয়ে, সমকালীন বা যৌগপদিকও (Simulteneous) হতে পারে।

এই মতানুসারে, অনেকগুলো পৃথিবী একই সময়ে অবস্থান করতে পারে। তবে যাই হোক না কেন, একথা ধ্রুবসত্য যে, এ পৃথিবীগুলোও চিরস্থায়ী নয়। এগুলোর সৃষ্টি, বিকাশ এবং ক্ষয় হয়েই অন্য পৃথিবীর স্থান যথাসময়ে করে দিচ্ছে। প্রশ্ন জাগে ঃ অনন্ত, অনির্দিষ্ট, অফুরন্ত নিরাকার বস্তু থেকে কিভাবে এ পৃথিবী সৃষ্টি হচ্ছে। এ্যানাক্সিমেনডার এ প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি। অনির্দিষ্ট বস্তু (Indeterminate matter) অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রক্রিয়ায় শৈত্যে (Cold) ও উষ্ণতায় (Hot) পৃথক হয়ে পড়ে। শৈত্য, আর্দ্র ও স্যাৎসেতে। এই শৈত্য ও আদ্রর্তা পরে পৃথিবীর কেন্দ্রে মাটি বা মৃত্তিকারূপ ধারণ করেছে। জগতের মূল উপাদান থেকে প্রথমতঃ এমন কোন বস্তু পৃথ্‌গভূত হয়েছিল যাতে শৈত্য ও উষ্ণতা উভয় গুণই বিদ্যমান ছিল। তারপর সেই বস্তু হতে একটা অগ্নিমণ্ডের উৎপত্তি হয় এবং মণ্ডটি ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর চারপাশে বায়ুরাশির উপর ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিবেষ্টনি আবার কালক্রমে ছিন্ন হয়ে পৃথক পৃথক অগ্নিচক্রে পরিণত হওয়ায় চন্দ্র, গ্রহ ও সূর্যের উদ্ভব হয়েছে। নলের ভেতর যেমন ফাঁক বা ছিদ্র থাকে, চন্দ্র, সূর্যাদির ভেতরও তেমনি ফাঁক রয়েছে। এসব ছিদ্রপথে স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক-সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। এই ছিদ্রপথ একবার খোলা ও একবার বন্ধ থাকার দরুন চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ ঘটে। চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় আঠারো ও সাতাশ গুণ বড়। নক্ষত্রগুলোও অগ্নিচক্র—এদের ছিদ্রপথে অগ্নিশিখা জ্বলতে থাকে।

প্রবল উষ্ণতায় যেমন চন্দ্র-সূর্যের উৎপত্তি, শৈত্যের আধিক্য হেতু তেমনি পৃথিবী এবং সমুদ্রের উৎপত্তি। পৃথিবীতে অগ্নির প্রভাব বেশী হওয়ার কারণে এমনও হতে পারে যে, সমস্ত শৈত্যাংশ একেবারে শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। তখন অগ্নি আর অগ্নি থাকবে না, তখন পুনরায় শীতোষ্ণ গুণসমন্বিত উৎপাদনে পরিণত হবে।

জীবসৃষ্টি সম্বন্ধেও এ্যানাক্সিমেনডার একটা বিশেষ মত প্রকাশ করেন। সূর্য তেজে যখন সর্বপ্রথম শৈত্যাংশ ক্রমাগত শুষ্ক হতে থাকে, সেই সময়ে তার তাপ ও জলীয় অংশ থেকে জীবের সৃষ্টি হয়। এই প্রাণীগুলো প্রথমতঃ খুবই ক্ষুদ্র আকারে থাকে। পরে পরিবেশ ও আবেষ্টনীর

প্রভাবে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে। এ্যানাক্সিমেনডারের মতে আদি পুরুষ মানুষ নয়, অন্যজাতীয় জীব। সম্ভবতঃ মৎস্য। কারণ অন্যান্য প্রাণী যেমন জন্মের পরই আহারান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, মানব শিশু তা করে না। অনেক দিন পর্যন্ত তাকে স্তন্যপান করতে হয়। মানবের আদিপুরুষ যদি মানবই হত, তা হলে এতদিনে মানবজাতির অস্তিত্ব লোপ পেত। ক্রমাগত শুষ্কতার ফলে জগতের কোন কোন স্থান উচুঁ হয়ে যাওয়ায় মৎস্যপ্রাণীগুলো তখন ডাঙ্গায় চলে আসে। পরে ক্রমে তাদের কান্‌খা (Fins) পরিবেশ ও আবেষ্টনীর সাথে খাপ খাইয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে যুক্ত হয়ে ডাঙ্গায় চলাফেরা করার উপযোগী হয়ে উঠে। প্রাচীন গ্রীকদর্শনে আধুনিক অভিব্যক্তি ও বিবর্তনবাদের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এখানে লক্ষ্য করা যায়।

থেলিসের 'পানি-দর্শন' থেকে এ্যানাক্সিমেন্‌ডারের "অনির্দিষ্ট ও অফুরন্ত বস্তুর" অমূর্ত কল্পনা বাস্তবিকই দর্শন-চিন্তার জগতে এক বিরাট সাফল্য। জাতি-প্রজাতির উপর পরিবেশ ও আবেষ্টনীর প্রভাব—এ অতি আধুনিক কালের চিন্তাধারা। কিন্তু, আমরা ভেবে সত্যি আশ্চর্য হই কিভাবে এ্যানাক্সিমেন্‌ডার পরিবেশ ও আবেষ্টনীয় প্রভাবের কথা এত পূর্ব থেকে কল্পনা করতে পেরেছিলেন। এ্যানাক্সি-মেন্‌ডারের এ অমূর্ত চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বাস্তবিকই দর্শনকে যেন এক যুগ এগিয়ে দিয়েছে। থেলিসের পর এ্যানাক্সিমেন্‌ডারের আবি-র্ভাব যেন যুগেরই দাবী।

এ্যানাক্সিমিনিস (Anaximenes)

এ্যানাক্সিমিনিস মাইলটাসের অধিবাসী খ্রীস্ট পূর্ব ৫৮৮ অব্দে তাঁর জন্ম ও ৫২৪ অব্দে তাঁর মৃত্যু। এ্যানাক্সিমিনিসের লেখা প্রবন্ধ এখনও কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। এক নির্দিষ্ট বস্তু থেকে যে জগতের উৎপত্তি—থেলিসের এ মতবাদের সঙ্গে তিনি একমত। এ্যানাক্সিমেনডারের কল্পিত মূল উপাদান এক অতীন্দ্রিয়, অনির্দিষ্ট ও অফুরন্ত বস্তু। এ্যানাক্সিমিনিস কিন্তু এরূপ কোন পদার্থকে মূল

উপাদান মনে করেননি। তাঁর মতে মূল উপাদান বায়ুরই (Air) মত কোন নির্দিষ্ট বস্তু। বস্তুতঃ একে বায়ুই (Air) বলা যায়। থেলিসেরপানির পরিবর্তে এ্যানাক্সিমিনিস্ বায়ুকেই জগতের মূল উপাদান মনে করেন। এ্যানাক্সিমেনডারের 'অফুরন্ত বস্তুর' মতএ্যানাক্সিমিনিসের বায়ুও মহাশূন্যে অনন্তভাবে বিস্তৃত। অর্থাৎ মহাশূন্যে অনন্তভাবে বায়ু ছড়িয়ে আছে। বায়ু গতিসম্পন্ন, গতিই বায়ুর ধর্ম এবং এ গতি থেকেই পার্থিব নানা উন্নতির ধারা চলে আস্ছে। জাগতিক উন্নতির মূলে দুটো বিরোধী শক্তি কাজ করছে ঃ

(১) হাল্কা বায়ু (Rarefied) ও (২) ঘনীভূত বায়ু (Condensed)। বায়ু হাল্কা হতে থাকলে ক্রমান্বয়ে তার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, এবং পরিশেষে অগ্নিরূপ ধারণ করে। বায়ু ঘনীভূত হতে থাকলে প্রথমে বাতাসে পরিণত হয়ে স্পর্শগোচর হয়। ঘনীভূত বায়ুই মেঘ এবং মেঘই পরে পানি হয়। ঘনীভূত পানি আরো ঘনীভূত হয়ে মৃত্তিকা এবং আরো ঘনীভূত হয়ে কঠিন শিলাতে পরিণত হয়। জগৎ, সময়ের গতিতে উত্থান পতনের মাধ্যমে পুনরায় আদি বায়ুতে ফিরে যায়। এ্যানাক্সিমেন্ডারের মত এ্যানাক্সিমিনিসও 'অসংখ্য পৃথিবীর' (Innumberable worlds) কথা উল্লেখ করেন। এ 'অসংখ্য পৃথিবীগুলো' হলো ক্রমিক (Successive)। প্রফেসার বার্নেট (Burnet) পৃথিবীগুলো সহ-অবস্থান (Co-existent) করে ক্রমিক থাকতে পারে বলে মনে করেন।

বায়ু হতে সর্বপ্রথম পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছিল। পৃথিবী সুবিস্তৃত মেঝ-সদৃশ্য এবং বায়ুতে ভাসমান। পৃথিবী হতে উত্থিত বায়ুর শৈত্যাংশ হতে চন্দ্র সূর্য, গ্রহ-তারার উদ্ভব হয়েছে। নক্ষত্রগুলো অগ্নিময়, কারণ, এদের বায়ুতে শৈত্যের অংশ নেই। চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই অগ্নিতুল্য। জ্যোতিষ্কগুলো পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবী তলদেশে গমন করে না। রাতে সূর্য দেখা যায় না, কারণ, সূর্য সেই সময়ে পৃথিবীর উচ্চাংশসমূহে ঢাকা পড়ে এবং পৃথিবীর যে অংশে আমরা রয়েছি সেখান হতে সূর্যের দূরত্ব অধিক হয়। বহুদূরে অবস্থিত বলে নক্ষত্রগুলো তাপ বিকিরণে অসমর্থ। ঘনীভূত বায়ুর

সংঘর্ষে সময়ে সময়ে জ্যোতিষ্কগুলো স্থানচ্যুত হয়।

বৃষ্টির পানি জমাট বেঁধে গেলে শিলাবৃষ্টি হয়। পানির মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকলে তাতে তুষার এবং ঘনীভূত বায়ুর উপর সূর্য কিরণ পড়লে তা'তে রামধনুর উৎপত্তি হয়। পৃথিবী অত্যন্ত শুষ্ক হওয়ার পর প্রবলবেগে বৃষ্টি হলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

এ্যানাক্সিমিনিস বায়ুকে পবিত্র মনে করেন। তাঁর গ্রন্থে দেবতার কথারও উল্লেখ দেখা যায়। দেবতা সংখ্যায় অনেক এবং বায়ু হতে সৃষ্ট বলে তাঁরাও জন্মমৃত্যুর অধীন।

মূল উপাদানকে বায়ু বলায় মনে হয়, এ্যানাক্সিমিনিস যেন সৃষ্টিতত্ত্বের এক ধাপ নীচে নেমে এসেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তাঁর বায়ুতে এমন এক বস্তু আছে যা নিখিল জগতের প্রাণস্বরূপ। মানবের আত্মা এই বায়ুরই নামান্তর। মনে হয়, মানবের শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে বায়ুর অবস্থিতি দেখেই যেন তিনি তাঁর বায়ু মতবাদ (Theory of Air) গড়ে তুলে ছিলেন। বস্তুতঃ বায়ুই জীবন। আত্মা বায়ুরই নামান্তর দেহ যেমন আত্মাকে আশ্রয় করে আছে, সমগ্র জগতও সেরূপ বায়ুর আশ্রয়ে বিদ্যমান। সূক্ষ্মজগত রূপ বায়ু স্থূলজগতে পরিণত হয়। এ ব্যতিরেকেও, এ্যানাক্সিমিনিসের হালকা এবং ঘনীভূত বায়ুর বিশ্লেষণকে এ্যানাক্সিমেন্ডারের চেয়ে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয়।

আইওনীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্য দার্শনিক (Other Ionic Thinkers)

এ পর্যন্ত আইওনীয় সম্প্রদায়ের তিনজন প্রধান চিন্তাবিদ্‌দের কথা আলোচনা করা হয়। তাঁদের পর যেসব আইওনীয় দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা কেউই কোন নূতন চিন্তার অধিকারী নন। তারা কেবল থেলিস, এ্যানাক্সিমেন্ডার ও এ্যানাক্সিমিনিসের প্রচলিত মতবাদগুলোকেই অনুসরণ করে গেছেন। তাঁরা কেউও কোন মৌলিক চিন্তার পথিকৃৎ নন। হিপ্পো (Hippo) থেলিসের পানিকে; ইডিয়াস (Ideaus) এবং ডিওজিনিস (Diogenes) এ্যানাক্সিমিনিসের বায়ুকেই জগতের মূল উপাদান বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলিয়াটিক্স্ সম্প্রদায়

(The Eleatics)

লিডিয়া এবং মিডিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে দেশ-বিজয় নিয়ে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন পার্শ্ববর্তী কয়েকটি রাজ্যের অধিবাসী প্রাণভয়ে মিসর, সিসিলী প্রভৃতি দেশে পলায়ন করে। ফোকৈয়া দেশের লোকেরাও গৃহ-বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ইতালীর বর্তমান ক্যালিব্রিয়ায় 'ইলিয়া' নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করে। কথিত আছে, খ্রীস্ট পূর্ব ৫৪০ অব্দে কোলনবাসী জেনোফিনিস (Xenophanes) ইলিয়ায় গমন করেন। এই জেনোফিনিস থেকেই ইলিয়া গোষ্ঠীর উৎপত্তি। জেনো (Zeno) এবং পারমানাইডিস (Parmenides) হচ্ছে এই ইলিয়াটিক্স্ শাখার দু'জন প্রখ্যাত প্রতিনিধি। দর্শন-চিন্তা ও প্রজ্ঞার বীজরূপ আইওনীয়-দর্শনে অত্যন্ত ক্ষীণরূপে পরিলক্ষিত হয়। ইলিয়াটিক্স্ দর্শনে প্রজ্ঞার এই বীজেরই যেন অঙ্কুরোদ্গম ও পরিস্ফুটন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, ইলিয়াটিক্স্ শাখা থেকেই দর্শনের সত্যিকার যাত্রা শুরু।

জেনোফিনিস (Xenophanes)

জেনোফেনিস ইলিয়াটিক্স্ সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীস্ট পূর্ব ৫৭৬ অব্দে জেনোফিনিস্ আইওনীয়ার কলোন (Colon) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশ ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন। চারণ-কবি হিসাবে তিনি নানা জায়গা ঘুরে বেড়ান। ইলিয়া শহরে আদৌ তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন কিনা, এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে একথা সুনিশ্চিত যে, পঁচিশ বৎসর থেকে সাতষট্টি বৎসর পর্যন্ত তিনি গ্রীসের নানা স্থান ঘুরে বেড়ান। নব্বই বৎসর বয়সেও তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ আছে। তিনি প্রখ্যাত কবি এবং সৎবুদ্ধিসম্পন্ন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কাব্যাকারে তাঁর মতাদর্শগুলো প্রকাশিত। তিনি অবশ্য কোন তাত্ত্বিক কাব্য রচনা করেন নি। তিনি রচনা করেছেন শোকসূচক-গীতি

এবং ব্যঙ্গকাব্য। এই শোক-গাঁথা ও ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ধর্মীয় মতাদর্শগুলো। বস্তুতঃ, জেনোফিনিসকে একজন দার্শনিক না বলে একজন ধর্মীয় চিন্তাবিদ্ বলাই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত।

ধর্ম ও দর্শনে যে কলহ ও দ্বন্দ্ব, জেনোফিনিসই তার উদ্যোক্তা বলে কথিত। তিনি পূত-পবিত্র ঈশ্বর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রচলিত গ্রীক ধর্মীয় মতবাদের প্রতি চরম আঘাত হানেন। প্রচলিত গ্রীকধর্ম মানবাকারে সৃষ্ট বহু দেব-দেবতায় বিশ্বাসী। ঈশ্বরের মানবাকার রূপ ধারণ কল্পনাকে জেনোফিনিস অত্যন্ত তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি নির্মল 'ঈশ্বর-ধারণাকে' বিকৃত করে চিত্রায়িত করার জন্যে হোমার (Homer) ও হিসিয়ড্‌কে (Hesiod) তীব্র নিন্দা করেন। তিনি জাতীয় দেব-দেবীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। পরিবর্তে, তিনি সহজ-সরল, মধুর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় একেশ্বরবাদ মত প্রচার করেন। তাঁর অদ্বৈতবাদ (Monotheism) ও সর্বব্যাপীত্বে প্রচারিত (Pantheistic) কোন প্রভেদ নেই। এ বিশ্বে 'এক' (one) ব্যতিরেকে 'দুই' নেই। ঈশ্বর বা ভগবান এক (one), মানবাকার বা মানববুদ্ধিতে এ ভগবানকে তুলনা করা চলেনা। ভগবান সর্বদ্রষ্টা (All Eye), সর্বশ্রোতা (All Ear) ও সর্বজ্ঞ (All thought)। সৃষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে ভগবানকে স্থান ত্যাগ করতে হয় না। ধারণার দ্বারা তিনি জগতকে শাসন করছেন। সৈন্যাধ্যক্ষ যেমন বাইরে থেকে সৈন্যদেরকে শাসন করেন, ভগবান জগতের বাইরে থেকে জগতকে শাসন করছেন, এ রকম ধারণা করা একদম ভুল। পক্ষান্তরে, জেনোফিনিস্ ভগবান ও জগতকে অভিন্ন মনে করেন। তিনি বলেন, 'জগত হল ভগবান।' জগত হল ইন্দ্রিয়হীন এক সচেতন সত্তা। তিনি পুনরায় বলেন, 'সব কিছু এক' (All is one)। ভগবান এক। ভগবান অপরিবর্তনীয় ও অনড়। আমাদের একমাত্র সেই পরমপুরুষের উপাসনা করা কর্তব্য, যাঁর পূত পবিত্র আশ্রয়ে জীব নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারে। যেখানে জন্ম মৃত্যুর ভয় নেই, সেই অস্তিত্বলোকই মানুষের কাম্য।

জেনোফিনিসের অন্যান্য মতাদর্শ ও দর্শন-চিন্তাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফসিল (Fossil), ঝিনুক, সামুদ্রিক আগাছা ও মৎস্য জাতীয় নানা বস্তু পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি সমুদ্র থেকেই জগতের উৎপত্তি এবং সমুদ্রতেই আবার তার বিলুপ্তি ঘটবে বলে ধারণা করেন। সমুদ্রে জগতের বিলুপ্তির সাথে সাথে মানবজাতিরও অবসান ঘটবে। জগত যখন আবার সমুদ্র থেকে জেগে উঠবে, মানবজাতিরও পুনরোদ্ভব হবে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রকে তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলেই মনে করেন। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে না, সরল রেখায় গমন করে এবং সন্ধ্যায় অদূরে বিলীন হয়ে যায় বলে তাঁর ধারণা। প্রতিদিন একই সূর্য উদয় হয়না—নিত্য নব নব সূর্যের সৃষ্টি হয়।

জেনোফিনিস্‌কে দার্শনিক বলার চেয়ে একজন ধর্মীয় সংস্কারক বলাই শ্রেয়ঃ। অন্য কোন কারণে না হোক, 'সব কিছু এক' (All is one) এই যুক্তিবাক্যের জন্যেই তিনি দর্শন-ইতিহাসে স্থান পেতে পারেন। জেনো-ফেনিসের অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) দর্শনে বিরাট স্থান অধিকার করে আছে। সমুদ্রজাত প্রাণীধর্মের অভিব্যক্তিবাদের বহমান ধারায় জেনোফিনিসের দর্শন-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পারমানাইডিস (Parmenides)

পারমানাইডিস জেনোফিনিসের শিষ্য। তিনি ইলিয়াটিক্ শাখার একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। খ্রীস্টপূর্ব ৫১৬ থেকে ৫১৪ অব্দের মধ্যে তাঁর জন্ম। তিনি জেনোকে সঙ্গে নিয়ে এথেন্সে আগমন করেন এবং সেখানে যুবক মহামান্য সক্রেটিসের সাথে তাঁদের আলোচনা হয়। মহামান্য প্লেটো পারমানাইডিসকে খুব সম্মান ও সমীহ করতেন। পারমানাইডিস জেনোফেনিসের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলো সুস্পষ্ট ও পরিমার্জন করে ফুটিয়ে তোলেন। পারমানাইডিসের দর্শনতত্ত্ব নীতিগর্ভ কবিতাকারে তৈরী। এগুলো প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমে তাঁর নিজস্ব দর্শন ব্যাখ্যা। এটা 'সত্যের পথ'। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সমকালীন মিথ্যার বর্ণনা। এবং এটা 'মিথ্যার পথ'।

পারমানাইডিসের দর্শন-চিন্তা ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল বস্তু থেকেই উদ্ভূত। আমাদের সামনে যে জগত তার বিরাট ঐশ্বর্য নিয়ে উপস্থিত, তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি হয়, আবার নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায়। এ জগতে কোন কিছুই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। সবই ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তণশীল। পারমানাইডিসের চিন্তা ঃ এ নৃত্য-চঞ্চল পরিবর্তনশীল বস্তুগুলোকে একটা স্থায়ী সত্তা দিয়ে বেঁধে রাখা কি সম্ভব? এ প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর ইতিহাস বিখ্যাত বৈষম্য মতবাদ 'সত্তা' ও 'অসত্তা'। স্থাবর হল চরম সত্য। অস্থাবর হল মিথ্যা। পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়বস্তু এবং অস্থাবরকে তিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেন। ইন্দ্রিয়ানুভূত জগত অসত্য, মায়া এবং দৃষ্টিভ্রম। কেবল সত্তাই হল একমাত্র সত্য। থেলিস যেমন পানিকে, পীথাগোরাস সংখ্যাকে জগতের আদি উপাদান বলেছেন, অনুরূপভাবে পারমানাইডিসও সত্তাকে আদি কারণ বলে মনে করেন। পারমানাইডিসের সত্তা অসত্তা থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। সত্তা, উন্মেষ (Becoming) থেকেও আলাদা ও পৃথক। তাঁর সত্তার স্বরূপ কি? এর উত্তরে পারমানাইডিস কেবল কতকগুলো নীতিবাচক শব্দ দিয়ে তাঁর সত্তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার প্রয়াস পান। সত্তার মাঝে কোন পরিবর্তন নেই—এ অব্যয়, অক্ষয় ও অবিনশ্বর—এর আদি নেই, অন্ত নেই, জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। সত্তার জন্ম, হয় সত্তা থেকে না হয় অসত্তা থেকে। সত্তা থেকে সত্তার উদ্ভব, কোন উদ্ভবই নয়। 'সত্তা থেকে সত্তার উদ্ভব'এ কথা বলার কোন অর্থই হয় না। অন্যদিকে, অসত্তা থেকে সত্তার জন্ম একেবারে অসম্ভব। কারণ, শূন্য থেকে 'কিছুর' সৃষ্টি হতে পারে না। "শূন্য থেকে কিছুই উদ্ভব হয় না।" মূলতঃ, এটাই হল পারমানাইডিসের প্রধান চিন্তা।

অধিকন্তু, সত্তা ছিল, আছে বা থাকবে। সত্তা সম্বন্ধে আমরা এসব কিছুই প্রশ্ন করতে পারি না। সত্তার কোন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নেই। সত্তা শাশ্বত ও চিরন্তন। এ অবিভক্ত ও অবিভাজ্য। অবিভক্ত, কারণ, কোন কিছু দিয়ে একে বিভক্তিকরণ সম্ভব নয়; কেননা সত্তাতে সত্তা ছাড়া

আর কিছুই নেই। অবিভাজ্য, কারণ, কোন ভাজক দিয়েও এটা ভাজ্য নয়। এ অনড় ও গতিহীন। চঞ্চলতা ও গতি বস্তুর উন্মেষের কারণ ঘটায়; কিন্তু সত্তাতে বস্তুর 'উন্মেষের' স্থান নেই। এ অনন্য ও আত্ম অভিন্ন। নিজ ব্যতিরেকে এ অন্যকিছু থেকে উদ্ভূত নয়, আপন ব্যতিরেকে এটা অন্য কিছুতেই লীন হয় না। সত্তা অস্তিত্বের জন্যে কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। সত্তা, 'অন্যতে' (Otherness) অতিক্রম করে না। সত্তা আপনাতেই সুদৃঢ় থাকে। স্বীয় বা আঁপনার মধ্যেই সত্তা বিদ্যমান। ইতিবাচক গুণের মধ্যে সত্তার একটি গুণই আছে এবং তা'হল 'সত্তার কিছুই নেই।' সত্তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য কেবল সত্তাই। 'হয়ত্ব' (Isness) সত্তার একমাত্র গুণ।

পারমানাইডিস থেকেই এই প্রথম বারের মত দর্শন-ইতিহাসে সংবেদন (Sensation) এবং প্রজ্ঞার (Reason) মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অসত্তা ও মিথ্যা, মায়া এবং ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে যে জগত আমাদের সামনে উপস্থিত, তাই পারমানাইডিসের মতে সংবেদন বা ইন্দ্রিয়-জগত। প্রকৃত সত্য এবং সত্তা কেবল প্রজ্ঞা বা মননের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। পারমানাইডিসের মতে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমস্ত মায়া ও ভুল-ভ্রান্তির একমাত্র উৎস। প্রজ্ঞার মধ্যেই অন্তর্নিহিত সত্য লুকিয়ে আছে। পারমানাইডিসের এ ধারণা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। কারণ, প্রজ্ঞার মধ্যে সত্য—সংবেদনে নয়—এটাই পরবর্তী ভাববাদের লমূ বিষয়বস্তু বা উপপাদ্য বিষয়।

পারমানাইডিসের এই সত্তাবাদ তাঁর কবিতার প্রথম ভাগে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে বর্ণিত হয়েছে অসত্য, মিথ্যা ও মায়ার কথা। প্রথমাংশ 'সত্যের পথ' দ্বিতীয়াংশ 'মিথ্যের পথ'—সত্তা অসত্তার বর্ণনা। পারমানাইডিসের অসত্য বা মিথ্যের বর্ণনা খুব একটা সুস্পষ্ট নয়। তবে তিনি যা বলতে চান, তা হচ্ছেঃ অন্তর্দৃষ্টিতে জগত এক এবং অবিভাজ্য হলেও কতকগুলো বিরোধ ভাবাপন্ন শক্তির দ্বারা জগতের লৌকিক সৃষ্টি পরিবর্তন ও লয়কার্য সাধিত হচ্ছে। সংবেদন বা ইন্দ্রিয়-জগত দুই বিপরীত ক্রিয়ায় গঠিত। শৈত্য ও অন্ধকার, উত্তাপ

ও আলোক এ দু' বিপরীত শক্তি দিয়ে জগতের লৌকিক সৃষ্টি। জগতের গঠন কয়েকটি ঐকিক কেন্দ্রীয় বৃত্তের মতন। তারা পর্যায়ক্রমে দীপ্ত ও উষ্ণ, আধার ও শীতল একের পর এক এভাবে সজ্জিত এবং ধারাবাহিকভাবে গ্রথিত।

সর্ববহিস্থবৃত্ত অপর সমস্ত বৃত্তগুলোকে বেষ্টন করে আছে। এটা কঠিন, শীতল ও তমসাবৃত। সর্বঅন্তস্থ বৃত্তটি কঠিন, তবে এটা তারকা সমুজ্জল এবং জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। আলোর দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, জীবন ততই সুন্দর, মধুর এবং সার্থক। আবার যতই শৈত্যের দিকে ধাবিত হওয়া যায়, জীবন ততই বিশ্রী, তিক্ত এবং ব্যর্থ। এভাবেই বৃত্তায়িত হয়ে আছে শীতোষ্ণ বলয় এবং সুন্দর ও অসুন্দরের পরিধি বেয়ে বহমান পারমানাইডিসের তাত্ত্বিক-মতবাদ। দর্শনে পারমানাইডিস কোন্ স্থান দখল করে আছেন? হেগেল, এর্ডমেন্ এবং সোয়েগ্লার পারমানাইডিসের দর্শনকে আদর্শ বা ভাববাদ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অপরপক্ষে, অধ্যাপক বার্নেট সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "পার-মানাইডিস ভাববাদের জনক নন, বরং সমস্ত বস্তুবাদ তাঁর মতবাদের উপর নির্ভরশীল।" এখন প্রশ্ন, পারমানাইডিস কি জড়বাদী, না ভাববাদী? দেখা যাক, কিসের উপর ভিত্তি করে তাঁর মতবাদকে জড়বাদ বা ভাববাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রথমে জড়বাদী ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ করা যাক। পারমানাইডিসের মতে, সত্তা মৌলিক সত্য, এটা জায়গা জুড়ে আছে, এটা নির্দিষ্ট এবং বর্তুলাকার। এখন কথা হল, যা নির্দিষ্ট এবং যার সাকার রয়েছে, নিঃসন্দেহে তা জড় বা বস্তুবিশেষ। এজন্যেই বস্তুর মৌলিক সত্তাকে পারমানাইডিস্ জড় বলে কল্পনা করেন। বস্তুতঃজড়বাদের মূল কথাই হল যে, আদিসত্তা জড়বিশেষ।

এখন দেখা যাক, কোন্ যুক্তি-অবলম্বনে পারমানাইডিস্কে ভাববাদী বলা হয়। প্রথমতঃ, আদি সত্তা যে এক অমূর্ত ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়, একথাটাই পারমানাইডিস্ নানা জায়গায় নানাভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। সত্তা এখানে বা ওখানে নেই।

সত্তার স্থান কাল, জন্ম মৃত্যু, বর্তমান-ভূতভ-বিষ্যৎ কিছুই নেই। এ ইন্দ্রিয়ানুভূত নয়। প্রজ্ঞার মারফতই একে জানা সম্ভব। চিন্তা বা ধারণা দিয়ে সত্তার 'সাধারণ ধারণা' বা 'সার্বিক ধারণা' তৈরী হয়ে থাকে। 'শুভ্রতা' গুন ধর্মের কথা ধরা যাক্। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি, এটা শুভ্র, ঐ বস্তু শুভ্র। কিন্তু যদি বলা হয়, 'শুভ্রতা' নিজে কি? তা হলেই বলতে হয়, 'শুভ্রতা' সব শুভ্র বস্তুর একটা সামান্যীকরণ বা সাধারণ নাম। এবং এ সার্বিক ধারণা কেবল জাতি বা শ্রেণীর বেলায় ব্যবহারযোগ্য, ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের বেলায় নয়। সার্বিক ধারণ জাতিবাচক নামের মানসিক প্রতিরূপ। কোন শ্রেণীর সকল সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান সাধারন এবং আবশ্যক গুণাবলীবিশিষ্ট বস্তুনিচয়ের সমগ্রশ্রেণীর মানসিক প্রতিবেদনকে সার্বিক বা সামান্য ধারণা বলে। ধারণা, চিন্তা এবং প্রজ্ঞাই হল এ সার্বিক ধারণার ধী-শক্তি। এবারে জগতের সমগ্র বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান সাধারন ও আবশ্যক গুন নিলে আমরা কেবল একটা সার্বিক ধারণা পাই এবং সেটা হল 'সত্তা'। সত্তা জগতের সমগ্র বস্তুজাতের মানসিক প্রতিরূপ। সত্তা কোন ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের নাম নয়। সত্তা হল একটা চিন্তা, ধারণা বা জগতের সমগ্র বস্তুজাতের সার্বিক ধারণা। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পারমানাইডিস্ আদি-সত্তাকে চিন্তা বা ধারণা বলে মনে করেন। এবং ভাববাদের মূলসুর হচ্ছে চিন্তা বা ধারণা। এই হিসাবে পারমানাইডিসকে ভাববাদী বলা যেতে পারে।

পারমানাইডিস সংবেদন ও প্রজ্ঞা, সত্য এবং দৃষ্টিভ্রমের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করেন। প্রকৃত সত্যকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, কেবল প্রজ্ঞার মারফতই জানা সম্ভব। ইন্দ্রিয় বা সংবেদন-জগত প্রকৃত বা জগতের আসল রূপ নয়। এ এক মায়া, দৃষ্টিভ্রম এবং অবভাস-মাত্র। একটা কথা এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 'সত্য' ও 'দৃষ্টিভ্রম' কথাগুলোকে আমরা এখন যে ভাবে গ্রহণ করছি, পারমানাইডিসের চিন্তা-ধারায় এগুলো এত সুস্পষ্ট ছিল না। প্রশ্ন জাগে ঃ পারমানাইডিসের এ পরস্পর বিরোধী 'জড়বাদ' ও 'ভাববাদ' মতবাদকে কোনক্রমে সমন্বয়

করা যায় কি না। প্রকৃত সত্য এই যে, পারমানাইডিসের চিন্তায় এ বিপরীতধর্মী মত অসমন্বিত অবস্থার পাশাপাশি সহ-অবস্থান করছে সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা সত্তা হিসেবে। পরিস্থিতিটা এমন যে, যেটার উপর সামান্য একটু জোর দেওয়া যায়, পারমানাইডিসেকে তখন তাই মনে হয়। পারমানাইডিসের জড়ের দিকটায় একটু ঝুঁকে পড়লো, তাঁকে জড়বাদী বলেই মনে হয়। অপরদিকে তাঁর চিন্তা বা ধারণার দিকে সামান্য পক্ষপাতিত্ব করলে তাঁকে ভাববাদী বলেই মনে হয়। এক কথায়, পারমানাইডিস্কে আধুনিক ভাববাদ এবং বস্তুবাদ উভয়ের সমন্বয়বাদী জনক এবং আদি প্রণেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তাঁর পরবর্তী দার্শনিক এম্পেডক্লেস এবং ডেমোক্রিটাস্ তাঁর বস্তুদিকটাকে অবলম্বন করে জড়-দর্শন সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন। আবার অপরদিকে, পারমানাইডিসের নিগূঢ় এবং অন্তর্নিহিত ভাববাদের বীজকে অবলম্বন করে মহামান্য প্লেটো তাঁর প্রখ্যাত 'ভাবজগত' সৃষ্টি করেছেন। পারমানাইডিসের মতবাদ যেন একটা প্রস্তর ফলক বিশেষ যা দিয়ে যে কোন মূর্তি-গড়া যায়। দর্শন হ'ল ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ের ভাব ধারার একটা গতিপ্রবাহ। পারমানাইডিস ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, জড় ও ভাব এ দুয়ের ক্ষীণ আভাস পেয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু তাদের প্রকৃত ভূমিকা ব্যক্ত করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। পরিশেষে, এই বলা যায় যে, তাঁর মত-বাদ যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন, গ্রীক-দর্শনে এটা যে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অনুমানভিত্তিক আর যুক্তিসর্বস্ব গ্রীক-দর্শনের ইতিহাসে তাই পার-মানাইডিসের নামটিও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে সমুজ্জল।

জেনো (Zeno)

খ্রীস্টপূর্ব ৪৮৯ অব্দে জেনোর জন্ম বলে অনুমান করা হয়। জেনো ইলিয়ার বাসিন্দা এবং পারমানাইডিসের শিষ্য। তিনি স্বীয় শিক্ষকের মতবাদকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করেন। জেনোর দর্শনে নূতনত্ব কিছু নেই, তবে তাঁর দর্শনে তর্কের অবতারণা, যুক্তি-বিজ্ঞান এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

স্বষ্টিতত্ত্বে দুইয়ের কল্পনা আসতে পারে না। 'একই' ধারণার বিষয়। বিস্তৃতি, পরিমাণ, গতি এবং স্থান এ-সবকিছুই বোধগম্য নয়। সত্তা স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়—এতে কোন গতি নেই। 'গতি, এবং 'বহু, জগতের দৃষ্টিভ্রম মাত্র। পারমানাইডিসকে স্বীকার করে নিয়ে জেনো বলেন, জীবন-সত্তা স্থায়ী, নিশ্চল এবং অপরিবর্তনীয়। প্রকৃতপক্ষে, 'গতি' ও 'বহু, আমাদের দৃষ্টিভ্রমমাত্র। 'গতি, এবং 'বহু'-কে নিশ্চল ও মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করেন। তিনি 'গতি' ও 'বহু'-কে বিরোধ প্রমাণ করে 'গতি, ও 'বহু' কে অস্বীকার করেন।

'বহুর' বিরুদ্ধে জেনোর যুক্তি

(১) 'বহু' বলতে গেলেই, তাকে অবশ্য অনন্তভাবে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ উভয়ই হতে হবে। 'বহু' অসংখ্য ক্ষুদ্র। কারণ কতকগুলো 'এককের' সমন্বয়ে বহুর স্বষ্টি। একক, অবিভাজ্য; কারণ, বিভক্ত করতে গেলে তারা আর একক থাকে না। একক অবিভাজ্য হওয়ার দরুন তাদের কোন পরিমাণ নেই। কারণ, যার পরিমাণ আছে তা বিভাজ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'বহু' পরিমাণহীন এককের সমষ্টি মাত্র। 'বহু'র কোন অংশেরই যদি পরিমাণ (Magnitude) না থাকে, সম্পূর্ণ (Whole) বা পূর্ণ হিসেবেও বহুর কোন পরিমাণ থাকতে পারে না। অতএব, বহু' হল অসংখ্য ক্ষুদ্র।

'বহু' আবার অসংখ্য বৃহৎ। কারণ, 'বহু'র পরিমাণ আছে এবং একে অংশে বিভক্ত করা চলে। অংশগুলোর আবার পরিমাণ থাকার দরুন অংশকে পুনরায় খণ্ডাংশে বিভক্ত করা চলে। খণ্ডাংশগুলোকে আবার খণ্ডাংশে বিভক্ত করা যায়। কারণ, তাদেরও পরিমাণ থাকে। এভাবে বিভক্তিকরণ ক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চললেও তার শেষ নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বহুকে অসংখ্য ও অগণনীয়ভাবে বিভক্ত করা চলে। ক্ষুদ্রতম পরিমাণকে অসীম সংখ্যার দ্বারা গুণ করলে ক্ষুদ্রতম পরিমাণ অসীম পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব দেখা যাচ্ছে, বহু

হল অসংখ্য-অনন্ত। 'বহু' একই সাথে সংশয় নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়ই। 'বহু' নির্দিষ্ট; কারণ, 'বহু' বহুই—কমও নয়, বেশীও নয়। সুতরাং 'বহু' একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। আবার, 'বহু' অনির্দিষ্ট; কারণ, 'বহু'-কে অনন্ত সংখ্যায় বিভক্ত করা চলে। অথবা বলা চলে, অনন্ত-খণ্ডাংশের সংখ্যা দিয়েই 'বহু'র সৃষ্টি। বহু সসীম এবং অসীম উভয়ই।

গতির বিরুদ্ধে জেনোর যুক্তি

একটা নির্দিষ্ট দূরত্বকে অতিক্রম করতে হলে প্রথমতঃ আমাদের ঐ দূরত্বের অর্ধেককে অতিক্রম করতে হয়। বাকী অর্ধেক অতিক্রম করার জন্যে অবশিষ্ট থেকে যায়। সেই অবশিষ্ট অর্ধেককে আবার অতিক্রম করতে গেলে, প্রথমতঃ তার অর্ধেক অংশকে অতিক্রম করতে হয় এবং বাকী অবশিষ্ট অর্ধেক অতিক্রম করার জন্য থেকে যায়। এই প্রক্রিয়া অনন্তভাবে চলতে থাকলেও বাকী অবশিষ্টাংশ অনতিক্রম অবস্থায় থেকেই যাবে। তা আর কোন দিন অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এবং একথা বলার অর্থই হচ্ছে যে, আমরা এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে পৌঁছতে অক্ষম। জেনো মনে করেন, একবিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এ সম্বন্ধে একিলিস ও কচ্ছপের একটা হেঁয়ালী আছে। দৌড়-প্রতিযোগিতায় কচ্ছপকে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু পথ এগিয়ে দেওয়া হলে, একিলাস কখনও কচ্ছপকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। এমন কি একিলাস যদি কচ্ছপের চেয়ে চতুর্থগুণ শক্তিতেও দৌড়ায়, তবুও কচ্ছপকে সে অতিক্রম করতে পারবে না। কারণ, উভয়ের ব্যবধান যতই হ্রাস বা কম হোক না কেন, একিলাসকে প্রথমতঃ ব্যবধানের অর্ধেককে অতিক্রম করতে হবে—তারপর অর্ধেকের অর্ধেক—তারপর বাকী অবশিষ্ট অর্ধেকের অর্ধেক এবং এ ভাবে অনন্তকাল চললেও অর্ধেক আর শেষ হবে না। অর্থাৎ, একিলাস কখনও কচ্ছপকে অতিক্রম করতে পারবে না। নিক্ষিপ্ত শরের আরেকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। কোন বস্তু একই সময়ে দুই জায়গাতে থাকতে পারে না। নিক্ষিপ্ত শর একটা নির্দিষ্ট সময়ে এক

জায়গাতেই অবস্থান করে, দুই জায়গাতে নয়। কিন্তু এক জায়গায় অবস্থান করার অর্থই হচ্ছে স্থিতিতে থাকা। তার মানে, যেখানকার বস্তু সেইখানেই অবস্থান করা। নিক্ষিপ্ত শর প্রতিসময়েই স্থিতিতে আছে, গতি নেই—গতি অসম্ভব। কারণ, শরকে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছতে, গমনরেখার বিন্দুগুলোকে একের পর এক অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু বিন্দুর পরিমাণ না থাকায়, একটি করে বিন্দু অতিক্রম করা আর যেখানকার শর সেখানে থাকা একই কথা। শরকে আমরা আপাতঃ চলতে দেখলেও প্রকৃতপক্ষে এ নিশ্চল ও গতিহীন। জেনোর সমস্ত যুক্তি-তর্ক তার "অনন্ত-বিভাজ্য-বিরোধ" নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ 'অনন্ত বিভাজ্য বিরোধ' (Antimony of Infinite Divisibility) তাঁর দর্শনের সব জায়গা জুড়ে রয়েছে। এ বিরোধের সমাধান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

জেনোর মতে, 'গতি' ও 'বহু' সত্য নয়। আমাদের প্রশ্ন, 'গতি' ও 'বহু' সত্য নয় বলতে জেনো কি বোঝেন? তিনি কি বুঝাতে চান যে, তিনি যখন ইলিয়ার রাস্তা দিয়ে চলেন, তখন তাঁর চলার গতিটা সত্য নয়? যদি তাই হয়, তবে তাঁর দর্শন-তত্ত্বকে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। তিনি যা বলতে চান, তা' হল; জগতে 'গতি' ও 'বহুর' অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এটাই প্রকৃত বা আসল সত্তা নয়। তাঁর মতে, 'গতি' ও 'বহু' জগতের বাহ্যিক মায়া ও দৃষ্টিভ্রম জগত। 'গতি' ও 'বহু' প্রকৃত জগতের অবভাসিক রূপ মাত্র—আসল নয়। তবে কি জেনোর মতে দৃশ্যমান জগত সত্য নয়? হ্যাঁ, তাও সত্য। যদি তাই হয়, তবে জগতের মুখোশ এবং প্রকৃত সত্যের ভেতর পার্থক্য কোথায়? আসল কথা হল, আমাদের চারদিকে অবস্থানরত সমগ্র বস্তুরই অস্তিত্ব আছে, তবে তাদের আত্ম সত্তা বা স্বাধীন স্বকীয়সত্তা নেই। তাদের সত্তা অন্য কোন মহৎ সত্তার উপর নির্ভরশীল। সেই মহৎ সত্তা এমন এক চরম সত্য, যা থেকে সব-সত্তারই উদ্ভব; কিন্তু নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ সত্তা কারও মুখাপেক্ষী নয়, তিনি আপন সত্তায় আপনি বিরাজমান

—নিজের আলোকে নিজেই উদ্ভাসিত। অবশ্য একথা সত্যি যে, বর্তমানে আমরা অবভাস এবং প্রকৃত-সত্তার মধ্যে যে প্রভেদরেখা টানছি, ইলিয়াটিকদের সময়ে এ পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। পারমানাইডিস এবং জেনো উভয়ই অবভাস এবং প্রকৃত-সত্তার মধ্যে এই প্রভেদটুকু অতি-ক্ষীণ ও অস্পষ্ট অবস্থায় অবলোকন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ দিয়ে কোন পরিস্ফুট দর্শন সৃষ্টি করতে পারেননি। জেনোর নিক্ষিপ্ত শর, একিলাস ও কচ্ছপের কাহিনী আপাতঃ দৃষ্টিতে হেঁয়ালি মনের চিন্তা হলেও তার পেছনে যে এক প্রচ্ছন্ন সত্য লুকিয়ে রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি বিরুদ্ধবিরোধ প্রমাণে তাদের উভয়কেই অসত্য ও মিথ্যা প্রমাণ করেন। তাদের মিথ্যে প্রমাণে তিনি তাঁর দর্শনের আসল সত্য ও রহস্য উদ্ঘাটিত করারই প্রচেষ্টা করেছেন। অসত্য ও মিথ্যা, দৃষ্টিভ্রম, অবভাস ; প্রকৃত সত্যমিথ্যা ও অসত্যকে আড়াল করে লুকিয়ে আছে। মাটামুটি এইটেই হল তাঁর তত্ত্বের মূলসুর।

ইলিয়াটিক্স্ শাখার মূল্য নিরূপণ (Critical Estimate of Eleaticism)

দর্শনে ইলিয়াটিক্স্দের স্থান এবং তাঁদের চিন্তাস্রোতের গতিধারা সম্বন্ধে আলোচনা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আইওনীয় দার্শনিকগণ জগতের আদি-সত্তা (First Principles) প্রশ্নে জড়ই (Matter) যে বস্তুজগতের মূলাধার, এ কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁদের পর পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায় 'সংখ্যা'-কে (Number) মৌলিক-সত্তা বলে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন গ্রীক-দার্শনিকদেরকে অনুসরণ করেই ইলিয়াটিক্স্গণ জীবন-সত্তা (Being)-কে মূলাধার বলে মনে করেন। জগত শুধু গুণ বা পরিমাণগতই নয় ; গুণ ও পরিমাণ এ দু'টোকে নিয়েই জগতের সৃষ্টি। আইওনীয় দার্শনিকগণ আদি-সত্তাকে গুণগত ও পরিমাণগত বলেই মনে করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে জড়ই (Matter) হচ্ছে আদি-সত্তা। জড়ের গুণ এবং পরিমাণ উভয়ই আছে। কিন্তু পীথাগোরীয়

সম্প্রদায় বস্তুর গুণগত দিকটাকে বাদ দিয়ে শুধু পরিমাণ বা সংখ্যার দিকটার উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। তাঁদের মতে, জগত সংখ্যা দিয়ে তৈরী। সংখ্যাই হল আদি-সত্তা। পীথাগোরীয়দের পর ইলিয়াটিক্‌স্‌দের আবির্ভাব। ইলিয়াটিক্‌স্‌গণ এসে এবার বস্তুর পরিমাণ বা সংখ্যার দিকটাকেও সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেয়। কারণ, ইলিয়াটিক্‌স্‌গণ 'বহু' (Multiplicity)-কে অস্বীকার করেন এবং বহুকে অস্বীকার করার মানেই হল পরিমাণকে অস্বীকার করা। ইলিয়াটিক্‌স্‌গণ গুণ ও পরিমাণ (Quality and Quantity) উভয়কে বাদ দিয়ে এক অনন্ত, অবিভক্ত ও অবিভাজ্য 'জীবন-সত্তার' (Being) অস্তিত্বকে গ্রহণ করে নেয়। আইওনীয় থেকে ইলিয়াটিক্‌স্‌দের ক্রম-উত্তরণ ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ের চিন্তাধারারই একটা প্রবহমান গতি।

ইলিয়াটিক্‌স্‌গণ অদ্বৈতবাদ (Monism) মত পোষণ করেন। এক সত্তা দিয়ে সমগ্র জগতকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টাকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়। জগতকে এক সত্তা দিয়ে বিশ্লেষণ করা হ'ল মানুষের প্রকৃতি। এই একত্ববাদ থেকে আমরা আবার স্বাভাবিকরূপেই একেশ্বরবাদ (Monotheism) বিশ্বাসে পৌঁছতে পারি। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রকৃতি শুধু ধর্ম ও বিজ্ঞানেই নয়, দর্শনেও প্রভাব বিস্তার করেছে। ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল উদ্দেশ্য এক। এক সত্তা দিয়ে জাগতিক বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করা। ধর্মের উদ্দেশ্য ধর্মকে ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানকে এক সত্তা দিয়ে বিশ্লেষণ করা। কিন্তু দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হল, ধর্ম-বিজ্ঞান নিয়ে যে আমাদের এ বিচিত্র জগত তাকে এক মূল বা আদি-সত্তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা। এটার ব্যাপারে আমাদেরকে প্রধানতঃ দু'টো শর্ত মেনে নিতে হয়। প্রথমতঃ, আদি-সত্তা সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা; দ্বিতীয়তঃ, আদি-সত্তা হবে স্ব-নির্ভর পরম সত্তা। এ আদি-সত্তাকে আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। এ-স্বনির্ভর ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ সত্তা। ইলিয়াটিক্‌স্‌গণ 'জীবন-সত্তা'কে (Being) জগতের আদি-সত্তা বলে অভিহিত করেন। এ জীবন-সত্তা এক—আদি-সত্তা এক। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁদের এই একত্ববাদকে যথার্থরূপে

বিশ্লেষণ করতে গেলে তা অতি নৈরাশ্যজনকভাবেই দ্বৈতবাদে (Dualism) পরিণত হয়ে যায়।

প্রশ্ন দাঁড়ায় ঃ কিভাবে ইলিয়াটিক্স্‌গণ সত্তা থেকে এ বাস্তব জগতের চিত্রকে টেনে আনেন? ইলিয়াটিক্স্‌গণ সত্তা থেকে এ জগতকে উপপদান (Deduce) করেননি বা করার বৃথা চেষ্টাও করেননি। আদি সত্তা থেকে অবরোহ্‌ পদ্ধতিতে জগতকে না টেনে তাঁরা জগতের বাস্তবসত্যকে অস্বীকার করেন। আসলে, সমস্যার বাস্তবতাকে অস্বীকার করেই তাঁরা সমস্যার সমাধান করতে চান। জগতকে 'মায়া' ও 'দৃষ্টিভ্রম' বলে অস্বীকার করলে জগতের কোন যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় না। ইলিয়াটিক্স্‌ দর্শনে দু'টো জগত—'সত্য' ও 'দৃশ্যমান' জগত (True & false world)। এ দুই জগত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে —এদের মধ্যে কোন সংযোগ নেই—এদেরকে সমন্বিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ইন্দ্রিয় বা অনুভূতি-জগতকে 'দৃশ্যমান' বা 'মায়া' বললেও এ মায়ার জটিল প্যাঁক থেকে ইলিয়াটিক্স্‌গণ নিজদের বিমুক্ত করতে পারছে না। 'প্রকৃত' ও 'অবভাস' (Real & appearence) এই দ্বৈত-সত্তা ইলিয়াটিক্স্‌দেরকে অক্টোপাশের ন্যায় আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

পরম সত্তা এক। তাই বলে চূড়ান্ত অদ্বৈতবাদকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। পরম সত্তা যদি 'বহু' ও 'গতি'-কে বাদ দিয়ে কেবল একই হয়, এমন পরম-সত্তকে আমরা স্বীকার করে নিতে পারিনা এবং এমন পরম-সত্তা থেকে জগত উৎপত্তি সম্ভব নয়। পরম- সত্তা গুণ ও পরিমাণ উভয়কেই গ্রহণ করবে। গুণগতভাবে পরম সত্তা হবে এক। পরিমাণগতভাবে, এই 'এক' দৃশ্যমান জগতের 'বহু' ও 'গতিকে' নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেবে। অর্থাৎ, পরম-সত্তা এক এবং 'বহু'র মধ্যেই তার প্রকাশ। ইলিয়াটিক্স্‌গণ দর্শনের এই সুক্ষ্ম তত্ত্বটুকু তখনও ধরতে পারেন নি। তবে তাঁদের মাধ্যমে গ্রীক-দর্শনের যে অভূত পূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় অধ্যায়
কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক

(খ্রীস্ট পূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক)

হিরাক্লিটাস (Heraclitus)

হিরাক্লিটাস খ্রীস্টপূর্ব ৫৩৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। খ্রীস্টপূর্ব ৪৭৫ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি জেনোফিনিসের পরবর্তী পারমানাইডিসের সমসাময়িক ও জেনোর বয়োজ্যেষ্ঠ। কালানুক্রমিকভাবে তিনি ইলিয়াটিক্‌সদের সমসাময়িক। হিরাক্লিটাস এশিয়া মাইনরের ইফিসাসের (Ephesus) অধিবাসী। তিনি ইফিসাসের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। তিনি নির্জন ও নিঃসঙ্গ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একজন অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি ছিলেন। মানুষকে অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা তাঁর একটা সহজাত প্রবৃত্তি ছিল। শুধু সাধারণ মানুষকেই নয়, তাঁর সময়কার অতি সম্মানিত ব্যক্তিদেরকেও তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি জেনোফিনিস্ ও পীথাগোরাসকে তীব্র নিন্দা করতেও কসুর করেন নি। হোমার (Homer)-কে ধরে এনে বেত্রাঘাত করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। হিসিয়ডকে (Hesiod) তিনি জনপালের (সাধারণ ইতর-শ্রেণীর লোক) সমপর্যায়ভুক্ত করে তাদের দলপতিরূপে কল্পনা করেন। "হিসিয়ড এমন এক ব্যক্তি, যিনি কিছুই বুঝেন না, এমন কি রাতের দিনের প্রভেদটুকুও বুঝতে অক্ষম।" সাধারণ লোকের প্রতি হিরাক্লিটাসের চরম অবজ্ঞা। তাঁর উক্তিগুলো আমাদেরকে সোপেনহারের (Schopenhaeur) উগ্রতা ও কটুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'গর্দভ স্বর্ণের চেয়ে খড়কে অধিক পছন্দ করে।' 'কুকুর প্রত্যেক অচেনা ব্যক্তির প্রতি গর্জন করে।' তাঁর উক্তিগুলো স্মরণীয় ও বাস্তব অভিজ্ঞতাপূর্ণ। 'মানবভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় তার চরিত্র দ্বারা।' রোগীকে অস্ত্র প্রয়োগে কেটে-চিরে তার নিকট থেকে পুনরায় অর্থের দাবি করা

চিকিৎসকের জন্য এক গর্হিত কাজ বলে তিনি মনে করেন। তিনি ইফিসাসের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। হিরাক্লিটাসের দর্শন-তত্ত্ব গদ্যাকারে লিখিত। তাঁর লেখা উক্তিগুলো জটিল ও দ্ব্যর্থ-বোধক। তাঁর লেখা বুঝা খুব কঠিন। তাঁর এই জটিলতার জন্যে লোকে তাঁকে তমসাচ্ছন্ন হিরাক্লিটাস ও দুর্বোধ্য হিরাক্লিটাস (Heraclitus, the Dark, Heraclitus, the obscure) নামে আখ্যা দিয়েছিল। তাঁর লেখা সম্বন্ধে সক্রেটিস বলেন, হিরাক্লিটাসের যে অংশ তিনি বুঝতে পেরেছেন, তা অতি উত্তম। যে-অংশ তিনি বুঝতে পারেননি, তাও উৎকৃষ্ট হবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন। তবে, হিরাক্লিটাসকে বুঝার জন্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন।

হিরাক্লিটাসের দর্শন-তত্ত্ব ইলিয়াটিক্‌স্‌ মতবাদের প্রত্যক্ষ বিরোধ। ইলিয়াটিক্‌স্‌গণ জীবন-সত্তাকে (Being) মেনে নেন ; কিন্তু পরিবর্তনকে নয়। গতি, বহু ও পরিবর্তন তাদের নিকট মায়া বা দৃষ্টিভ্রম মাত্র। কিন্তু হিরাক্লিটাসের মতে গতি ও পরিবর্তনই সত্য। জীবন-সত্তা ও স্থায়ীত্ব (Being Permanence) মিথ্যে। অবশ্য একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, জগতের সব কিছুই পরিবর্তনশীল। কোন কিছুই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। প্রত্যেক বস্তুই পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিত্য নতুনরূপ ও আকার ধারণ করেছে। হিরাক্লিটাস বলেন, "এক স্রোতে দ্বিতীয়বার অবগাহন করা একেবারেই অসম্ভব। এমন কি, একবারও সম্ভবপর নয়। কারণ, স্রোতের অংশবিশেষ স্পর্শ করার পূর্বেই সে স্রোত বাহিত হয়ে যায়। স্মৃষ্টির নিয়মও এর অনুরূপ। পলকে প্রলয় ঘটছে। দু'মুহূর্তের অবস্থা এক হতে পারে না। সব কিছু নিত্য-চঞ্চল, বহমান ও পরিবর্তনশীল। একই সূর্য প্রতিদিন উদয় হয়না এবং অস্তও যায় না। প্রতিদিন নিত্য-নতুন সূর্যের উদয় হয়। নদীর উত্তাল তরঙ্গ মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। সব কিছু পরিবর্তনশীল—এক ঘণ্টা স্থায়ী ক্ষুদ্র কীট থেকে শুরু করে সাময়িকস্থায়ী পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। উৎপত্তি ও বিলীন (Origination & Discease) এ নিয়েই জগত। পরিবর্তনকে, স্বীকার করে নিলেও, বস্তুর "আপেক্ষিক স্থায়ীত্বকে" (Relative

permanence)অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু, হিরাক্লিটাস এই আপেক্ষিক স্থায়ীত্বের অস্তিত্বটুকুকেও অস্বীকার করেন। বস্তু শুধু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনই হচ্ছে না—একই মুহূর্তে বস্তু আছে এবং নেই দুই-ই। একই সময় 'থাকা' (Being) এবং 'না-থাকা' (Not being) মানে হচ্ছে 'ঘটা' বা পরিবর্তন (Becoming)। ইলিয়াটিক্‌স্‌গণ সবকিছুতেই দু'টো সত্তা অবলোকন করেন। সত্তা এবং অসত্তা (Being & Not-being)। জীবন-সত্তা বা সত্তাই ইলিয়াটিক্‌স্‌দের নিকট প্রকৃত ও যথার্থ সত্তা। গতি, পরিবর্তন ও দৃশ্যমান জগত তাদের নিকট অসত্তা মিথ্যা বা দৃষ্টিভ্রম ; কিন্তু, হিরাক্লিটাসের নিকট 'সত্তা ও অসত্তা' 'স্থাবর ও অস্থাবর' উভয়ই সমভাবে সত্য। উভয়ই সত্য ; কারণ, তারা এক ও অভিন্ন। 'সত্তা ও অসত্তার একত্রে মিলনেই বস্তুর 'জন্ম' (Becoming) হয়। 'জন্ম' বা 'উন্মেষের' দুটো রূপ ঃ 'সৃষ্টি' ও 'লয়' (Origination & Discease) বা জন্ম ও মৃত্যু'। সত্তা ও অসত্তা সব বস্তুর মধ্যে একই সময় বর্তমান। সত্তাই অসত্তা। সত্তার ভেতরেই অসত্তা লুক্কায়িত। উদাহরণস্বরূপ, 'জন্ম-মৃত্যু সমস্যাটি ধরা যাক্। মানুষ কেন মরে, এর যুক্তি হল, মানুষ জীবন লাভের সাথে সাথেই মৃত্যুর বীজকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এ হচ্ছে জীবন-সত্তার বা অসত্তারূপ। জীবনের মাঝে আত্মলীন হয়ে অবস্থান করে মৃত্যু।

হিরাক্লিটাসের মতে, সত্তা-অসত্তা কেবল একাত্ম ও অভিন্নই নয়, প্রত্যেকটা বস্তুরই দু'টি বিরোধ-ধর্ম রয়েছে। এ দুই বিরোধ-শক্তির সমন্বয়েই (harmony of opposite tensions) সৃষ্টি হয় বস্তু। বস্তু বা দ্রব্যের অন্তরে রয়েছে দ্বন্দ্ব। বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব না থাকলে বস্তুর কোন অস্তিত্বই থাকত না। হিরাক্লিটাস বলেন, "দ্বন্দ্ব হল বস্তুর মূল" (strife is the father of all things)। "এক (one) একবার নিজকে বিযুক্ত করে আবার যুক্ত হচ্ছে ঠিক বাদ্যযন্ত্রের বেসুরো তানগুলো সম ও ঐকতানে পরিণত হওয়ার মত।" "ভগবান হচ্ছেন, শীত-গ্রীষ্ম, যুদ্ধ-শান্তি, তৃপ্ত ও অতৃপ্তের সমন্বয়।" "পূর্ণকে অপূর্ণে, সঙ্গতকে অসঙ্গতে, সুরকে বেসুরে যুক্ত করলে পর দেখা যায় যে, এক থেকে সমস্ত এবং সমস্ত থেকে একের

উৎপত্তি। ব্যষ্টি-সমষ্টির যোগ ফলই এর উপপাদ্য বিষয়। এই ব্যাপারে দেবতা ও মানুষের মধ্যে 'দ্বন্দ্বের' (strife) অবসান ঘটানোর নিমিত্তে হোমার (Homer) যে প্রার্থনা করে, হিরাক্লিটাস তার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, হোমারের এই প্রার্থনা মঞ্জুরীকৃত হলে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে জগতই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হিরাক্লিটাস তাঁর দর্শন-তত্ত্বের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানের (Physics) এক মতবাদ প্রচার করেন। সব বস্তু অগ্নি দিয়ে তৈরী। কোন দেবতা বা মানবজাতি এ জগত সৃষ্টি করেন নি। এ জগত জীবন্ত অগ্নিস্বরূপ (Living Fire)। এ জগত জীবন্ত অগ্নিরূপে বিদ্যমান ছিল—আছে এবং অনন্তকাল ধরে থাকবে। অগ্নি থেকে সবকিছুর উদ্ভব এবং অগ্নিতেই সবকিছু বিলীন হবে। সবকিছুর বিকল্পে অগ্নি এবং অগ্নির বিকল্পে সবকিছু। অগ্নি বস্তুর মূলাধার। অন্য সব উপাদানের চেয়ে অগ্নি সর্বাপেক্ষা পরিবর্তনশীল। অগ্নি অবিরামভাবে জ্বালানীর আকারে বস্তু সংগ্রহ করছে ও সমপরিমাণে বাষ্প ও ধুঁয়ারূপে বস্তু ছেড়ে দিচ্ছে। হিরাক্লিটাসের মতে, মূল অগ্নি বায়ু, বায়ু-পানি এবং পানি মৃত্তিকারূপে রূপান্তরিত হচ্ছে। অগ্নির এ বহমান ধারাকে তিনি নিম্নগামী পথ (Downword Path) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ নিম্নগামীর পথের সঙ্গে আবার বয়ে চলেছে উর্ধ্বগামী পথ (upword Path)। মৃত্তিকা যখন পানি, পানি-বায়ু এবং বায়ু যখন পুনরায় অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়, তখনই হয় এর উর্ধ্বগামী পথ। সমস্ত রূপান্তর এই নিয়ম-মাফিক চলছে বলে হিরাক্লিটাস উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী পথকে এক বলেন।

অগ্নিকে পুনরায় জীবন, প্রজ্ঞা বা বিচার বুদ্ধির (Life on Reason) সঙ্গে সনাক্ত করা হয়। অগ্নি বস্তুর প্রজ্ঞা। অগ্নি যত বেশী, জীবন ও গতি ততই সজীব। অগ্নির কমতিতে জীবন তমসাচ্ছন্ন। অগ্নির অত্যধিক কমতিতে জীবনে নেমে আসে শৈত্য (cold) ও মৃত্যু (Death)। আত্মা (Soul) অগ্নিস্বরূপ। মানবের কোন পৃথক আত্মা

নেই। মানবাত্মা সার্বিক অগ্নি-আত্মার (Universal Soul-Fire) অংশ ও সংযোগ বিশেষ। এ সংযোগ ছিঁড়ে গেলে, প্রজ্ঞাশক্তি হারিয়ে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে। নিদ্রা হল অর্ধ মৃত্যু। কারণ, নিদ্রায় ইন্দ্রিয়ানুভূত পথগুলো বন্ধ হয়ে যায়। হিরাক্লিটাস জগতের পর্যাবৃত্ত বা সাময়িক আবর্তের কথাও উল্লেখ করেন। অগ্নি থেকে জগতের উৎপত্তি এবং কালক্রমে নানা রূপান্তরের মাধ্যমে অগ্নি আবার তার আদি অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে।

ধর্মীয় ব্যাপারে হিরাক্লিটাস নাস্তিক ছিলেন বলে কথিত আছে। কিন্তু জেনোফিনিসের ন্যায় তিনি ধর্মের ও দেব-দেবীর নীতিবাক্যের প্রতি প্রত্যক্ষ কটাক্ষপাত করেন নি। তিনি ধর্মীয় বাহ্য আচরণের প্রতিই কেবল সমালোচনা করেছেন। মূর্তিপূজা ও আত্মনিবেদন প্রথাকে তিনি নিন্দে করেছেন। ইলিয়াটিক্‌সদের ন্যায় তিনি 'সংবেদন' (Sensation) ও 'প্রজ্ঞা' (Reason) মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে দেখতে পান। প্রকৃত ও যথার্থ সত্যকে তিনি প্রজ্ঞাশক্তির উপরই ছেড়ে দেন। হিরাক্লিটাস ভাল-মন্দ, সুখ, দুঃখকে একই মালায় গেঁথে জগতকে এক সুশৃঙ্খল সুষম সৌষ্ঠবমণ্ডিতরূপে চিত্রায়িত করার প্রয়াস পান।

পীথাগোরাস (Pythagoras)

দার্শনিক পীথাগোরাসের জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু একটা জানা যায় না। পীথাগোরাস আইওনীয় সম্প্রদায়ের লোক। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি সমোস নামক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম নিসার্কাস ; ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা ফেরিকাইসডিস্ এবং বৈজ্ঞানিক এ্যানাক্সিমেনডারের শিষ্য। পীথাগোরাস কিনিসিয়া, ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন প্রদেশ পরিভ্রমণ করে প্রাচ্যের ধর্মশাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করেন। ৫২৯ অব্দে তিনি গ্রীসে ফিরে এসে ক্রোটন নামক স্থানে ধর্ম, সমাজ-নীতি ও দর্শন শাস্ত্রের প্রচারার্থে একটা পীথাগোরীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। জীবনের বহু বছর তিনি এখানে কাটান। তাঁর শেষ জীবন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় না। পীথাগোরাসের

শেষ জীবন সম্পর্কে এরিস্টোক্সেনিস্ বলেন, "পীথাগোরাসের ধর্মমত এথেন্সে এক সময় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে কিন্তু শেষের দিকে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কাইলন নামক এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি পীথাগোরাস-সম্প্রদায়ভুক্ত হতে চাইলে তিনি তাতে অসম্মত হন। কাইলন অপমানিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। পীথাগোরাস এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ক্রোটন হতে মেটাপনটিনে পালিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

পীথাগোরীয় সম্প্রদায় ঠিক দার্শনিক সংস্থা বলতে যা বুঝায়, তা নয়; প্রকৃতপক্ষে এটা হল একটা ধর্মীয় ও নীতি বিধায়ক সম্প্রদায় অথবা বলা যায়, ধর্মীয় সংস্কারকদের একটা বিশেষ সম্প্রদায়। ওরফিক (Orphic) দলীয় লোকদের সাথে পীথাগোরীয়দের বেশ মিল দেখা যায়। ওরফিকদের আত্মার দেহান্তর এবং মানবাত্মা ও জীবাত্মায় পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি পীথাগোরীয়রা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। পীথাগোরাস 'বস্তু-চক্র' (Wheel of things) মতবাদ শিক্ষা দেন এবং এ থেকে 'মুক্তির' প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। ওরফিকদের ধর্মতত্ত্ব ও পুনঃ আবির্ভাব মতবাদে পীথাগোরাস নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বস্তু-চক্র' থেকে যে মুক্তি পাওয়া যায়, ওরফিকদের এ মতবাদের প্রতি পীথাগোরীয়রা বেশ আস্থাবান। জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা যে আত্মাকে 'বস্তু-চক্র' থেকে মুক্ত করতে পারে, এ কথা পীথাগোরীয়রা গভীরভাবে বিশ্বাস করে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিজ্ঞান ও দর্শনকে উন্নতি করার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রীক দর্শনে প্রথম বারের মত এখানে পরিলক্ষিত হয়।

পীথাগোরীয়ানদের নীতি-জ্ঞান খুবই কঠোর ও অত্যন্ত বৈরাগ্যপূর্ণ। পূত-পবিত্র জীবন ধারণের জন্যে তাঁরা অত্যন্ত জোর দেন। পীথাগোরাসের ধর্মীয় বিধানগুলো উপদেশের আকারে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বলতে গেলে, তাঁদের বিধানাবলীর অনুসরণে দেশ যেন একটা সন্ন্যাস রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু পীথাগোরাসের এ কঠোর সংযম শেষ পর্যন্ত

টিকে থাকতে পারে নি। তাঁর এ কঠোরতার বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ফলে, অচিরেই সন্ন্যাস-রাজ্যের পতন ঘটে। পীথাগোরাসের আদর্শ ও বিধানাবলীর মাঝে কতকগুলো বেশ উল্লেখযোগ্য। যেমন, (১) বরবটি খাওয়া থেকে বিরত থাকা। (২) পতিত দ্রব্য গ্রহণ না করা। (৩) সাদা মোরগ স্পর্শ না করা। (৪) রুটি না ভাঙ্গা। (৫) দণ্ড কাষ্ঠের দিকে অগ্রসর না হওয়া। (৬) লোহা দিয়ে অগ্নিকে উত্তেজিত না করা। (৭) সমগ্র রুটি না খাওয়া। (৮) মালা না তোলা। (৯) দু'পাইন্ট অর্থাৎ প্রায় তিন পোয়া-বিশিষ্ট পাত্রে না বসা। (১০) কলজে ভক্ষণ না করা। ... ...এ বিধি-নিষেধগুলো অবশ্য প্রাচীন কালের বিধি-নিষেধেরই অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পীথাগোরাস অবশ্যই নিজে মাংস খাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন নি। পীথাগোরীয়ানরা এক অদ্ভূত পোশাক পরিধান করত। কারণ, দেহ আত্মার বন্দীশালা এবং মন্দির স্বরূপ বলেই তাঁদের ধারণা। আত্মহত্যা করে মুক্তি পাওয়াকে তাঁরা এক জঘন্য ও গর্হিত কাজ বলে মনে করেন। মানুষ ভগবানের পরম সম্পদ—শুদ্ধতম সৃষ্টি। ভগবানের আদেশ ব্যতিরেকে কোন কিছুই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কেবল বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চাই মানুষকে সম্পূর্ণভাবে 'জন্ম চক্র' থেকে মুক্তি দিতে পারে।

পীথাগোরাসের নাম ইতিহাসে ও দর্শনে আজও সুপরিচিত। পীথাগোরীয়ান চিন্তা বা স্পেকোলেশনের কথা আজও শোনা যায়। পীথাগোরীয়ানরা শিল্প, ব্যায়াম, সংগীত, চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রের যথেষ্ট পরিচর্যা করেছিল। প্রাচীন গ্রীসের গণিত শাস্ত্রের উন্নতির পেছনে পীথাগোরাসের দান অপরিসীম। ইউক্লিডের (Euclid) ৪৭তম সিদ্ধান্ত পীথাগোরাসের আবিষ্কার। ইউক্লিডের প্রথম পর্বের (First Book) সারাংশ পীথাগোরাসেরই সৃষ্টি।

এবারে পীথাগোরীয়ান দর্শন-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক। পীথাগোরীয়ানদের মতে সব বস্তুই সংজ্ঞা জ্ঞাপক, সংখ্যার্থক। সংখ্যাহীন জগতের চিন্তা কেবল অলীক ও অবাস্তব কল্পনা। ওজন-

বিহীন এক জগতের কথা আমরা অন্ততঃ ভাবতে পারি। রূপ-রস-গন্ধ ব্যতিরেকে একটি জগতের কল্পনা আমরা করতে পারি। কিন্তু সংখ্যাহীন জগতের ভাবনা আমাদের কল্পনারও বাইরে। সব বস্তুকে সংখ্যায় পরিণত করা চলে। এ জন্যে পীথাগোরীয়ানরা সংখ্যাকে আদি-উপাদান বলে আখ্যায়িত করেন।

পীথাগোরীয়ান সম্প্রদায় সংখ্যার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। পীথাগোরাস ও তাঁর অনুসারিগণ উপাদানের জড়ভাগের প্রতি খুব বেশী একটা আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। যে শৃংখলায় উপর সৃষ্টি নির্ভর করে. যে ঐক্য, যে পরিমাণ, বিভেদের মধ্যে যে সামঞ্জস্য, দ্রব্যজাতের মাঝে অংকশাস্ত্রের যে-সূক্ষ্ম সম্বন্ধ, তাই তাঁদের চিন্তার বিষয়বস্তু ছিল। জ্যামিতি জ্যোতিষ এবং সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়গুলো চরমে সংখ্যায় পরিণত করা যায় বলে পীথাগোরীয়ানগণ সংখ্যাকেই জগতের বীজশক্তি এবং সৃষ্টির গূঢ়তম কারণ বলে মনে করেন। জগতের বস্তুজাত দ্রব্যগুলো সংখ্যার অভিব্যক্তি। পদার্থ মাত্রই সংখ্যার্থ সূচক। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সংখ্যাগুলোর ঐক্য সম্পাদন করা। মোটকথা, সংখ্যা থেকে জগতের উৎপত্তি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পীথাগোরীয়ানগণ তাঁদের এ মতবাদের বিস্তৃত বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁরা যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করেন। সংখ্যার একটা বিশেষ মূল্য আছে এবং সংখ্যা জগতের একটা প্রধান উপাদান—পীথাগোরীয়ানদের এ কথা স্বীকার করে নিলেও 'জগত সংখ্যা দিয়ে তৈরী' অথবা 'সংখ্যা নিয়ে জগতের সৃষ্টি' (The world is made of number) তাঁদের এ সিদ্ধান্তকে আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তাঁদের এ সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁরা যে যুক্তির অবতারণা করেন, তা'হল ঃ প্রথমতঃ সকল সংখ্যা এক 'একক' (Unit) সংখ্যা থেকে উদ্ভব। একক হল মুখ্য সংখ্যা। অন্যান্য সংখ্যা হল কতকগুলো একক সমূহের সমষ্টি মাত্র। কতকগুলো এককের সমষ্টি নিয়েই অন্য সংখ্যাগুলোর সৃষ্টি। মূলতঃ 'একক'ই হল মুখ্য ও জগতের আদি-সংখ্যা। সংখ্যাগুলোকে আবার যুগ্ম ও অযুগ্মে

বিভক্ত করা চলে। জগত জোড় বে-জোড় দু' রকম পরস্পর বিরোধী শক্তি দিয়ে গঠিত। পীথাগোরাসের মতে, জগত জোড়-বে-জোড় এ দু'দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। দ্বন্দ্ব ও বিরোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা যুগ্ম ও অযুগ্ম সংখ্যা দিয়ে তৈরী। এ যুগ্ম ও অযুগ্মগুলোকে পুনরায় যথাক্রমে সসীম ও অসীমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু কি ভাবে যে মিলন ঘটে, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, এ মিলন বা সংমিশ্রণ দ্বৈতদ্বান্দ্বিক-প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করেই হয়। যুগ্ম সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় বলে এটা দ্বি-ভাগকে সীমিত করে না। সুতরাং এটা অসীম। অযুগ্ম সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করা চলে না বলে এটা দ্বি-ভাগকে সীমিত করে ফেলে। সুতরাং এটা সসীম। সসীম এবং অসীম হল জগতের চরম সত্তা। সসীম এককের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এবং এটা আবার জগতের অগ্নি-কেন্দ্রের সংগে সংযুক্ত। সসীম প্রথমতঃ নিজে সংগঠিত হয়, তারপর প্রবল আর্কষণে নিজের দিকে টেনে অসীমকে সে সীমিত করতে চায়। সসীমের আর্কষণে অসীম সীমিত হয়ে গেলে পর তা' নির্দিষ্ট কোন এক বস্তুতে পরিণত হয়। এবং এভাবে জগতের দ্রব্যজাতের সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পীথাগোরীয়ানগণ জগত-গঠনে দশটি বিরোধপূর্ণ তালিকা তৈরী করেছেন। তার একটা রূপরেখা নেয়া যাক যথা—(১) সসীম ও অসীম। (২) যুগ্ম ও অযুগ্ম। (৩) এক ও বহু। (৪) ডান ও বাম। (৫) স্ত্রী ও পুরুষ। (৬) স্থিতি ও গতি। (৭) বাঁকা ও সোজা। (৮) আলো ও অন্ধকার। (৯) ভাল ও মন্দ। (১০) চতুর্ভূজ এবং আয়তক্ষেত্র।

এ মতবাদকে পরিণতির ক্রমপর্যায়ের ধারায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এটা স্বেচ্ছাচারী, গর্হিত ও নীতিহীন—এ ছাড়া আর কিছুই নয়। উদাহরণ স্বরূপ পীথাগোরীয়ানগণ 'এক'কে 'বিন্দু'. 'দুই'কে 'রেখা' 'তিন'কে 'সমতল' 'চার'কে কঠিন এবং 'পাঁচ'কে বস্তুগুণবিশেষ বলে ধরে নেন। 'ছয়' সজিব, 'সাত' বুদ্ধি, সুস্থতা, অনুরাগ এবং বিজ্ঞতা

ইত্যাদি। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের সাথে বিভিন্ন সংখ্যা বা অংকের মিল একেবারে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভশীল—কোন বিশেষ নীতিকে অবলম্বন করে নয়। কোন্ বিষয়কে কোন্ সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা যায় এ ব্যপারে পীথাগোরীয়ানগণ নিজেরাই একমত নন। যেমন, 'বিচার' বা 'ন্যায়' হল সমানুপাতিক সংখ্যা। আমি যদি একজনকে আঘাত করি, তবে 'বিচার' হল যে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিও আমার উপর অনুরূপ আঘাত করুক। এ ভাবে সমান সমান পাল্টা জবাবই হল বিচার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'বিচার' হল সমানুপাতিক এক সংখ্যা। এখন প্রশ্ন হল, এসব সমান সমান সংখ্যা কেবল বর্গ সংখ্যায় (Square number) মিলে। যেমন 'চার' সংখ্যার সমান হল ২×২=৪। দুই এবং দুই-এর সমান সমান বর্গগুলো সৃষ্টি হয় 'চারের'। সুতরাং 'চার' সংখ্যাটি হল বিচার। অনুরূপভাবে নয় (Nine) হল তিনের বর্গগুণ। সুতরাং 'নয়'কেও কেউ কেউ বিচার বলে অভিহিত করেন।

পীথাগোরীয় সম্প্রদায় জগত-গঠন ও তার অবয়ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। যে ধ্রুব ঐক্যের জাগরণ বা স্ফূরণ থেকে জগতের সৃষ্টি, তা একটি নিটোল বর্তুল রূপে কল্পিত হয়েছে। এটা অনন্ত শূন্যে লম্বিত এবং এর অংশসমূহ পরস্পর গাঢ় সন্নিবদ্ধ। এখানে 'পূর্ণ' এবং শূন্য দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশিত। সৃষ্টির পূর্বে শূন্য পূর্ণ আকাশবিহীন ছিল। অনন্ত আকাশ এর বাইরে অবস্থান করত। পরে যখন 'পূর্ণের' সঙ্গে শূন্যের ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হয়, তখন থেকেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এ সৃষ্টি প্রকরণ যেন একটি অনন্ত শ্বাসবায়ুর ক্রিয়া, যেখানে পৃথিবী সব-সময় স্পন্দিত হচ্ছে। বীজ কেন্দ্র স্বরূপ নিটোল বর্তুলটির মধ্যে শূন্যতা বিরাজমান থাকায় উহা শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং অসংখ্য সূক্ষ্মঅংশে বিভক্ত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক বিভক্ত অংশ বীজকেন্দ্রের এক একটি প্রতিকৃতি। জ্যামিতি নিয়মানুসারে যেমন গুণসংখ্যা ও অবয়বে পরিণত হয়, অনুরূপ উল্লেখিত বর্তুলের চূর্ণ অংশগুলো সংখ্যা ও অবয়বে প্রকাশিত হচ্ছে। অংশগুলো বিভিন্ন আকারে বিক্ষিপ্ত হলেও 'একের' আকর্ষণে এবং জ্যামিতিক নিয়মানুসারে পাঁচটি প্রধান

উপাদানের সৃষ্টি করেছে। এই পাঁচ উপাদানের নাম মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি এবং ঈথার। এদের মধ্যে অগ্নি শ্রেষ্ঠ এবং পিরামিডাকৃতি কণাসমূহে গঠিত। এর চারপাশে জগত ও অপার্থিব বস্তুসমূহ পরিভ্রমণ করছে। পীথাগোরাস স্বয়ং জগতের কেন্দ্রস্বরূপ একটি অগ্নিময় গোলকের কল্পনা করেছেন। পৃথিবীর যে অংশে মানুষের বসতি, সে অংশ ঐ গোলকের বিপরীতে থাকায় তা দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী এ গোলকের চারপাশে ঘুরছে। কেন্দ্র হতে বৃত্তগুলোর দূরত্ব ও আকর্ষণের সম্বন্ধবোধক সংখ্যা, বীণার তারের সাথে স্বরের সম্বন্ধবোধক সংখ্যার সমানুপাতিক। বৃত্তগুলো মেরুদণ্ডের চারিদিকে দ্রুত পরিভ্রমণ করে বলে এক প্রকার ঐকতান সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। কিন্তু তা সাধারণলোকে শুনতে পায় না। কেবলমাত্র সঙ্গীত-কলাবিদ্যা বিশারদ অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিই তা অনুভব করতে সমর্থ। এ ঐকতানই জগতের প্রাণ।

উপাদানগুলো নশ্বর এবং অসঙ্গতিপূর্ণ সে কারণে সম্মেলনের জীবদেহ নশ্বর। নির্দিষ্ট গতি অতিক্রান্ত করলে, যে যে উপাদানে দেহটি প্রস্তুত, তাদের অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বলে পীড়া ও মৃত্যু ঘটে। স্থূলদেহের অবস্থা এরূপ হলেও সূক্ষ্মদেহ বা আত্মার বিনাশ নেই। জীবাত্মা জগতাত্মার এক অংশ বা সংখ্যা। আধ্যাত্মিক ভাবে জীব অমর।

সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে পীথাগোরীয়ান পদ্ধতিকে কিছুই বলা চলে না। কারণ, এটা অত্যন্ত অপরিণত দর্শন-তত্ত্ব। সংখ্যাবাদের প্রকৃত প্রয়োগ সত্যি আমাদেরকে এক গণিত-রহস্যের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। তবে সে যাই হোক, সংখ্যাবাদের পথ প্রদর্শকদের দিয়েই যে গ্রীকদের চিন্তাস্রোতে একটা অত্যাবশ্যকীয় নব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল- তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এদের এই বিচ্ছিন্ন চিন্তা-প্রবাহের ধারায় বাহিত হয়েই আজকের বৈজ্ঞানিক দর্শন তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। তাই এরা দর্শনের ইতিহাসের পথিকৃৎরূপে অবশ্য স্মরণীয়।

এম্‌পিডক্‌লেস্‌ (Empedocles)

এমপিডক্‌লেস্‌ সিসিলী দ্বীপের আগ্রাগাস শহরের অধিবাসী। খ্রীস্ট-পূর্ব ৪৯৫ ও ৪৩৫ অব্দের মধ্যেই তাঁর জীবনকাল। পীথাগোরাসের মত তিনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। ধর্ম এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেকে জটিল রহস্যে আবৃত রাখতেন বলে লোকে তাঁকে যাদুকর বা দেবতা বলে অভিহিত করত। দর্শন বিষয়ে তিনি একটি উচ্চ ভাবময়ী কবিতা রচনা করেন। তিনি অত্যন্ত বাক্‌পটু ছিলেন। বাগ্মিতার জন্যে তিনি নিজেকে আগ্রাগাস গণতন্ত্রের একজন নেতা রূপে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এমপিডক্‌লেসের দর্শন বস্তুতঃ সারগ্রাহী (Eclectic)। এ পর্যন্ত গ্রীকদর্শন আদি-সত্তা প্রশ্নে বিভিন্ন দ্বন্দ্বপূর্ণ মতবাদের সম্মুখীন হয়েছে। এখন এমপিডক্‌লেসের প্রধান কর্তব্য হল পূর্ব-প্রচারিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা। এ সমন্বয় ক্রিয়া সাধনে এমপিডক্‌লেসের কৃতিত্ব থাকলেও এতে কোন বৈচিত্র্য বা নতুনত্ব নেই। জড়তত্ত্বের ইতি-হাসে এমপিডক্‌লেস এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেও তাঁর দর্শন কোন অভিনবত্বের দাবী করতে পারে না। পারমানাইডিসের দর্শন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁর তত্ত্বকে জড় এবং ভাববাদ উভয়ভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে। পারমানাইডিসের তত্ত্বে 'জড়' এবং 'ভাব' উভয়ই পাশাপাশি চলেছে। এখন এর যে কোন একটাকে জোর দিয়ে একজন ব্যক্তি জড়বাদী বা ভাববাদী নাম গ্রহণ করতে পারেন। এমপিডক্‌লেস পারমানাইডিসের বস্তুগত দিকটাকেই আঁক্‌ড়িয়ে ধরে তার সদ্ব্যবহার করেন। সত্তা যে অসত্তাতে এবং অসত্তা যে সত্তায় প্রবেশ করতে পারেনা, মূলতঃ এটাই হল পারমানাইডিস দর্শন তত্ত্বের মূলসুর। যা আছে, চিরকালই তা তেমনি অবস্থায় থাকে। (Whatever is remains forever what it is)। অর্থাৎ জড়বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে যে, বস্তুর কোন প্রারম্ভ বা শেষ নেই। বস্তুর কোন আদি-অন্ত নেই—বস্তু

অনুদ্ভূত ও অভিনশ্বর। (Unereated & indestructible)। মূলতঃ পারমানাঁইডিসের এ তত্ত্বকে এমপিডকলেস তাঁর স্বীয় মতবাদের প্রাথমিক স্থত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। অপরপক্ষে হিরাক্লিটাস দেখিয়েছেন যে, ঘটা বা উন্মেষ (Becoming) এবং পরিবর্তন (change) কে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ, এমপিডকলেস, হিরাক্লিটাসের এ মতবাদকেও তিনি স্বীয় মতবাদের দ্বিতীয় স্থত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। বস্তু কোন সময়ই জন্মলাভ করে না। বস্তুর উৎপত্তি ও লয় কোনটাই নেই। তথাপি কোন না কোন উপায়ে বস্তু আমাদের চোখের সামনে স্থষ্ট হয়ে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কি ভাবে যে তা হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন, কি উপায়ে এ পরস্পরবিরোধী ভাবধারাগুলোকে সমন্বিত করা যেতে পারে? বস্তু (Uncreated) অনুদ্ভূত ও অবিনশ্বর; তথাপি বস্তু উৎপত্তি হয়ে লীন হয়ে যাচ্ছে, এ কথা আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হলে তার একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, অনন্তরূপে বস্তুর (Us wholes) উৎপত্তি এবং লয় হলেও, বস্তুকণিকাগুলো (Particls) যা দিয়ে বস্তু তৈরী, তা অনুদ্ভূত এবং অবিনশ্বর। বস্তু উপাদানগুলো শাশ্বত ও অবিনশ্বর। এই চিন্তা বা মতবাদ এমপিডকলেসের তত্ত্বের সারবত্তা।

সকল বস্তুই যে কোন না কোন আদি জড় দিয়ে স্থষ্ট এ কথা আইওনীয় দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। থেলিসের মতে এ আদি-সত্তা হচ্ছে পানি। এ্যানাক্সিমিনিসের মতে, বায়ুই হচ্ছে বস্তুর আদিসত্তা। পানি বা বায়ুকে আদি সত্তা বলাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ আদি-সত্তাগুলোর রূপান্তর সম্ভবপর (Transformation)। পারমানাই-ডিস কিন্তু এ রূপান্তর বা পরিবর্তনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, বস্তুর কোন পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। এমপিডকলেসও এখানে পারমানাইডিসকে সমর্থন করে স্বীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর মতে, এক জাতীয় বস্তু (One kind of matter) অন্য জাতীয় বস্তুতে কখনও পরিবর্তিত হয় না। অগ্নি কখনও পানিতে কিংবা পানি মৃত্তিকাতে কখনও পরিবর্তিত হয় না। এমপিডক্-

লেসের এ ভাবধারা তাঁকে উপাদান রহস্যের এক নুতন সন্ধান দেয়। উপাদান শব্দটি আধুনিক কালের। এমপিডক্লেস অবশ্য এ শব্দটি ব্যবহার করেন নি, তবে তিনি উপাদানকে (Roots of all) মৌলিক বা আদি বলে অভিহিত করেছেন। এমপিডক্লেস পূর্ব প্রচারিত সমস্ত মতবাদের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে মৃত্তিকা, বায়ু, পানি এবং অগ্নি এ চার ধরনের মৌলিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেন। এমপিডক্লেস্ই এ চার উপাদানের শ্রেণীকরণ সৃষ্টি করেন। এ চার ধরনের মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন জাগতিক বস্তু সৃষ্টি হয়। সমস্ত জন্ম বা 'ঘটা, (Becoming) এ চার বস্তুর সংযতি (Composition) ও বিয়োজনের (Decomposition) ফল। এ চার বস্তুর উপাদানের সমানুপাতিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণে বস্তু জন্ম লাভ করে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, গতি ব্যতিরেকে উপাদানগুলোর সংযুতি এবং বিয়োজন কি ভাবে সম্ভব? আইওনীয় দার্শনিকগণ বস্তু যে নিজের মধ্যেই আপন গতি বহন করে চলেছে তা স্বীকার করে নেন। কিন্তু আইওনীয় দার্শনিকদের এ মতবাদ এমপিডক্লেস অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, বস্তু একেবারে নির্জীব ও মৃত—এতে গতির কোন চিহ্ন মাত্রও নেই। বস্তুর মধ্যে যদি গতি না থাকে, তবে আমাদিগকে অবশ্যই গতির বহিঃস্থ অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে। বহির্জগত থেকে গতি বস্তুর উপর গতিক্রিয়া সম্পন্ন করে। গতির বহিঃস্থ অস্তিত্বকে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে নতুবা উপাদানগুলোর মধ্যে সংযুতি এবং বিয়োজন সম্ভব নয়। সংযুতি এবং বিয়োজন যেহেতু দুই বিরোধভাবাপন্ন জগত ক্রিয়া, সুতরাং গতিও দুইবিরোধ-ভাবাপন্ন শক্তিবিশিষ্ট হবে। কবির ভাষায় এমপিডক্লেস তাদের একটিকে মিলন বা প্রণয় (Love) এবং অপরটিকে বিরহ বা (Hole) বিচ্ছেদ বলে অভিহিত করেছেন। অনুরাগ ও বিরাগ শব্দ দু'টো ভাববাদের ইঙ্গিত প্রদান করলেও এমপিডক্লেস কিন্তু তাদেরকে নিছক জড়রূপেই কল্পনা করেছেন।

এমপিডক্লেস পর্যায়ক্রমে জগত চক্রের (Priodic world eyeles)

কথা উল্লেখ করেন। জগত ক্রিয়া বর্তুলাকার। এর কোন প্রারম্ভ বা যবনিকা নেই। কিন্তু এ প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হওয়ার জন্যে কোন কিছু থেকে আমাদের আরম্ভ করতে হয়। মনে করা যাক, একটা মণ্ডল (Sphere) থেকে এর শুরু। মণ্ডল প্রথম পর্যায়ে এ চার উপাদান দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সংমিশ্রিত ছিল। এ উপাদানগুলো পারস্পরিক আন্তঃভেদ্য ছিল। পানি, বায়ু থেকে এবং বায়ু মৃত্তিকা থেকে আলাদা ছিল না। পানি, বায়ু, মৃত্তিকা ও অগ্নি সবগুলো একত্রে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলভাবে সংযুক্ত ও সংমিশ্রিত ছিল। মণ্ডলের যে কোন অংশে সম-পরিমাণে মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি ও পানি বিদ্যমান। চার উপাদানের এ সংযুতি, সংমিশ্রণ এবং মিলনে প্রণয়ের চরম আধিপত্য। মণ্ডলে যখন প্রণয়ের চরম প্রাধান্য, মণ্ডল তখন 'স্বর্গীয় দেবতা' (Blessed God) রূপ লাভ করে। বিচ্ছেদ কিন্তু তখন মণ্ডলের বাহিরে অবস্থান করে। বিচ্ছেদ ক্রমে ক্রমে পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। তারপর সুযোগমত বিচ্ছেদ তার ক্রিয়া আরম্ভ করে উপাদানগুলোকে পৃথক ও বিয়োজন করতে থাকে। এ পৃথক ও বিয়োজন ক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে, যে পর্যন্ত না সমজাতীয় বস্তুগুলো একত্রে মিশে যায়। এভাবে উপাদানগুলো সম্পূর্ণ পৃথক না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সমস্ত পানি একত্রে মিশে পানি, সমস্ত অগ্নি একত্রে মিশে অগ্নির সৃষ্টি করে। বিয়োজন ক্রিয়া যখন সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়, প্রণয়কে বিতাড়িত করে, বিচ্ছেদ তখন তার আধিপত্য বিস্তার করে। মণ্ডলে তখন বিচ্ছেদের প্রাধান্য। কিন্তু প্রণয় পুনরায় বস্তুতে প্রবেশ করে উপাদানগুলো মিলন ও সংমিশ্রণ ঘটায়। এবং এভাবে প্রণয় ক্রিয়া চলতে থাকে যে পর্যন্ত না যে জগতকে তার আদিস্বরূপে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। জগত যখন তার আদি স্বরূপ ফিরে পায়, তখনই আবার বিচ্ছেদের ক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে অনবরত পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের খেলা। এখন প্রশ্ন, আমাদের পৃথিবী এ চক্র-গতির কোন্ পর্যায়ে? উত্তরে বলা চলে, আমাদের পৃথিবী চূড়ান্ত মিলন বা বিচ্ছেদ কোনটাতেই নেই।

মিলন ও বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী অবস্থায় আছে। পৃথিবী এখন মিলনের পথ থেকে ক্রমে বিচ্ছেদের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং বিচ্ছেদ তার প্রাধান্য বিস্তার করতে চলছে। মণ্ডল থেকে বর্তমান জগত গঠনে প্রথমে যে উপাদান পৃথক হয়ে আসে তা হচ্ছে বায়ু, তারপর অগ্নি এবং পরিশেষে মৃত্তিকা। মৃত্তিকার দ্রুত আবর্তনের ফলে, মৃত্তিকা থেকেই পানি বের হয়ে আসে। আকাশ দ্বিভাগে তৈরী। প্রথম ভাগে অগ্নি এবং এটাই দিন বা দিবস বলে পরিচিত। অপরটি হল তিমিরাচ্ছন্ন বস্তু যার মধ্যে অগ্নি মাঝে মাঝে ছড়িয়ে আছে এবং এটাই হল যামিনী বা রাত্রি। প্রণয়ের কাজ উপাদান সকলের সমন্বয় সাধন করা, বিরহের কাজ উপাদানগুলোকে বিচ্ছেদ ঘটানো। প্রণয় প্রক্রিয়ার দ্বারা উপাদানগুলো পারস্পরিক মিলনে প্রথমতঃ একটা বর্তুলের আকার ধারণ করে। পরে বিরহের কার্য আরম্ভ হলে বর্তুলটি আপনা আপনিতেই বিভক্ত হয়ে যায়। পৃথিবী, সমুদ্র, বায়ু মণ্ডল, ইথার এবং নক্ষত্রপুঞ্জ এরূপ বিচ্ছেদ ক্রিয়া হতে উৎপন্ন হয়েছে। বর্তমানে সৃষ্টির মূলে যদিও দুই শক্তির কার্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, পরিণামে কিন্তু প্রণয়েরই জয় হবে। যে চার প্রধান অংশে জগত বিভক্ত, একদিন তারা প্রণয়ের আকর্ষণে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে এক অভিনব সৃষ্টি বিপর্যয়ের সংঘটন করবে। সৃষ্টি এবং ধ্বংসের এ পর্যায়ক্রম আবর্তন ও বিবর্তন নিয়তি প্রতিষ্ঠিত। কোন কালেই এদের বিরাম নেই।

এমপিডক্লেস এ্যানাক্সিমেনডার ও হিরাক্লিটাসের মত জীবসৃষ্টি কার্যকে বিবর্তন কার্য বলে নির্দেশ করেছেন। তবে পার্থক্য এই যে, এমপিডক্লেসের মতে, জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো প্রথমে গঠন বিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। তারপর সৃষ্টির গণ্ডীর মধ্যে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন ও সংযোগ-বিয়োগের ফলে, ক্রমশঃ দেহবিশিষ্ট এবং কার্য সাধকত্ব গুণ প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে যথাস্থানে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়েছে। প্রথম জীব সৃষ্টি দৈব বা ঐশীক্রিয়ার ফল। আত্ম-সংরক্ষণ, কার্যক্ষমতা এবং পুষ্টিলাভ প্রভৃতি গুণ পরবর্তী কালের ঘটনা।

"এমপিডক্লেস আত্মাকে অগ্নিশিখা বলে মনে করেন। বিরোধ-ভাবাপন্ন হওয়ার দরুন আত্মা স্বাভাবিক অবস্থা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশঃ জীবদেহে প্রবেশ করেছে। জীবদেহ ধারণ করলেও আত্মা কিন্তু তার পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে। উদ্ভিদ, ইতর প্রাণী এবং মানব এ তিনস্তরের মধ্যে দিয়ে আত্মা উন্নতি লাভ করে। জীবের চরম উৎকর্ষ মানব। মানবজাতির সৃষ্টি হতে সৃষ্টিক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়—আত্মা সহজে মানব স্তরকে অতিক্রম করতে পারে না। মানব বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিবিম্ব। এতে চার মূল ও স্বতন্ত্র উপাদান একাধারে মিলিত হইয়েছে। দেহের কঠিন অংশগুলোকে মৃত্তিকা, তরল অংশকে পানি, প্রাণকে বায়ু এবং তেজকে অগ্নি বলা যায়। প্রণয় এবং ঘৃণা মানব প্রকৃতির দুই প্রধান লক্ষণ। মানব যে বুদ্ধিত্তিত্বে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ, তার কারণ, জগতের সমস্ত গুণ মানব প্রকৃতিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।"

"ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে এম্পিডক্লেস্ তার জড়-মূলক উপাদানগুলোকে নামেমাত্র জাতীয় দেবতার আবরণ দিয়েছেন। তাঁর ধর্মতত্ত্বের মূলে পরমাণুবাদ, দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের আভাস থাকলেও, সবারই উদ্দেশ্য কিন্তু এক। একেশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা। প্রেমকে তিনি শ্রেষ্ঠাসন দিয়েছেন। চারটি উপাদানের সকলেই প্রেমের আজ্ঞাবহ, বিচ্ছেদ প্রেমের সহচর। প্রেমকে অনির্বচনীয়, অদৃশ্য এবং অশরীরী দেবতা বলা যায়। বিদ্যুত প্রভার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে তার চেতনা শক্তিতে জগত উদ্ভাসিত হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

এ্যানাক্সেগোরাস এবং পরমাণুবাদ

এ্যানাক্সেগোরাস (Anaxagoras)

আইওনিয়ার অন্তর্গত ক্লাজোমিন শহরে কোন এক বিখ্যাত পরিবারে এ্যানাক্সেগোরাস জন্ম গ্রহণ করেন। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে তাঁর জন্ম। তিনি বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার জন্য তিনি সব কিছুকে উপেক্ষা করেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শন-জ্ঞান লাভের জন্য তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করে এথেন্সে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এবং এখানেই তিনি তখনকার বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ পেরিক্লিস এবং কবি ইউরিডিপাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। চন্দ্র-সূর্য সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্যজনক ধারণা ছিল। সূর্য একটা লাল উত্তপ্ত পাথরখণ্ড বলে তাঁর বিশ্বাস। আর চাঁদ মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী বলে তাঁর ধারণা। এখানে বলা বাহুল্য যে, প্রাচীন গ্রীকবাসীরা জ্যোতির্মণ্ডলীকে দেবতা জ্ঞান করত। এমনকি প্লেটো, এরিস্টোটল পর্যন্ত নক্ষত্রপুঞ্জগুলোকে 'ঐশ্বরিক' বলে কল্পনা করে গেছেন। কিন্তু এ্যানাক্সেগোরাস দেবতুল্য চন্দ্র সূর্যকে মৃত্তিকা ও পাথর বলে অভিহিত করায় গ্রীকরা তাঁকে নাস্তিকরূপে অভিহিত করলো। তাঁর বিরুদ্ধে দেবতা অপমান এবং নাস্তিকতার অভিযোগ আনা হয়। তাঁর শাস্তি এবং প্রকাশ্য নিন্দার দাবী জানানো হয়। শাস্তির বর্ণনা এবং তাঁর পরবর্তী বিবরণ কোনটাই আর জানা সম্ভব হয় নি। তবে অনুমান করা হয় যে, তিনি পেরিক্লিসের সহযোগিতায় এথেন্স ত্যাগ করে স্বদেশে যেতে সমর্থ হন। পরে তিনি লেম্‌সসাসে বসতি স্থাপন করেন। এবং এখানেই ৭২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর দর্শন-মত সমন্বিত একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ সক্রেটিসের সময়ে খুব নাম করেছিল। এ গ্রন্থের টুক্‌রো টুক্‌রো অংশ এখনও এখানে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে।

এ্যানাক্সেগোরাসের দর্শন-তত্ত্ব এম্‌পিডকলেস এবং পরমানুবাদীদের অনুরূপ। "জন্মব্যাপার" বা ঘটা (Becoming) কে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। 'সত্তা' 'অসত্তায়' বা 'অসত্তা' 'সত্তা' অতিক্রম করতে পারে না। বস্তু স্বয়ং অনুভূত ও অবিনশ্বর। 'জন্মব্যাপার' বস্তুর উপাদান সমূহের সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণের ফল। "গ্রীকরা" এ্যানাক্সেগোরাস বলেন, "অনর্থই বস্তুর উৎপত্তি ও লয়কে স্বীকার করে নেয়, বস্তুতঃ কোন কিছুরই উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটে না, সবকিছুই পূর্ব-অবস্থিত বস্তুর উপাদানসমূহের সংমিশ্রণ ও বিমিশ্রণের ফল। সৃষ্টির এ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে আমরা সংযুতি (Composition) এবং বিয়োজন বলে অভিহিত করতে পারি।"

একই জাতীয় বস্তু দিয়ে গঠিত পরমাণু বস্তুর আদি বা মূল উপাদান। পরমাণুবাদীরা একই প্রকারের বস্তু দিয়ে গঠিত পরমণুকে বস্তুর মূল উপাদান বলে মনে করেন। মৃত্তিকা, বায়ু, পানি এবং অগ্নি এ চার প্রকারের মূল উপাদান আছে বলে এমপিডকলেস্‌ বিশ্বাস করেন। এ্যানাক্সেগোরাস কিন্তু তাদের কোনটাকেই স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি সমভাবেই মূল, আদি এবং অনুদ্ভব। স্বর্ণ, রোপ্য, পানি, বায়ু, সবই মূল এবং আদি—তারা কিছু থেকে উদ্ভব নয় এবং কিছুতে রূপান্তরিত বা অতিক্রমও করে না। বস্তুকে অসংখ্যভাবে ভাগ করতে করতে এক 'অবিভাজ্য পরমাণুতে' পৌঁছানো যায়, পরমাণুবাদীদের এ মতবাদও এ্যানাক্সেগোরাস অস্বীকার করেন। বস্তু অনন্তভাবে বিভাজ্য বলে তিনি বিশ্বাস করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিভিন্ন প্রকারের বস্তুগুলো তালগোল পাকিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে একসঙ্গে সংমিশ্রিত ছিল। এ স্তূপাকৃত বস্তু স্তূপ (Man) মহাশূন্যে অনন্তভাবে প্রসারিত। বিভিন্ন জাতীয় বস্তু সম্পূর্ণরূপে পারস্পরিক সংমিশ্রিত ও অন্তর্ভেদী অবস্থায় ছিল। বিয়োজন পিণ্ডীভূত বস্তুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে জগতগঠন ক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে, সমজাতীয় বস্তু উপাদান একত্রীভূত হতে থাকে। যেমন, সকল স্বর্ণকণিকা পিণ্ড থেকে আলাদা ও পৃথক হয়ে একত্রে মিশে স্বর্ণ-বস্তু গঠন করে। তেমনি কাষ্ঠ, লৌহ

ও পিতল পিণ্ড থেকে পৃথক হয়ে বিভিন্ন জাতের বস্তু গঠন করে। কিন্তু বস্তু বা জড় অনন্তভাবে বিভাজ্য হওয়ায় তাদের আদি বা মূল-মিলনও অনন্তভাবে প্রসারিত। অতএব, বিয়োজন প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটাতে অনন্ত সময় নেবে। অর্থাৎ বিয়োজন ক্রিয়া এখন চলছে, চলবে এবং চলতে থাকবে। বস্তুর একেবারে বিশুদ্ধ ও পবিত্র উপাদানেও অন্য জাতীয় বস্তুর কিছু না কিছু কণিকা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে, বস্তু তার বিশুদ্ধ অবস্থায় নেই। যেমন স্বর্ণ সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি, স্বর্ণ হল এমন বস্তু যার মধ্যে স্বর্ণ কণিকার প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী।

বিচ্ছেদে জগত-ক্রিয়া শুরু, এ কথা বিশ্লেষণের জন্য এমপিডকলেস ও পরাণুবাদিদের মতন এ্যানাক্সেগোরাসও একটা 'গতিশক্তি'র প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এখন প্রশ্ন ঃ এ্যানাক্সেগোরাস গতি বলতে কি বুঝেন? এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তাতে দেখা যায় যে, এ্যানাক্সেগোরাসের দর্শনতত্ত্ব তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক এমপিডক্লেস ও পরমাণুবাদিদের চাইতে কোন নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মচিত করতে পারেননি। কিন্তু এখানে, এ গতিশক্তি প্রশ্নে এ্যানাক্সেগোরাস এক সুন্দর অভিনব তত্ত্ব দিয়ে আমাদের নিকট এক মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। "অনুরাগ" (Love) এবং "বিরাগ" (Hate) এ দু'টোকে এমপিডক্লেস্ গতির উৎস বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর 'অনুরাগ' ও 'বিরাগ' একদিকে যেমন রূপকথার কাহিনী বলে মনে হয়, অন্যদিকে আবার তেমনি তাকে প্রাকৃতিক বা জড় (Physical) বলেই মনে হয়। পরমাণুবিদ্‌গণ এ শক্তিকে জড় বলেই মনে করে। কিন্তু এ্যানাক্সেগোরাস, এ গতিকে সম্পূর্ণরূপে অজড়, অতি প্রাকৃতিক এবং অশরীরী বলেই কল্পনা করেন। তিনি ইহাকে 'চৈতন্য', চেতস' 'মনন', বা বুদ্ধি বলে অভিহিত করেন। প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি সমগ্র বস্তুর মধ্যে গতি সঞ্চার করে জগত-গঠন সৃষ্টি করছে। এখন দেখা যাক্, কি লক্ষ্য করে এ্যানাক্সেগোরাস প্রজ্ঞায় প্রশাসিত এ জগত এ মতবাদে উপনীত

হলেন। মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তীতা ও সৌন্দর্য দেখে এ্যানাক্সেগোরাস মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, জগতের এ সুশৃঙ্খল কার্যকলাপ কেবল এক অন্ধ যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য অণুশক্তির প্রয়োগে সৃষ্টি হতে পারে না। যান্ত্রিক অণুশক্তি অনিয়মিত এবং এলোমেলো বস্তুর উপর গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হলেও, তা দিয়ে এক সুনিয়ন্ত্রিত জগতের সৃষ্টি সম্ভব নয়। যান্ত্রিকশক্তি জড়পিণ্ডের উপর গতি এবং পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু এ গতি এবং পরিবর্তন একেবারে যথেচ্ছ এবং উদ্দেশ্যহীন। একটা বিশৃঙ্খল ও অনিয়ম অনির্দিষ্ট-ভাবে অন্য এক বিশৃঙ্খল ও অনিয়মের সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু, নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন যুক্তি বা প্রজ্ঞার। আমাদের এ সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব প্রকৃতি একটা বিশেষ প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত। এ প্রজ্ঞা শক্তিকেই এ্যানাক্সেগোরাস তাঁর ভাষায় 'চেতস' বা Nous নামে অভিহিত করেন। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচালনার পেছনে রয়েছে চেতসের অপূর্বশক্তি। এ্যানাক্সেগোরাসের চেতস বা প্রজ্ঞার স্বরূপ কি? এ কি জড়বহির্ভূত ও অশরীরী! এরিস্টটল এ্যানাক্সেগোরাস-এর 'চেতস'কে অজড় ও দেহহীন বলেই মনে করেন। আধুনিক দার্শনিক জেলার এবং এ্যাডমেনও 'চেতস'কে দেহহীন বলেন। কিন্তু গ্রোটে এবং বার্নেট এ্যানাক্সেগোরাসের 'চেতস'কে জড়শক্তি বলেই কল্পনা করেন। কারণ, তাঁরা উল্লেখ করেন যে, এ্যানাক্সেগোরাস তাঁর 'চেতস'কে 'বস্তুর বিশুদ্ধ এবং সূক্ষ্মতম' (Thinest & purest of all things) বলে বর্ণনা করেন। তিনি চেতসকে 'অমিশ্রণ' (unmixing) বলেও আখ্যায়িত করেছেন। অধ্যাপক বার্নেট যুক্তির অবতারণা করে বলেন, 'সূক্ষ্ম', 'বিশুদ্ধ' এবং 'অমিশ্রণ' শব্দগুলো কেবলমাত্র জড়বস্তুর উপরই প্রযোজ্য, কোন দেহাতীতের উপর নয়। অধ্যাপক বার্নেট পুনরায় উল্লেখ করেন যে, এ্যানাক্সেগোরাসের 'চেতস' দেশ বা স্থান (Space) দখল করে আছে, কারণ, এ্যানাক্সেগোরাস ছোট-বড় চেতসের কথা উল্লেখ করেছেন। ছোট-বড় কথা বলতেই স্থান-সম্পর্কিত

হয়ে যায়, এবং যা দেশ-সম্পর্কিত তা বস্তু বা জড়বিশেষ। বস্তুতঃ 'চেতস' জড়ের নামান্তর। অধ্যাপক বার্নেটের যুক্তি অকাট্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল ব্যাপার হল, এখানে এ জায়গায় এ্যানাক্সেগোরাস এক ইন্দ্রিয়াতীত (Non-sensuoas) কে বুঝাতে গিয়ে বস্তু জগতের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো ইন্দ্রিয়ানুভূত নয়। দ্বিতীয়তঃ, ছোট-বড় বললেই বস্তু দেশ জুড়ে আছে বলা যায় না। এরিস্টটলের 'মন' কালিয়াসের মন থেকে বড়, এ কথা বললেই বক্তাকে জড়বাদী মনে হবে কেন? আসল কথা, এক অতীন্দ্রিয় বিস্ময়-শক্তিকে বুঝতে গিয়ে এ্যানাক্সেগোরাস এ দৃশ্যমানজগত থেকে সাহায্য নিয়েছেন; কিন্তু এ জন্য তাঁকে জড়বাদী বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। তাঁর দর্শনে 'চেতসের' উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাগতিক বস্তুকে নিয়মমাফিক ব্যাখ্যা করা এবং চেতস-শক্তি ভিন্ন তিনি তা করতে সক্ষম ছিলেন না। কেবলমাত্র জড় দিয়ে জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

চেতস গতির আধার। গতির মূলাধার হিসেবে চেতস নিজে অনড়, কারণ, চেতস গতিসম্পন্ন হলে অন্তগতির মূলাধার হতে পারে না। যা সমগ্র গতির কারণ, তাকে অবশ্যই অনড় ও অপরিবর্তনীয় হতে হবে। চেতস বিশুদ্ধ, পরম-পবিত্র এবং অমিশ্রিত; এতে অন্য কোন উপকরণ নেই। নিজের জন্যই তার প্রকাশ, আপন সত্তায় সে পূর্ণ এবং কেবল নিজের জন্যই তার অস্তিত্ব। চেতস পূর্ণ, স্বাধীন এবং স্বয়ংক্রিয়। প্রশ্ন জাগে, এ্যানাক্সেগোরাসের 'চেতস' কি ক্রিশ্চিয়ান ঈশ্বরের মতন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন? জেলার বলেন, 'ব্যক্তিত্ব' কথাটাকে আমরা এখন যেভাবে গ্রহণ করি, প্রাচীন গ্রীকবাসিদের 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে এরূপ ধারণা ছিল না। 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা একেবারে অত্যন্ত ক্ষীণ ও অপরিস্ফুট ছিল। অতএব 'চেতস' ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিনা, এর কোন সুস্পষ্ট জবাব এখানে দেওয়া চলে না। কারণ, ব্যক্তিত্ব প্রশ্নটি সম্পূর্ণ আধুনিক—কোন গ্রীক চিন্তানায়ক কোন দিন এর আলোচনা করেননি।

জগৎ সৃষ্টি নয়, জগৎ-গঠনই হল চেতসের প্রধান কাজ। (World forming not world creating) মনন ও জড় অনন্তকাল ধরে পাশা-পাশি অবস্থান করছে। চেতস বস্তু সৃষ্টি করে না বটে, কিন্তু বস্তুকে সে কেবল সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলে (But only arranges it) এ্যানাক্সেগোরাস বলেন, "সমগ্র বস্তু একত্রীভূত ছিল। সংখ্যায় তারা অগণ্য ও অনন্তভাবে ক্ষুদ্র (Infinitely numerous & Infinitely Small) তারপর চেতস বা প্রজ্ঞা এসে এদেরকে অর্থপূর্ণ করে সাজিয়ে তুলে"। এখানে এ্যানাক্সেগোরাসের স্বকীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে বিভিন্ন প্রকারের বস্তু বিশৃঙ্খল ও অনিয়মিতভাবে একত্রে পুঞ্জিভূত ছিল। চেতস এ পিণ্ডির মধ্যে কোন এক বিন্দুতে ফাঁক বা শূন্যের সৃষ্টি করে। তারপর এ শূন্য জড়পিণ্ডের বহির্দিকে নিজকে ছড়িয়ে দেয়, যেমন করে শান্তজলে পতিত পাথর তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলে এবং অনন্ত জড়পিণ্ড থেকে জড় বা বস্তুকে কিছু কিছু করে অনবরত নিজের দিকে টানতে থাকে। এ প্রক্রিয়ার শেষ নেই। ক্রমে ক্রমে সমজাতীয় বিচ্ছিন্ন পদার্থগুলোকে একত্রীভূত করে ফেলে। যেমন, বিক্ষিপ্ত সমগ্র স্বর্ণ-কণিকাগুলো একত্রে মিশে স্বর্ণবস্তু গঠন করে। অনুরূপভাবে গঠিত হয় কাষ্ঠ, লৌহ, জল এবং আরও নানাজাতীয় বস্তু। লক্ষ্য করার বিষয় যে, চেতসের কাজ হল শুধু প্রথম গতি সঞ্চালন করা। এরপর স্বাভাবিকভাবেই সবকিছু ঘটে যায়। প্রথমে, হালকা, শুষ্ক এবং উষ্ণ কণাগুলো পৃথক হয়ে বের হয় এবং এরা ঈথার বা উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডল গঠন করে। তারপরই আর্দ্র-গভীর, শৈত্য ও ঘন কণাগুলো বের হয়ে নিম্নস্তরের বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করে। আবর্তন শেষোক্তটাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে নেয় এবং এথেকেই জগৎ গঠিত হয়। জগৎ বায়ুমণ্ডলের উপর ভাসমান একটা চেপ্টা থালার মতন (flat disc)। প্রবল ঘূর্ণনের ফলে পিণ্ড থেকে ছিটকে-পড়া পাথর কণাগুলো জ্যোতিষ্কগুলের সৃষ্টি করে। চন্দ্রমৃত্তিকা দিয়ে গঠিত এবং সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত। চন্দ্রে আলোকের প্রকৃত কারণ হিসেবে এই প্রথম ব্যাখ্যা এবং এ্যানাক্সেগোরাসই

তার পথ প্রদর্শক। গ্রহণ (Eclipse) সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তিনি প্রথম প্রদান করেন। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে চন্দ্রের বাঁধাই (intervention) সূর্যগ্রহণের কারণ। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে বলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। আমাদের এ জগতের বাইরেও আরও জগৎ আছে বলে এ্যানাক্সেগোরাসের বিশ্বাস। ঐসব জগতও আমাদের এ পৃথিবীর মত বসতিপূর্ণ। ঐসব জগতেও চন্দ্র-সূর্য বর্তমান আছে। জগতে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হল এই যে, বায়ুমণ্ডলে বীজাণুগুলো পানি এবং বৃষ্টির দ্বারা এখানে আনিত হয়। পরে কালক্রমে এগুলো পুষ্টি সাধনে ফলবতী হয়ে উঠে এবং এ থেকেই জীবন ও প্রাণের উৎপত্তি হয়।

এ্যানাক্সেগোরাস তাঁর 'চেতস' মতবাদের জন্যে দর্শন-ইতিহাসে এক বিরাট স্থান দখল করে আছেন। তিনিই প্রথম দেহ ও দেহাতীতের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেন। সৃষ্টি যে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এ কথা তিনিই প্রথম দর্শনে উত্থাপন করেন। তাঁর এ নতুন সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে প্লেটো ও এরিস্টটল তাদের দর্শন ও তত্ত্ব সুচারুরূপে গড়ে তুলেন। জড় এবং মানস সত্তা, যন্ত্র এবং উদ্দেশ্য এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ও গৌরব একমাত্র এ্যানাক্সেগোরাসের।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ দু'টো ধারণাকে সুস্পষ্টরূপ দিতে গিয়ে এ্যানাক্সেগোরাস কতগুলো ত্রুটির সম্মুখীন হন। প্রথমতঃ, তিনি জড় ও মানস, সত্তাকে এমনভাবে পৃথক করে দেখেছেন যে, শেষপর্যন্ত এ এক দ্বৈতবাদে পরিণত হয়েছে। জড় ও মনকে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই পাশাপাশি রেখেছেন—এ দুটোই তাঁর নিকট পরম সত্তা, দুটোই অজোদ্ভব (underived) এবং দুটোই তাঁর কাছে সমান সত্য। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর উদ্দেশ্যমূলক চেতস জড় এবং যান্ত্রিকবাদেরই নামান্তর। চেতসকে গ্রহণ করাই হল এ কারণে যে, এ ব্যতিরেকে এ্যানাক্সেগোরাস জগৎ-গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না। তাঁর চেতসের প্রধান কাজ হল, জগত-গঠনে প্রথম গতিসঞ্চালন করা। এবং এ করেই

চেতসের কাজ শেষ। বাকী সবকাজ আবর্তনের দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ্যান্যাক্সেগোরাসের চেতনও ঠিক যেন একটা যন্ত্রের মতিই কাজ করছে। এরিস্টটল বলেন, এ্যান্যাক্সেগোরাস চেতসকে জগৎ গঠনের একটা যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছেন, যখনই তিনি কোন কিছুকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়েছেন, তখনই তিনি এ শক্তিকে ব্যবহার করেছেন। এ শক্তি যেন যান্ত্রিকবাদেরই এক নতুন পর্যায় ও প্রক্রিয়া-বিশেষ।

পরমাণুবাদ (Atomisme)

লিওকিপাস (Leucippus) পরমাণু-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর দেশ, জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। তবে তিনি দার্শনিক এমপিড-ক্লেস ও এ্যানাক্সেগোরাসের সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয়। ডিমক্রিটাস (Democretus) দার্শনিক লিউকিপাসের শিষ্য। তিনি থ্রেইসের এবেডোরা নগরের অধিবাসী। তিনি তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী এবং শিক্ষিত বলে পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন এবং আধুনিক জড়বাদীদের নেতারূপে আজও তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁর লিখিত অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হলেও কিছু কিছু অংশ এখনও পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ঈজিপ্ট এবং সম্ভবতঃ ব্যবিলন পরিভ্রমণ করেন। পরমাণু-দর্শনে লিউকিপাস ও ডিমক্রিটাসের ভূমিকা এবং সঠিক দানের তথ্য আজও অজ্ঞাত। তবে, পরমাণুবাদের মূল তত্ত্বগুলো যে লিউকিপাসের সৃষ্টি, একথা সকলেই বিশ্বাস করেন। ডিমোক্রিটাস্ লিউকিপাসের তত্ত্বগুলোকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও প্রত্যক্ষ প্রয়োগে এ মতবাদকে সম্প্রসারিত করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই লিউকিপাসের তত্ত্বগুলো একটা বিশেষ মতবাদ হিসেবে দর্শন-ইতিহাসে খ্যাতির আসন লাভ করে।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, এম্পিড্‌ক্লেস্, পারমানাইডিস ও হিরাক্লিটাসের মতবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করেন। এমপিড্‌কলেসের মূলতত্ত্ব হল চরম (Absolute) 'জন্মব্যাপার' (Becaming)-

বস্তুতে কিছু নেই। সত্তা থেকে অসত্তায় বা অসত্তা থেকে সত্তায় কোন প্রবেশ পথ নেই। কিন্তু তবু কোন না কোন উপায়ে বস্তুর উৎপত্তি এবং লয় যে হচ্ছে, তা আমাদের অস্বীকার করার কোন জো নেই। বস্তুর এ উৎপত্তি ও লয়কে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শুধু এটুকু বলা চলে যে, অনন্ত হিসেবে (Object as wholes) বস্তুর উৎপত্তি এবং লয় ঘটে। কিন্তু যে বস্তুকণিকা দিয়ে (Material particles) বস্তু তৈরী, তা চিরন্তন ও শাশ্বত। কিন্তু এ মতবাদের পূর্ণ ব্যাখ্যা এমপিডকলেস্ সন্তোষজনকভাবে দিতে পারেন নি। কতকগুলো খণ্ডাংশ দিয়েই যদি বস্তুর সৃষ্টি হয়, এবং জন্মব্যাপার যদি পূর্ব অস্তিত্বমান জড়ের (pre existing matter) সংমিশ্রণ ও বিচ্ছেদেই ঘটে, তবে আমাদের অণু পরমাণু সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট মতবাদ ও জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। আমরা অবশ্য এমপিড্‌ক্লেসের কাছ থেকে পরমাণুর একটা অস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাই। কিন্তু তিনি পরমাণুর একটা যথার্থ সংজ্ঞা দিতে পারেন নি। ফলে, পরমাণুর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা কোন সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারি নি। এ ব্যতিরেকেও, গতিশক্তি হিসেবে এমপিডক্লেসের 'প্রণয়' ও 'বিচ্ছেদ' কে রূপকথার গল্প বলেই মনে হয়। পরিশেষে, বস্তুর গুণ পরমাণুর সুবিন্যস্ত অবস্থানের উপর নির্ভরশীল একথা বললেও এম্‌পিড্‌কলেস এ ধারণাকে সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। তবে যাই হোক না কেন, এমপিডকলেসের তত্ত্ব এবং মতবাদকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে পরমাণু মতবাদের সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে পরমাণুবাদ এম্‌পিডক্লেসের অস্পষ্ট তত্ত্ব-ধারণার সুস্পষ্ট প্রকাশ।

এবারে পরমাণুবাদীদের কথায় আসা যাক্। প্রথমতঃ, পরমাণুবিদ্‌গণ পরমাণুমতবাদকে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন। লিউকিপাস ও ডিমক্রিটাসের মতে কোন জড়বস্তুকে ক্রমাগতভাবে ভাগ করতে থাকলে তার আয়তন অথবা আকৃতি ক্রমশঃই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়বে। জড়বস্তুকে এভাবে ভাগ করতে থাকলে শেষ-পর্যন্ত বস্তুকণিকাগুলো এত ক্ষুদ্র হয়ে যাবে যে, সেগুলোকে আর ভাগ করা সম্ভব হবে না। এসব অবিভাজ্য অথবা সরলতম বস্তুকণিকার

নামই হচ্ছে পরমাণু। এ পরমাণু হচ্ছে বস্তুর আদি-উপকরণ (cteai-tuents)। পরমাণু সংখ্যায় অসংখ্য এবং এরা ইন্দ্রিয়ানুভূত নয়। এমপিডক্লেস চার ধরনের মৌলিক-উপাদানের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু পরমাণুবাদীদের মতে, তা শুধু এক প্রকারের। ঠিক একই প্রকারের বস্তু (Same kind of matter) দিয়ে সমস্ত পরমাণুগুলো তৈরী। পরমাণুর কোন গুন নেই। তারা সম্পূর্ণরূপে নির্গুণ—তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণগত। বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে কেবল আকার ও আকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। বস্তু কণিকাগুলোর কোন গুণ না থাকায়, বস্তুর গুন কণিকাগুলোর অবস্থান ও বিন্যাসের (Position & arrangement) জন্যেই হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরমাণুবাদীদের এ চিন্তাধারা এম্পিডক্লেসের জড়ের যান্ত্রিক ব্যাখ্যারই যৌক্তিক উন্নতি সাধন।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, পরমাণুর কোন গুন নেই। কিন্তু পরমাণু অবিভাজ্য হওয়ার দরুন তারা ঘনত্ব এবং অভেদ্য গুণগুলো বহন করে। লিউকিপাস এবং ডিমক্রিটাস যে পরমাণুর ধারণা আমাদের দেন তার আদৌ কোন ওজন আছে কিনা এবং অন্যান্য গুণের ন্যায় বস্তুর ওজনকে (Weight of objects) পরমাণুর বিন্যাস এবং অবস্থান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব কিনা—এ এক বিরাট প্রশ্ন। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, পরমাণুর ওজন সম্পর্কে পরবর্তীকালে ইপিকিউরিয়ান-গোষ্ঠী বিশদভাবে পর্যালোচনা করেন। ইপিকিউরিয়ানগণ, নানা শোধনে লিউকিপাস এবং ডিমোক্রিটাসের পরমাণুকে তাদের নিজস্ব ধারণার মৌলিক এবং ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। তাঁরা পরমাণু ওজনবিশিষ্ট বলে অভিহিত করেন—অর্থাৎ পরমাণুর উপর ওজন কথাটি আরোপ করেন। কিন্তু প্রশ্ন ঠেকে, এটা কি তাঁদের কর্তৃক নতুন পরিশোধন না লিউকিপাস এবং ডিমক্রিটাসের মৌলিক মতবাদের অংশ বিশেষ ?

পরমাণুগুলো সীমাবদ্ধ এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রশ্ন ঃ বিচ্ছিন্ন হতে গেলেই কোনকিছু দিয়ে তাদেরকে বিচ্ছেদ করতে হয়। এখন এ 'কোনকিছুটাই' (Sanetting) হচ্ছে মহাশূন্য বা শূন্যগর্ভ

(Empty space)। যেহেতু বস্তুর জন্ম (Becoming) এবং গুণত্ব পরমাণুর মিলনে এবং বিচ্ছেদে ঘটে এবং যেহেতু এ পরমাণুকে গতিশীল করে তোলে ; সুতরাং শূন্যগর্ভের অস্তিত্বকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে , কারণ, শূন্যগর্ভ ব্যতিরেকে গতি বা পরিবর্তন সম্ভব নয়। আসল কথা হচ্ছে, পরমাণুবিদদের মতে, দেশ বা মহাশূন্য হচ্ছে একটা বিষয়গত সত্তা। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে আমরা দু'টি চরম-সত্তা দেখ্ছি, একটা পরমাণু, অপরটি দেশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ দু'টি সত্তা যথাক্রমে ইলিয়াটিক্সদের 'জীবনসত্তা, এবং 'অসত্তা' নামে পরিচিত। পার্থক্য শুধু এই যে, যেখানে ইলিয়াটিক্সগণ 'অসত্তার' সত্যতা অস্বীকার করে, পরমাণুবাদিগণ দেশ বা অসত্তাকে ঠিক সত্তার মতই সত্য মনে করে। ঠিক সত্তার মতই অসত্তার অস্তিত্ব। শূন্য আছে এবং সত্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূর্ণ অংশগুলো (Plenenm) শূন্যে ভাসমান। 'সত্তা', ডিমক্রিটাস বলেন, 'কিছুতেই নেই কিছু থেকে অধিক সত্য নয়' (Being'' said Democratus is by nothing more real than nothing) পরমাণু অ-গুণযুক্ত (Non-qualitative) হওয়ায়, পূর্ণ (Full) ব্যতিরেকে, দেশে বা শূন্যে তাদের কোন পার্থক্য থাকে না। পরমাণু এবং শূন্যকে গ্রীনাম (Plenum) বা বায়ুশূন্যও (Vacuum) বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, পরমাণু গতিপ্রাপ্ত হল কেমন করে ? গতিশক্তি কি ? পরমাণু ওজনবিশিষ্ট কিনা, এর উপর নির্ভর করে এসব প্রশ্নের উত্তর। পরমাণুর ওজন আছে স্বীকার করে নিলে জগৎ-উৎপত্তি এবং পমাণুর গতি প্রভৃতি সূক্ষ্ম প্রশ্নের কোন জটিলতাই সৃষ্টি হয় না। ওজনের জন্যই পরমাণুর মূলগতি উদ্ভব হয়েছিল বলে ইপিকিউরিয়ানগণ মনে করেন। ওজনবিশিষ্ট হওয়ার জন্যে পরমাণু অনবরত অনন্ত মহাশূন্যে নিম্নমুখী হয়ে পতিত হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে পরমাণুবাদীদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা তখন ছিল না। তাঁদের ধারণা বড় পরমাণুগুলো ছোট বা ক্ষুদ্র পরমাণুগুলোর চাইতে ওজনে ভারী। কিন্তু যে-উপকরণে তারা তৈরী, তা এক। সুতরাং উপকরণ অনেক হলেও

ওজনে সমান। (Volume for volume, they weight the same)। যদি কোন পরমাণু আকৃতিগতভাবে দ্বিগুণ বড় হয়, তবে তার ওজনও দ্বিগুণ হবে। 'ভারী দ্রব্য হাল্কা দ্রবের চেয়ে দ্রুত শূন্যে পতিত হয় বলে তাঁদের বিশ্বাস। এখানে পরমাণুবাদীরা এক মারাত্মক ভুল করেন। বস্তুতঃ তারা একই গতিতে পতিত হয়। ভারী পরমাণুগুলো দ্রুত পতিত হওয়ার দরুন, হাল্কা পরমাণুগুলোকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দেয় বা উপরের দিকে ঠেলে দেয়। এবং এ সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হয় এক আবর্তের। এ আবর্তের মাধ্যমেই সদৃশ্য পরমাণুগুলো সদৃশ্য পরমাণুর সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়। এ পরমাণুর সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি হয়। অনন্ত মহাশূন্যে অনন্তভাবে পরমাণু পতিত হওয়ার দরুন অসংখ্য জগতেরও সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের এ জগৎ এই অসংখ্য জগতেরই একটা। সংগঠিত পরমাণুগুলোর মধ্যে যখন বিচ্ছেদ ঘটে, তখনই জগতের বিনাশ ঘটে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের এ সমস্ত ধারণা সবই নির্ভর করে পরমাণুর ওজনবিশিষ্ট হওয়ার উপর। কিন্তু প্রফেসার বার্নেটের মতে, ইপিকিউরিয়ান দার্শনিকেরা পরমাণুর ওজন-বিশিষ্টতার কথা মূল-বক্তব্যের সঙ্গে যোগ করেন। যদি তাই হয়, তবে লিউকিপাস এবং ডিমক্রিটাস কিভাবে যে গতির মূলকে ব্যাখ্যা করেন, তা বলা অত্যন্ত কঠিন। গতি পরমাণুর মজ্জাগত গুণ। অণুগুলো দৈব বলে একবার শক্তিশালী হয়েছিল, এবং এ শক্তিক্রিয়া আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। এতে এ্যানাক্সেগোরাসের কোন বুদ্ধি বা উদ্দেশ্য নিহিত নেই। ডেমক্রিটাস উদ্দেশ্যমূলক সব সংস্কারকেই পরিহার করেছেন, অথচ দৈবের সাহায্যও গ্রহণ করেন নাই। দৈবের পরিবর্তে 'অবশ্যম্ভাবিতার (Necessity) ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্যম্ভাবিতা থেকেই কার্যকারণ সম্বন্ধ আসে।

পরমাণুগুলোর রাসায়নিক সম্বন্ধ এক হলেও, পরস্পরের আকার ও অবয়বের বৈষম্য আছে। পরামাণুর রাসায়নিক গুণ একরূপ হওয়ায়, কেউ কাউকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে না। অবিরাম গতির জন্যে পরমাণুগুলো সব সময় আন্দোলিত হচ্ছে। তারা পরস্পর সংসক্তি

ও গঠনানুসারে মিলিত হয়। কতকগুলো পরমাণু অসমান, বর্কশ ও সূক্ষ্ম। তারা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে থাকায় এসিডের সৃষ্টি হয়েছে। আবার কতগুলো পরমাণু গোলাকার, মসৃণ বলে ইন্দ্রিয় প্রীতিকর দ্রব্যের সৃষ্টি হয়েছে। আত্মা সর্বাপেক্ষা লঘু, মসৃণ ও সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত। আত্মার পরামাণু যখন আলাদা আলাদাভাবে থাকে অথবা অল্পসংখ্যকমাত্র মিলিত হয়, তখন তাদের অনুভব শক্তি থাকে না। উপযুক্ত পরিমাণে মিলিত হলে তারা অনুভব শক্তিপ্রাপ্ত হয়। আত্মার পরমাণু স্থানচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আত্মা ধারণে সক্ষম। আত্মার সমস্ত পরমাণুর কাজ বন্ধ হয়ে গেলে মৃত্যু হয়। মৃত্যুতে পরমাণুর বিনাশ নেই। কারণ, পরমাণু অবিভাজ্য ও অবিনাশী। এখানে মৃত্যুর অর্থ হল পরমাণুসমূহের সংসক্তিজনিত আত্মার স্বাতন্ত্র্যভাবটি অন্তর্হিত হয়।

জনপ্রিয় দেবতাদের বিরুদ্ধে পরমাণুবাদিরা অনেক কটু মন্তব্য করেন। "দেবগণ মানুষের চেয়ে বেশী প্রভাবশালী, কিন্তু তাই বলে তাঁরা অমর নন। তাঁরাও নশ্বর জীবের ন্যায় পরমাণুগঠিত। অধিক সময় জীবিত থাকলেও, যথাসময়ে তাঁদেরও মৃত্যু ঘটে। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অপ্রতিহত প্রাধান্য কারোর চির ভোগ্য নয়। দেবগণ যিনি যত বড়ই হোন না কেন, সবার উপর এমন একটি বস্তু আছে যা অসীম শক্তিশালী ও অনতিক্রম্য, তা সেই মহান নিরপেক্ষ নিয়তি (Necessity the supreme Impartial law) যা দিয়ে সমস্ত বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত। স্থাবর জঙ্গম-সৃষ্টিমাত্রের উপর সমভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই নিয়তির নিকট আমরা যেন প্রফুল্লচিত্তে মস্তক অবনত করি। তা-ই প্রকৃত শান্তি লাভের উপায়। পরমাণুবাদিদের জীবন ও জগত-বিশ্লেষণ বর্তমান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড়াতে না পারলেও, এ মতবাদ যে তখনকার চিন্তাধারায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল তা অনস্বীকার্য। বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির মূলে পরামাণুবাদিদের দান যে অপরিসীম, তা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চম অধ্যায়

তার্কিক সম্প্রদায় এবং সক্রেটিস

সফিস্টস্ বা তার্কিক সম্প্রদায় (The Sophists)

গ্রীকদর্শনের প্রথম পর্ব এ্যানাক্সেগোরাসে এসে শেষ হয়ে যায়। এ্যানাক্সেগোরাসের 'চেতন' (Nous) দর্শনেতিহাসে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। এ সময়েই জড় ও মানস সত্তার মধ্যে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ বিরোধ জড় ও মানস সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—এ বিরোধ প্রকৃতি ও মানবের (nature & man) মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। মানব এবং প্রকৃতির মধ্যে যদি এ বিপরীত-ধর্মীভাব বিদ্যমান থাকে, তবে এ বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানবের কি স্থান—এ প্রশ্ন নিয়েই যাত্রা শুরু হয় দর্শনের দ্বিতীয়-পর্ব এবং তার্কিক গোষ্ঠীই এর উদ্যোক্তা।

তার্কিকদের সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে তদানীন্তন সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। আমরা গণতন্ত্র বলতে বর্তমানে যা বুঝি, প্রাচীন গ্রীকবাসিরা কিন্তু তা তখন বুঝত না। সে সময়ে গ্রীসের প্রত্যেকটা দেশ এক একটা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল। তাদের স্ব-স্ব সংবিধানের নিয়ন্ত্রণে দেশের শাসনপদ্ধতি পরিচালিত হত। সব রাষ্ট্রই আকারে ক্ষুদ্র ছিল। প্রয়োজনবশতঃ নিজেরা সবাই একত্রে বসে দেশের সংবিধান প্রণয়ন করতে পারত। ফলে, দেশের প্রতিটি ব্যক্তিই রাষ্ট্রের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের এ পরিবেশ বেশীদিন টিকে থাকতে পারল না। কারণ, মানুষ তখন রাষ্ট্র-স্বার্থকে ভুলে গিয়ে দলীয়-স্বার্থ এবং দলীয়-স্বার্থ থেকে ব্যক্তি-স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, গণতন্ত্রের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে ধর্মীয় প্রচলিত ভাবধারারও পরিবর্তন ঘট্‌তে থাকে। দেবতা-বিশ্বাসকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। সেই সময়ে বহু দার্শনিকই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেন। ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ শুরু হয় জেনোফিনিসের (Zenophane's) কাজ থেকে। হিরাক্লিটাস্ এ আক্রমণকে জোরদার করে আরো অগ্রসর হন। পরিশেষে, ডিমক্রিটাস পার্থিব ভয় এবং গ্রহ-বিজ্ঞানের প্রকৃতি

থেকে যে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে—এ মত প্রচার করে বেড়ান। কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই শাকুন-বিদ্যা (angury) বা অলীক কাহিনী বিশ্বাস করতে পারে না। প্রজ্ঞা (Reason) ও সংশয়ের (Scepticism) একটা প্রবাহ সেই সময়ে গ্রীকবাসিদেরকে প্রভাবিত করে। সে সময়ের যুগটাই ছিল নেতিবাচক, সমালোচনামূলক ও ধ্বংসোন্মুখ; প্রজ্ঞা ও চিন্তার একটা বিপর্যয়ের যুগ। গণতন্ত্রের নতুন ভাবধারা কৌলীন গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে। অপরপক্ষে, বিজ্ঞানের উন্নতি ধর্মীয় আস্তিকতার মূলে এক কঠোর আঘাত হানে। বস্তুর এ দু'ই জিনিসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর বিনাস ঘটে। সমস্ত ঐতিহ্যকিংবদন্তী (Tradition), আচার-অভ্যাস (Custom), নীতিবিদ্যা (Morality) ও বৈধ ক্ষমতাকে (Authority) প্রজ্ঞার মানদণ্ডে বিচার ও সমালোচনা করে প্রত্যাখ্যান করা হয়। পূর্বকালে পিতা ও প্রপিতাগণ যাকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখে দেখত, ইদানীন্তন গ্রীকবাসিরা তাকেই বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল। ফলে, ব্যক্তিগত লোভ-লালসা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ গ্রীকদের মধ্যে এ সময়ে প্রকট হয়ে উঠে। ইন্দ্রিয়াসক্ত ও আত্মহিতই এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুগের এ ভাব-প্রবণতাকেই সফিস্টস্ বা তার্কিক সম্প্রদায় প্রচার করে বেড়ায়। তাঁদের দর্শন-তত্ত্ব আবেগ ও প্রবৃত্তির কেলাসন (Crystallization) বা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণমাত্র।

প্রশ্ন ঃ কে এবং কারা তার্কিক-সম্প্রদায়? তার্কিক গোষ্ঠী কোন দর্শন সম্প্রদায় ভুক্ত নয়। তাঁদেরকে ইলিয়াটিকস্ বা পীথাগোরীয়ানদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তাদের নিজেস্ব কোন চিন্তাধারা বা নিজস্ব কোন পদ্ধতি নেই। তাদেরকে একটা বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বলার চেয়ে একটা পেশাদার-শ্রেণী (Professional class) বলাই উত্তম। তাঁরা গ্রীসের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যবসায় উন্নতিকল্পে অন্যান্য পেশাদারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। তাঁরা পেশাদারী শিক্ষক ও শিক্ষাদাতা। গ্রীসের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা পৌঁছে দেবার ব্রত নিয়েই তার্কিক গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক আগমন। তাঁরা গ্রীসের জায়গা-জায়গা ঘুরে বেড়ান এবং স্থানে স্থানে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সাধারণ গ্রীসীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক সচেনতা জাগিয়ে তোলার নিমিত্তে তাঁরা শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং কূট-তর্কে লিপ্ত হন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গ্রীসের প্রতিটি লোক রাষ্ট্রের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত। তাদের সীমিত জ্ঞান ও রাজনৈতিক চেতনার উন্নতিকল্পে তারা তার্কিক-গোষ্ঠীর শরণাপন্ন হয়। তার্কিক-গোষ্ঠী তাদের সাদর সম্ভাষণ জানায়। কিন্তু ব্যাপার এই যে, এ শিক্ষাদানের নিমিত্ত এই পেশাদার-শ্রেণী গ্রীসবাসিদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করেন। শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণের জন্যে অর্থের দাবী এই প্রথম। এ কার্য অবশ্য নিন্দনীয় কিছু নয়, তবে এর এমন প্রচলন পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। গ্রীসের জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁদের জ্ঞান-বিতরণের জন্যে কখনো অর্থ সংগ্রহ করেন নাই। পাণ্ডিত্যের জন্যে অর্থ সংগ্রহ অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ বলে ধরে নে'য়া হত। সক্রেটিস্ তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার অকাতরে সাধারণ মানুষের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি কখনও অর্থ গ্রহণ করেন নি। তার্কিক-সম্প্রদায় দর্শন সমস্যার কোন বিশেষ দিক্ নিয়ে আলোচনা করেন নি। মানবের বাস্তব (Practical) দিকটাই তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। অর্থের বিনিময়ে এবং প্রয়োজনের তাগিদে জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর জন্যে তাঁরা যে-কোন শিক্ষাদান করতে প্রস্তুত। সাধারণ নাগরিক (Citizen) বা সাধারণ রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে কিভাবে সাফল্য অর্জন করা চলে প্রোটাগোরাস (Protagoras) তা-ই প্রচার করে বেড়ান। গর্জিয়াস (Gorgias) ছন্দ ও রাজনীতি (Rhetoric & politics), প্রডিকাস (Prodicus) গ্রামার ও শব্দ-তত্ত্ব (Grammar & etymology), হিপ্পিয়াস (Hippias) ইতিহাস, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন। প্রকৃতির উৎপত্তি (Origin of Nature) বা আদি সত্তার স্বরূপ (Ultimate reality) এ জাতীয় কোন প্রশ্ন তাঁরা আলোচনা করেন নাই। এ সব সমস্যা ও তার সমাধানের বৃথা চেষ্টা তাঁরা করেন নি। তার্কিক সম্প্রদায়কে 'সততা' বা 'পুণ্যের' (Virtue) শিক্ষাদাতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। 'সততা' বা 'পুণ্য' শব্দটিকে বর্তমানের নীতি বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত না করে যদি তদানীন্তন

গ্রীসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা যায়, তবে তাঁদের কথা সত্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে। তাঁদের সততা বা পুণ্যের কোন সার্বিক মানদণ্ড নেই। এই সততা বা পুণ্যের কোন নীতি-ধর্ম নেই। একজন যন্ত্রীর নিকট পুণ্য হল তার যন্ত্রগুলোকে বুঝে নেওয়া। চিকিৎসকের নিকট সততা হল তার রোগীকে সুস্থ করে তোলা। পুণ্যের এ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তার্কিক-গোষ্ঠী মানুষকে এ জাতীয় পুণ্য শিক্ষা প্রদান করে দেশের সার্থক নাগরিক ও রাষ্ট্রের একজন সুযোগ্য সদস্য হিসেবে চিত্রায়িত করার প্রচেষ্ট করে। গ্রীক কর্মদক্ষতার জনপ্রিয় আকর্ষণই হল রাজনীতি। রাজনৈতিক পদমর্যাদার দিকেই সাধারন লোকের ঝোঁক। কিন্তু এ রাজনীতির জন্যে প্রয়োজন বাগ্মিতা, উপস্থিত বক্তৃতা ও যুক্তিহীন কূট-তর্ক। বড় বড় বুলি ও শ্লেষযুক্ত সরস প্রত্যুত্তর রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তার্কিকদেরকে সেই সময়ে ছন্দ বাগ্‌ধারা, শব্দ-তত্ত্ব ও কথা বলার বিভিন্ন কলা-কৌশলের দিকে তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত রাখতে দেখা যায়। ছন্দ ও শব্দ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কাছ থেকেই শুরু। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে তাঁরা এ ছন্দশাস্ত্রকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে থাকেন।

তার্কিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রোটাগোরাসই (Protagoras) আদি ও প্রাচীন। তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে এবেডোরাতে (Abdera) জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি গ্রীসের নানা স্থান পর্যটন করেন ও ঘুরে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে মাত্র কিছু দিনের জন্যে তিনি এথেন্সে (Athens) স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বাগ্মিতা ও কূট-তর্কের জন্যে তিনি আপনাকে তার্কিক বলে পরিচয় দিতেন। তাঁর মতে, শিষ্টতা ও সচ্চরিত্রতা সমাজে উৎকর্ষলাভের প্রধান অবলম্বন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি অবশ্য পালনীয়। প্রোটাগোরাস অনেক শাস্ত্রের বিভিন্ন আলোচনা করেছেন। তাঁর মতামত, যে সমস্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের নাম আজও বিদ্যমান আছে। ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা এবং দেব-দেবীর প্রতি অবজ্ঞা ও অসম্মান প্রদর্শনের জন্যে এথেন্সে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ

আনীত হয়। তিনি জাতীয় দেবতাদের বিরুদ্ধে একটা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এ গ্রন্থের প্রথম কয়টি কথা হল, "দেব-দেবী আছে কি নেই এ সম্বন্ধে আ... কিছু বলতে অসমর্থ।" উশৃঙ্খল জনসাধারণ কর্তৃক তাঁর গ্রন্থখানি প্রকাশ্যে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয় ও ভস্মিভূত করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রোটাগোরাস এথেন্স থেকে পালিয়ে যান। তিনি সিসিলিতে পলায়ন করেন। কিন্তু পথে খ্রীস্ট পূর্ব ৪১০ অব্দে জাহাজডুবি হয়ে মারা যান।

"মানুষ নিজেই বস্তুর মূল্যায়ণের মাপকাঠি।" (Man is the measure of oll things) প্রোটাগোরাস এই বিখ্যাত উক্তির স্রষ্টা ও প্রচারক। ব্যক্তির স্বকীয় সত্তাই সবকিছুর মানদণ্ড বা মাপকাঠি। 'যা আছে, তা-ই সত্য; যা নেই তা সত্য নয়।' (Of what is that is ; of what is not, that is not) বস্তুতঃ ব্যক্তিই বস্তুর মূল্য নির্ধারক। সংক্ষেপে এটাই হল প্রোটাগোরাসের দর্শনের মূলতত্ত্ব। সমগ্র তার্কিক চিন্তাস্রোতে প্রোটাগোরাসের এই মূল-সুর ছড়িয়ে আছে। এবারে প্রোটাগোরাসের বক্তব্যের তাৎপর্য নির্ণয় করা যাক। পূর্ববর্তী গ্রীকদার্শনিকগণ ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা (Sense and thought), প্রজ্ঞা ও সংবেদনের (Reason and Perception) মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। অবশেষে, সত্য (truth) যে প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল, এ মতবাদই প্রচার করেন। ইলিয়াটিক্স্ সম্প্রদায়ই প্রথমে এ পার্থক্য নির্ণয় করেন। তাঁদের মতে, বস্তুর মৌলিক সত্তা হল 'জীবন সত্তা' (Being)। এ জীবন সত্তাকে কেবল প্রজ্ঞার মারফতই জানা সম্ভব। বস্তুর মূল্য নিরূপনে ইন্দ্রিয় বা অনুভূতি আমাদেরকে প্রতারণা করে। সত্য যে প্রজ্ঞার উপরই প্রতিষ্টিত, হিরাক্লিটাসও এ মতবাদ প্রচার করেন। এমন কি ডিমোক্রিটাস পর্যন্ত বিশ্বাস করেন যে, অণু-পরামাণুগুলো এত ক্ষুদ্র যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এদেরকে জানা সম্ভব নয়। একমাত্র বিচার-বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা দিয়েই এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা চলে। পক্ষান্তরে, প্রোটাগোরাস্ সংবেদন ও প্রজ্ঞার এ পার্থক্যটুকুকে গুলিয়ে ফেলেন এবং সংবেদন ও প্রজ্ঞার প্রভেদ অস্বীকার করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, প্রজ্ঞা ও বিচার বুদ্ধি মানুষের সার্বজনীন বা সার্বিক রূপ; (Universal) ইন্দ্রিয় বা সংবেদন মানুষের বিশেষ (Particular) বা ব্যক্তিগতরূপ। প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধি দিয়ে

একজনকে যেমন ভালভাবে বুঝানো চলে, অনুভূতি দিয়ে তা সম্ভব নয়। আমার অনুভূতি কেবল আমারই, অন্যকে এ বিষয়ে জ্ঞাত বা বিদিত (Impast) করা চলে না। কোন বর্ণান্ধকে (Colour-blind) লাল বর্ণের স্বরূপ অনুভূতি দিয়ে বুঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু যুক্তি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে তা জানা সম্ভব। 'সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সবকোণ সমান', এ বাক্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্য প্রথমতঃ, একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এঁকে দেখা চলে এর কোণগুলো সমান কিনা। তবে এরূপ দেখার মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি থাকা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ইউক্লিডের সূত্র অনুযায়ী যদি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, ত্রিভুজের দু'টি বাহুই সমান, তবে ত্রিভুজের কোণগুলো যে স্বাভাবিকভাবেই সমান হবে এ কথা স্বীকার না করে আমাদের আর কোন উপায় থাকে না। কারণ, যুক্তি বা বিচার-বুদ্ধি এমন এক জিনিস, যা সার্বজনীন—সব মানুষ একে মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু আমার অনুভূতি কেবলমাত্র আমারই—অন্য একে মেনে নিক বা না নিক, আমি একে মেনে নিতে বাধ্য। কারণ, এগুলো আমার ব্যক্তিগত স্বকীয় অনুভূতি। কিন্তু আমার প্রজ্ঞা ও বিচার-শক্তি অপরাপর লোকদের চেয়ে পৃথক কিছু নয়। কারণ, বিচার-শক্তি মানুষের সার্বিকরূপ। অন্যান্যদের যুক্তি বা প্রজ্ঞা যা সত্য হবে, আমার বিচারেও তা-ই সত্য হবে। আবার আমার বিচার-বুদ্ধিতে যা সত্য ঠেকবে, অন্যান্য লোকদের নিকটও তা-ই সত্য ঠেকবে। কারণ, প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধি জিনিসটাই হল সার্বিক। সবার ব্যাপারে সমভাবে প্রযোজ্য। আমার প্রজ্ঞা কেবল আমার জন্য একটা বিধি বা আইন নয়—এ হল এক সার্বজনীন বিধি বা সার্বজনীন আইন—সবাই একে মেনে নিতে বাধ্য। প্রজ্ঞা ও বিচার-বুদ্ধি হল সার্বিক ও সার্বজনীন, সংবেদন ও ইন্দ্রিয় হ'ল নেহাৎ ব্যক্তিগত ও বিশেষ। অনুভূতি ব্যাপারটাই হল ব্যক্তিগত ও বিশেষ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, প্রজ্ঞা ও অনুভূতির এ পার্থক্যটুকু প্রোটাগোরাস অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'মানুষ' "নিজেই বস্তুর মূল্য নির্ধারক"। এখানে 'মানুষ' বলতে তিনি মানবের সামগ্রিক বা সার্বিক-রূপকে বুঝান না। এখানে 'মানুষ' বলতে

তিনি ব্যক্তি-মানুষকেই বোঝান। কিন্তু 'বস্তুর মূল্য নির্ধারক' বলতে আবার তিনি বস্তুর সাধারণ মানকেই বুঝেন। প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষই তার নিজস্ব সত্যের মান। (Each individual is a standandard of what is true to himself) প্রত্যেক মানুষের সংবেদনও অনুভূতি ব্যতিরেকে কোন সত্য নেই। আমার নিকট যা সত্য বোধ হয়, তা-ই আমার জন্য সত্য। তোমার নিকট যা সত্য বোধ হয়, তা-ই তোমার জন্য সত্য। (What seems true to me is true for me, What seems true to you is true for you) সত্যের কোন সাধারণ মানদণ্ড নেই—প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষই তার নিজস্ব সত্যের মানদণ্ড।

ব্যক্তিগত ধারণা ও বস্তুগত সত্যের (Objective truth) মধ্যে আমরা সাধারণতঃ একটা পার্থক্য নির্ণয় করে থাকি। ব্যক্তিগত ধারণানুযায়ী কারো'র মতে পৃথিবী সমতল বা চেপ্টা হতে পারে। কিন্তু বস্তুগত সত্য হিসাবে পৃথিবীটা প্রকৃতই গোলাকার। বস্তুগত সত্যের একটা স্বকীয় সত্তা আছে। আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা যা-ই হোকনা কেন, সত্য সত্যই (Truth is what it is) সত্যকে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। আমাদের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির উপর সত্য নির্ভরশীল নয়। সত্য তার স্বকীয়-সত্তা নিয়ে বিরাজিত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, প্রোটাগোরাস এই বস্তুগত সত্যকে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, বস্তুগত সত্য বলতে কিছু নেই—ব্যক্তিও তার অনুভূতিকে ছাড়িয়ে সত্যের কোন স্বাধীন স্বকীয়-সত্তা নেই। ব্যক্তির নিকট যা কিছু সত্য বোধ হয়, তা-ই তার জন্য সত্য। প্রোটাগোরাস সত্যকে ব্যক্তির ব্যক্তি-গত ইচ্ছা, আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে একীভূত করে দিয়ে ব্যক্তি-বিশেষকেই সত্যের মাপকাঠি বলে মনে করেন। বস্তুগত সত্য ও ব্যক্তিগত অনুভূতির পার্থক্যকে অস্বীকার করার অর্থই হল, সংবেদন ও প্রজ্ঞার পার্থক্যকে অস্বীকার করা। ব্যক্তি-বিশেষই যদি বস্তুর মূল্য নির্ধারক হয়, তবে সব কিছুই সত্য, মিথ্যে বা ভুল বলতে কিছুই নেই। বস্তুতঃ প্রোটাগোরাস্ এ-শিক্ষাই প্রচার করে বেড়ান। ভুল অসম্ভব; কারণ, প্রত্যেক ধারণার বিরুদ্ধেই একটা বিপরীত সুষ্ঠু সাবলীল যুক্তি দাঁড়

করানো চলে। তোমার নিকট যা সত্য মনে হয়, তা-ই তোমার জন্য সত্য ; আবার আমার নিকট যা সত্য মনে হয়, তা-ই আমার জন্য সত্য ; একই বস্তু তোমার নিকট সত্য প্রতীয়মান হলে, তা তোমার জন্য সত্য। আমার নিকট মিথ্যে প্রতীয়মান হলে তা আমার নিকট মিথ্যে। অনুরূপভাবে আমার নিকট সত্য প্রতীয়মান হলে, তা আমার নিকট সত্য ; তোমার নিকট মিথ্যে প্রতীয়মান হলে তা তোমার নিকট মিথ্যে। অর্থাৎ বস্তুর এ দুই বিপরীতধর্মী বর্ণনাই সত্য ; কারণ, বস্তুকে আমরা নিজস্ব ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, প্রোটাগোরাসের মতবাদ 'সত্য-মিথ্যার' সকল পার্থক্যকে মুছে একেবারে বিলীন করে দেয়। আমরা সত্য বা মিথ্যা যেটাই বলি না কেন, অর্থের দিক দিয়ে তার কোন প্রভেদ নেই—'সত্য' এবং 'মিথ্যা' শব্দ দু'টোর কোন মানে নেই। মনে হয়, একই বস্তু বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা একই জনের কাছে বিভিন্ন সময় বস্তুর বিভিন্ন রূপ দেখে প্রোটাগোরাস তাঁর এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। অনুভূতির উপর যদি জ্ঞান নির্ভর করে, তা হলে বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যকে নিরূপণ করা যায় না। মনে হয়, তিনি হিরাক্লিটাসের মতবাদ দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত। হিরাক্লিটাস সমস্ত 'স্থাবর'-কে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিসই নিত্য-নতুন ঘট্‌ছে—কোন কিছুই স্থির হয়ে নেই। এ মুহূর্তে যা আছে, পর-মুহূর্তেই তা আবার নেই—এমন কি হিরাক্লিটাস বিশ্বাস করেন যে, একই মুহূর্তে এক জিনিস আছে ও আবার নেইও—এটা আছে বললেও যেমন সত্য, এটা নেই বললেও তেমনি সত্য। প্রোটাগোরাসের মূলতত্ত্ব ও শিক্ষা ঠিক তা-ই ছিল। জ্ঞান-লাভ যে সম্ভব নয়—এ কথাই প্রোটাগোরাস প্রচার করেন। বস্তুগত সত্য না থাকলে জ্ঞান সম্ভব নয়, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। জ্ঞানের 'অসাম্ভব্যতা'র কথা গর্জিয়াসও উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর 'প্রকৃতি ও অস্তিত্বহীন' (On Nature or non-existence) গ্রন্থে তিনটি মতবাদকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন ঃ (১) কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, (২) যদিও বা অস্তিত্ব থাকে, তাকে জানা সম্ভব নয়, (৩) যদিও বা জানা

সম্ভব, তা অন্যকে জানানো সম্ভব নয়। মনে হয়, প্রোটাগোরাসের মত গর্জিয়াস ও ইলিয়াটিক্‌স্‌দের কর্তৃক প্রভাবান্বিত। প্রোটাগোরাস যেখানে হিরাক্লিটাসের দ্বারা প্রভাবান্বিত—গর্জিয়াস সেখানে ইলিয়াটিস্‌-দের দ্বারা প্রভাবান্বিত। গর্জিয়াস তাঁর প্রথম মতবাদ 'কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই' প্রমাণের জন্য জেনোর নিকট বেশ খানিকটা ঋণী। জেনোকে ঠিক নাস্তিক বলা চলে না। জেনোর চিন্তাধারা গঠনমূলক—ধ্বংসমূলক নয়; তবে তার দর্শনতত্ত্বে নঞর্থক দিকটাকে বেশী জোর দিলে তা নাস্তিকতাবাদেই পরিণত হয়। দুঃখের বিষয় গর্জিয়াস জেনোর এই নঞর্থক দিকটাতে বেশী ঝুঁকে পড়েন। যেহেতু সব কিছুই বিরোধপূর্ণ (Contradictory)। অতএব; কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। 'জীবন-সত্তার' উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি পারমানাইডিসের বিখ্যাত যুক্তির অবতারণা করেন। কোন বস্তু আছে বললে বুঝতে হবে যে, এর একটা আরম্ভ বা উৎপত্তি রয়েছে। এর আরম্ভ হয় 'সত্তা' অথবা 'অসত্তা' থেকে। 'সত্তা' থেকে 'সত্তার' উৎপত্তি কোন উৎপত্তিই নয়। অপরপক্ষে, অসত্তা থেকে সত্তার উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব। কারণ, 'নেই' থেকে কোন কিছু আসতে পারে না। অতএব, কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। যদিও বা থাকে, তা জানা সম্ভব নয়; কারণ, এ আমার নিজস্ব স্বকীয় অনুভূতি, অন্যের জানার কথা নয়, এবং যেহেতু এ একান্তই আমার অনুভূতি; তাই কাউকে জানানো সম্ভব নয়। সমস্ত সফিস্টস মতবাদ মানুষের সহজ-স্বাভাবিক চিরন্তন ও শাশ্বত যুক্তিকে অবজ্ঞা করে ব্যক্তিগত সংবেদন ও অনুভূতিকে উচ্চস্তরে স্থান দিয়ে এক মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করে। পরবর্তী সফিস্টস্‌রা প্রোটাগোরাস এবং গর্জিয়াসকেও ছাড়িয়ে যান। প্রোটাগোরাসের শিক্ষাকে তাঁরা নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে থাকেন; যদি বস্তুগত সত্যের কোন মানদণ্ড না থাকে, প্রত্যেকে যা ভাবে, তা-ই সত্য হয়; তবে সার্বজনীন নৈতিক বিধি বলতেও কিছু নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি-বিশেষ যা ন্যায় মনে করে, তা-ই তার নিকট ন্যায়। প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি দিয়ে যা করতে পছন্দ করে, তা-ই তার কাছে ন্যায় ও সত্য; অন্ততঃ, পোলাস, থ্রেসিমেচাস্‌ এবং ক্রিটিয়াস, তা-ই ভাবেন।

যদি ন্যায়ের মানদণ্ড না থাকে, তবে গায়ের জোরে দেশ পরিচালিত হয় বলতে হবে। আমরা ভাল-মন্দ আইনের কথা উল্লেখ করি, কিন্তু সফিস্টস্‌দের মতে, ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বলতে কিছু নেই। ন্যায়-বিচার বলতে যদি কিছু থাকে, তবে সেটা প্রবল ও সংখ্যাগরিষ্টদের স্বাধিকার (right of the stronger & right of the mejovity) ৷ পোলাস ও থ্রেসিম্যাচোস্ বলেন, আইন-বিধি হল দুর্বলের আবিষ্কার—যার কলাকৌশলে প্রবল ও শক্তিশালীদেরকে সহজে কাবু করা চলে। প্রকৃতি শুধু শক্তির আইনকে স্বীকার করে নেয় (Law of force) ৷ 'শক্তিই বল,' এ হল সফিস্টস্‌দের অভিমত। ধর্ম কোন চতুর রাজনীতি-বিদের আবিষ্কার—যার ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে সহজভাবে শাসন করা হয়। সফিস্টস্‌দের সমগ্র শিক্ষাটাই নঞর্থক ধ্বংসাত্মক এবং সমাজ বিরোধমূলক এবং ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক জ্ঞানের পরিপন্থী ৷ এখানে ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতি-সংবেদন অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকভাবে প্রধান্য লাভ করে। এ-যুগের ধর্মটাই ছিল নেহাৎ আত্মকেন্দ্রিক (Subjective) ; তবে বস্তুগত সত্তা যে অনুভবকারীকে ছেড়ে থাকতে পারে না, অনুভবকে আশ্রয় করেই যে তার অস্তিত্ব, এ সত্য প্রোটাগোরাসের দ্বারাই প্রথম উদ্ভাসিত হয়। প্রজ্ঞা বা চিন্তা বস্তু-দ্রব্যের অস্তিত্বের কারণ। চিন্তা শুধু দ্রব্যের আকারগত বৈষম্য দূর করে তাদের ঐক্য সাধনের চেষ্টাই করে না, চিন্তা স্বয়ং ঐক্য সংস্থাপন করে। চিন্তা সম্বন্ধে এ নতুন তথ্যের আবিষ্কারের গৌরব প্রোটাগোরাসের। সফিস্টস্‌দের আলোচনার ফলে বহুদেবত্ব বিষয়ক মানসিক সংস্কারসমূহ দূরীভূত হয় এবং সক্রেটিস, প্লেটো এবং স্টোয়িক সম্প্রদায়ের ধর্মসিদ্ধান্তের পথ অনেকটা সুগম হয়। সফিস্টস্‌দের কূট-তর্কে ভাষা-বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ভাষার পারিপাট্য, বিশিষ্টশব্দ ও ছন্দ প্রয়োগ এতই মার্জিত এবং ভাব-প্রকাশের উপযোগী যে, আজও আমরা প্লেটোর 'ডায়ালগ' বা কথোপকথনের উপদেশগুলোর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি।

"অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে প্রোটাগোরাস ও অন্যান্য তার্কিকগণ একটা বিশেষ-ভ্রমে পড়েছিলেন। তাঁরা ব্যক্তিগত হিসেবে মনের প্রাধান্য স্বীকার

করেন, সমগ্র মানব মনের সাধারণ প্রকৃতি বিচার করেননি। এ জন্যে তাঁদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বৈষম্য এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ভ্রান্তি অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। মানবের ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি যে সমগ্র মানবজাতির বিচার-বুদ্ধির (Human reason) অন্তর্গত এ জিনিসটা তাঁরা ভেবে দেখেন নি। এই মারাত্মক ভুলে পরে সক্রেটিস কর্তৃক সংশোধিত হয়েছিল।"

সক্রেটিস
(Socrates)

গ্রীসীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, আদর্শ এবং নৈতিকতার উপর তার্কিক-সম্প্রদায় যে-আঘাত হানেন, তারই প্রতিবাদ স্বরূপ আবির্ভূত হন দর্শন-যুগের অধিনায়ক মহামান্য সক্রেটিস্। গ্রীক-দর্শনে বিচ্ছিন্ন ও বিশৃংখলার যুগে তাঁর আবির্ভাব এক সম্ভাবনাময় স্বর্ণযুগের সূচনা করে। তিনি যুগের সমস্ত বিশৃঙ্খলাকে দুরীভূত করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ৪৭০ অব্দে এথেন্সে এই মনীষীর জন্ম। তাঁর শৈশবকাল কিভাবে কেটেছিল এবং কি উপায়ে তিনি বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করেন, সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁর পিতা সফ্রনিস্কাস (Sophroniscus) একজন ভাস্কর এবং মাতা ফিনারিট (Phaenarite) ধাত্রী ছিলেন। কথিত আছে, প্রথম জীবনে তিনি পিতার ব্যবসা ভাস্কর্য-বিদ্যা শিক্ষা করেন। এথেন্সে এক্রিপলিসে (Acropolis) যে কিছু ভাস্কর-শিল্প মূর্তি প্রদর্শিত হয়, তা সক্রেটিসেরই সৃষ্টি বলে ধারণা করা হয়। পরে, দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি গভীর অনুরাগ বশতঃ তিনি দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন এথেন্সেই অতিবাহিত করেন। কেবলমাত্র কিছু সময়ের জন্য তিনি এথেন্সে সামরিক বিভাগে কাজ করেছিলেন। বিশ-ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এথেন্সে দর্শন-প্রচার কার্যে গভীরভাবে আত্মনিবেশ করেন। সত্তর বৎসর বয়সে জাতীয় দেব-দেবীকে অস্বীকার করে স্বীয় দেব-মত প্রতিষ্ঠা করেন। এথেন্সের যুবকদের ভ্রষ্ট করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে

অভিযোগ আনা হয়। এই অভিযোগের ফলেই শেষ পর্যন্ত কারাবরণ করে বিষপানে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

তাঁর ব্যক্তিগত চেহারা অদ্ভুত ও কিম্ভূতকিমাকার ছিল। দেখতে তিনি বেঁটে, মোটা ও কুৎসিত ছিলেন—নাক প্রশস্ত ও চেপ্টা ছিল। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর মাথায় টাক পড়তে থাকে। তাঁর চাল-চলন অদ্ভূত প্রকৃতির—তিনি জীর্ণ-শীর্ণ ময়লা বস্ত্র পরিধান করতেন। বাহ্যিক-রূপ ও চাল-চলনের দিকে আদৌ তাঁর খেয়াল ছিল না।

তাঁর সব কর্মের মূলে যে এক বিরাট শক্তি ইন্ধন যোগাচ্ছেন, এ কথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এ শক্তিকে তিনি দৈত্য বা ডেমন্ (Daeman) নামে অভিহিত করেন। এ শক্তি সর্বদা তাঁর প্রাথমিক কল্পিত কাজের সুফল ও কুফল নির্ণয় করে দিচ্ছে। তিনি কিছুতেই এ শক্তির আদেশ বা বিধানকে অমান্য করতে পারেন নি।

সক্রেটিস কোন দর্শন বা দর্শন-পদ্ধতি তৈরী করে যাননি। দর্শনে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর মতামত লিখে রাখেন নি। তাঁর দর্শন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ কথোপকথন ও আলোচনামূলক (Conversational)। এথেন্সের হাটে অথবা এমন সব জায়গা যেখানে লোক সমাগম হয়, সেখানে গিয়ে লোকদের সাথে জীবন-মৃত্যুর গভীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা তাঁর প্রতিদিনকার কর্তব্য কর্মের ধারা ছিল। ধনী-দরিদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, পরিচিত ও অপরিচিত যারাই উপস্থিত থাকত, সবাই তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কথিকা (Talk) শুনতে পেত। কিন্তু তার বিনিময়ে সফিস্টসদের মত তিনি কখনও অর্থ গ্রহণ করেন নি। এজন্যে সারা জীবন দারিদ্র্য অবস্থা তাঁকে কালাতিপাত করতে হয়েছে। সফিস্টস্‌দের মত তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা বা বড় বড় বুলি আওড়াতে ভালবাসতেন না। আলাপ-আলোচনাকে আবার তিনি এক-চেটিয়া করে রাখেন নি। শ্রোতৃবর্গই তাঁর সাথে বেশীরভাগ আলাপ-আলোচনা করত—তিনি কেবল বাঁধা দিয়ে পালটা প্রশ্ন ও মন্তব্য পেশ করতেন এবং সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতেন। আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি সাধারণতঃ 'প্রশ্ন-উত্তরের' মাধ্যমেই হত। সক্রেটিস্ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীকে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে তার অস্পষ্ট ও

অপরিপক্ক যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করে শুধরে দিতেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের কল্পনাগুলোরও উন্নতি সাধন করতেন। এ-নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি নিজেকে ভগবান কর্তৃক এক প্রচার কাজে লিপ্ত বলে মনে করতেন।

এথেন্সের যুবকদল সক্রেটিসের চারপাশ ঘিরে থাকত এবং তারাই তাঁর দর্শনতত্ত্ব ও অন্যান্য সব বিষয়ের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। এজন্য পরে অবশ্য যুবসম্প্রদায় 'দুষ্কৃতিকারী' এ অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন মহৎ এবং অত্যন্ত উত্তম চরিত্রসম্পন্ন লোক ছিলেন। সহজ-সরল সাদা-সিধে ছিল তাঁর জীবন। জ্ঞান বিতরণের জন্যে কখনও অর্থ গ্রহণ না করায় চিরকালই তিনি দরিদ্র ছিলেন। এ মায়াময় সংসারের ধন-দৌলত, টাকা পয়সা কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে তিনি সারা জীবন কেবল জ্ঞান ও সত্যের আরাধনা করে গেছেন। তাঁর সহিষ্ণুতা ও নৈতিকবল অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। পেলোপনিশিয়ান যুদ্ধে তাঁর সৈনিক জীবনের সাহসিকতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চরম সাহসিকতা দেখে তার সমসাময়িক বন্ধুরা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যান। জীবনের প্রতি দু'বার সাম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। কথিত হয় যে, ডেলিয়ামের যুদ্ধে সক্রেটিসই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ছত্রভঙ্গ এথেন্সবাসীদের মাঝে একা মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি যদিও সংসার জীবন যাত্রাকে এড়িয়ে অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন অতিবাহিত করতেন, তবু তিনি তাঁর নিজস্ব স্বাধীন স্বকীয় মতকে অন্ধের মত বিশ্বাস করে সংসার জীবনে কঠোর সংযম বা কৃচ্ছ্রসাধন করেন নি। তিনি কখনও মদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেন নি। কিন্তু প্রয়োজনবশতঃ মাঝে মাঝে তিনি চা পান করতেন। সময়ে হয়তো অন্যদের চাইতে একটু বেশীও পান করতেন, কিন্তু তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হত না। প্লেটোর 'Banquet' এ সক্রেটিসকে যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, তিনি সারারাত ধরে পানীয় পান করছেন আর সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে দর্শনালাপে মগ্ন আছেন। অতিমাত্রায় মস্তপ হয়ে যখন ঘর ছেড়ে সবাই পালিয়ে যেত, সক্রেটিসকে

তখনও দু'একজনকে নিয়ে দর্শন আলোচনায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যেতো। কিন্তু পরদিন প্রতিদিনকার মত ভোরে উঠে হাত-পা ধুয়ে বাজারে বা হাটে তিনি দৈনন্দিনকার দর্শন আলোচনায় মত্ত থাকতেন। সত্তর বৎসর বয়সে তিনটে অভিযোগের জন্য তাঁকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা হয়ঃ (১) জাতীয় দেব দেবীদের অস্বীকার করার জন্য, (২) মনগড়া নিজস্ব নব দেব-দেবীর সৃষ্টি করার জন্য এবং (৩) সবশেষে এথেন্সের সব যুবসম্প্রদায়কে ভ্রষ্ট করার জন্য। অবশ্য সবগুলো অভিযোগই ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম অভিযোগ শুধু সক্রেটিস কেন, যে কোন গ্রীক দার্শনিকদের বেলায়ই প্রযোজ্য। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের অনেকেই জাতীয় ধর্মে বিশ্বাস করেননি। তাঁদের অনেকেই প্রকাশ্যভাবে দেবতাদের নিন্দা ও তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে গেছেন। সক্রেটিস কিন্তু দেবতাদের প্রতি এমন মনোভাব কোথাও প্রদর্শন করেননি। তিনি দেবতাদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি তাঁর সব শ্রোতৃবর্গকে তাদের নিজস্ব প্রথানুযায়ী দেবতাদের সম্মান প্রদর্শন করার জন্য উপদেশ দিতেন। বহু দেবতা ও এক স্রষ্টিকর্তার মাঝে সক্রেটিস এক পার্থক্য নির্ণয় করেন। এক স্রষ্টিকর্তার আদেশ ও শাসনেই সমস্ত জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সক্রেটিসকে অনেক সময় এক অলৌকিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা গেছে তা সত্য; কিন্তু এ জন্য তিনি কল্পিত এক নতুন দেবতার অবতারণা করে গেছেন বলে যে অভিযোগ আনা হয়, তা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। যুবসম্প্রদায়কে ভ্রান্ত করার তৃতীয় অভিযোগটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কথিত হয় যে, আলসেবিডাস সক্রেটিসের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি এথেন্সের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা করেন। তাছাড়াও তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত উচ্ছৃংখল ও চরিত্রহীন ছিলেন। তিনিই সক্রেটিসের নামে নানা কুৎসা রটনা করে বেড়ান। তাঁর এ অপকর্মের জন্যে সক্রেটিস মোটেও দায়ী ছিলেন না। সক্রেটিস এথেন্সের যুবসম্প্রদায়কে নষ্ট করেননি, বরং তাঁর মহৎ চরিত্রের সংস্পর্শে এসে যুবসম্প্রদায় এক পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই যদি

সত্য হয়, তবে তাঁর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের সত্যাসত্যের কারণ কি? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সক্রেটিস নিজেই নিজের অনেক শত্রু সৃষ্টি করে গেছেন। প্রথমতঃ, সক্রেটিস তাঁর প্রতিদিনকার আলোচনা সভায় এথেন্সের শক্তিশালী ও প্রতিভাপন্ন লোকদেরও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। তাঁর সময়ের যারা তথাকথিত জ্ঞানী ও গুণী বলে পরিচিত ছিল, তিনি তাদের অজ্ঞতাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে দিয়েছেন। মালিটাস, লিকন এবং এনিটাস যে নেহাৎ ঈর্ষাপরবশ হয়েই সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন, একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সক্রেটিস এথেন্স গণতন্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিত থেকে যান। তিনি গণতন্ত্রে খুব বেশী একটা অংশ গ্রহণ করেননি। গণতন্ত্র নামে যে তখন সাধারণের কর্তৃত্ব চলছিল, তার সাথে তিনি তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি। জ্ঞানী-গুণী এবং বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কতিপয় মহৎ চরিত্রবান লোকদের হাতেই রাজ্যভার অর্পিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। রাজ্য পরিচলনার জন্যে এ সব লোকদেরকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উপদেশও তিনি দেন। তিনি নিজে কখনও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি বটে, কিন্তু যুব সমাজ, যাদের হাতে ভবিষ্যৎ রাজ্যপরিচালনার ভার এক দিন অর্পিত হবে, তাদেরকে রীতিনীতি, আদর্শ এবং উপদেশ দিয়ে আদর্শ এবং উপযুক্ত নাগরিক করে তোলার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে তিনি দু'বার অকৃতকার্য হয়েছেন এবং এ দু'টি ঘটনাই প্লেটোর 'ক্ষমা' (Apology) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সক্রেটিসকে অভিযুক্ত করার প্রধান কারণ হচ্ছে, জনগণ তাঁর দর্শনশিক্ষাকে সফিস্টসদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। এর প্রমাণ, এরিস্টোফেনেসের 'ক্লাউড' (The Cloud) নাটক। 'ক্লাউড' নাটকে এরিস্টোফেনেস সক্রেটিসকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রধান চরিত্ররূপে রূপায়িত করা হয়েছে এবং সেখানে সক্রেটিসকে সফিস্টস বা তার্কিক গোষ্ঠীর প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাই সক্রেটিসকে তার্কিক-গোষ্ঠীর বলে অনেকেই ভুল করে।

বিচারালয়ে সক্রেটিস নিজেকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও গভীর আত্মবিশ্বাসের

দ্বারা পরিচালিত করেন। সেকালে অপরাধিগণ বিচারালয়ে কান্নাকাটি ও বিলাপ করার সুযোগ পেত। নানা প্রকার তোষামোদে এবং প্রয়োজন-বশতঃ স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে দেখিয়ে বিচারকদের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ারও রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সক্রেটিস এসব কাপুরুষ-সুলভ কাজ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁর এই মনোভাবের জন্য বিচারালয়ে সদস্যরা অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। ফলে, তাঁকে ভীষণ কড়া শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী সক্রেটিস যদি নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে হয়তো তাঁকে অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু তিনি তা করেন নি। শত্রু কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের জন্যে শাস্তির দাবী জানানো হলে তিনি নির্ভীকচিত্তে তা গ্রহণ করেন। তবে তিনি দৃঢ়ভাবে স্বীকার করেন যে, তিনি কোন দোষে দোষী নন; সুতরাং তাঁকে কোন শাস্তি দেওয়া চলবে না। পরে, প্রচলিত আইনপ্রথা অনুসারে তিনি অন্যতর কি শাস্তি পেতে প্রত্যাশা করেন, জিজ্ঞেস করায় তিনি শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিনের সময় চান।

ত্রিশদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ ত্রিশদিন তাঁকে কারাগারেই আবদ্ধ থাকতে হয়। এই সময়ে তখনকার নিয়ম অনুযায়ী তাঁর সুহৃদগণ তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে কারাগার থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে অনুরোধ জানান। পেরিক্লিসের সাহায্যে এ্যানাক্সে-গোরাস যে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত তাঁরা উল্লেখ করেন। প্রহরী-দের হস্তে কিছু রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে সক্রেটিস ইচ্ছে করলে পালানোর সুযোগ পেতেন। কিন্তু মৃত্যু থেকে পালিয়ে যাওয়াকে তিনি অত্যন্ত ভীরু এবং কাপুরুষজনিত কাজ বলে মনে করলেন। দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত বলে তিনি সবাইকে সতর্ক করেন। আইন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, সুতরাং এই আইন মানতে তিনি বাধ্য। ত্রিশদিন পর তাঁকে যখন বিষপাত্র প্রদান করা হয়, কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না করে অত্যন্ত সহজ-স্বাভাবিকভাবে তিনি তা পান করেন। এখানে সক্রেটিসের মৃত্যুর দৃশ্য প্লেটোর ফিডো (Phaedo) থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল।

"সক্রেটিস উঠে দাঁড়ালেন। আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে

তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করলেন। ক্রিটো তাঁকে অনুসরণ করলেন। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি স্নানক্রিয়া সমাপন করে স্নান-কক্ষ থেকে বের হয়ে এলেন। স্বীয় পরিবারকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। তিনি কিছুক্ষণ যাবৎ তাদের সঙ্গে আলাপে ব্যাপৃত রইলেন। এবার তাদেরকে বিদায় দিয়ে তিনি আমাদের নিকট পুনরায় ফিরে এলেন। সূর্য তখন প্রায় অস্তমিত, ঠিক এ মুহূর্তে Elenen এর একজন কর্মচারী এসে সক্রেটিসকে বললেন, 'প্রিয় সক্রেটিস, অন্যদের বেলায় আমি এ যাবৎ যে দোষ অবলোকন করে আসছি, আপনাতে কিন্তু আমি তা দেখতে পাচ্ছি না। আমি যখন বিষ প্রদানের আদেশ দিই, ক্রোধে ও ঘৃণাভরে লোকেরা আমাকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু আপনি এখানে আসা অবধি আপনাকে অত্যন্ত মহৎ, উদার এবং শান্ত বলে মনে হচ্ছে। আপনার মত এমন মহৎ লোক এখানে আর দ্বিতীয়টি আসে-নি। আপনার মহৎ ও উদার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্ততঃ আপনি আমাকে অভিশাপ দেবেন না। আমি এসেছি আপনার বিদায় ঘোষণা জানাতে। আমার একান্ত অনুরোধ, যা অবশ্যম্ভাবী তা সহজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন। এই বলে কর্মচারীটি অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সক্রেটিস তাঁর যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নিজ মনেই বলে উঠলেন, 'বন্ধুবর, তোমাকেও জানাচ্ছি বিদায়। তুমি যা নির্দেশ দিয়ে গেলে, আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।' তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, 'লোকটা কতই না সুন্দর! আমি এখানে আসা অবধি কর্মচারিটি আমাকে লক্ষ্য করে আসছে, যেচে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে এবং বিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও সে তার আপন মাহাত্ম্য ও পাণ্ডিত্য শেষ পর্যন্ত প্রদর্শন করে গেল। কর্মচারীটি কি করুণাভরে ও সহানুভূতিতেই না বিগলিত হয়েছিল! ক্রিটো, এসো, আমরা তার আদেশের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করি। কাউকে বিষ আনতে নির্দেশ দাও। আর বিষ যদি চূর্ণ করা না হয়ে থাকে, তবে তা চূর্ণ করে আনতে বলে দাও।' ক্রিটো বললেন, 'সূর্য এখনও অস্ত যায়নি—

এখনও তা পাহাড়ের চূড়ায়। সুতরাং আপনি অস্থির হবেন না। এ ব্যতিরেকেও আমি এমন কয়েকজনকে জানি, যারা রং-তামাসা ও স্ফূর্তিতে জীবনকে চরমভাবে ভোগ করে ইচ্ছাকৃতভাবে বিষপানে বিলম্ব ঘটিয়েছেন। আপনি দয়া করে অধীর হবেন না। এখনও প্রচুর সময় রয়েছে।' জওয়াবে সক্রেটিস বললেন, 'এসব লোক যাদের কথা তুমি উল্লেখ করলে, তাদের দ্বারা সব-কিছুই সম্ভব। কারণ, তাদের ধারণা এ করে তারা লাভবান হচ্ছে; কিন্তু আমি তা মনে করি না। বিলম্বে বিষপানে আমার কোন লাভ হচ্ছে না। বরং এ করে জীবনের প্রতি মায়া-মহব্বত দেখিয়ে আমি নিজেই হাস্যাস্পদ হচ্ছি। ক্রিটো যাও, কোন বাধা প্রদান না করে তুমি আদেশ পালন কর।' ক্রিটো আর অন্যথা না করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানো ছেলেটিকে মাথা নাড়তেই ছেলেটি আদেশ রক্ষার্থে কক্ষ পরিত্যাগ করলো। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় সক্রেটিসের কক্ষে প্রবেশ করল। সক্রেটিস লোকটাকে দেখে বলে উঠলেন, 'বন্ধু, এ-সব বিষয়ে তোমার নিপুণতা সমধিক। এখন দয়া করে 'কেবল আমাকে বলো আমার কি করতে হবে!' উত্তরে লোকটা বলল, 'কিছুই নয়। আপনার বিষ পান হয়ে গেলে আপনাকে কিছুক্ষণ পায়চারী করে বেড়াতে হবে। পা' দু'টি ভারী হয়ে এলে পর দয়া করে শয্যায় যাবেন এবং এতেই সব কাজের সমাধা হয়ে যাবে।' কথা শেষে লোকটি সক্রেটিসের নিকট বিষপাত্রটি এগিয়ে দিল। অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সক্রেটিস বিষপাত্রটি গ্রহণ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'বন্ধুবর, এ মদ্য বা পানীয় ব্যাপারে তোমার নিজস্ব কি অভিমত? এটা কি বিধিসম্মত?' জওয়াবে লোকটি বলল, 'আমরা কেবল পানীয় তৈরী করি—এর বেশী কিছু জানি না।' সক্রেটিস বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝলাম।' তারপর খুবই শান্ত পরিবেশে দ্বিধাহীনচিত্তে তিনি বিষপান ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

"আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেছিলাম। কিন্তু তিনি যখন বিষপান শুরু করলেন, আমরা আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমরা কেঁদে ফেললাম, নয়ন আমাদের অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। সক্রেটিস

বললেন, 'আমার বন্ধুগণ, তোমরা একি করছো! এইরূপ কান্নাকাটি বা বিলাপ না ঘটার জন্যে আমি স্ত্রীলোকদেরকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি। কারণ, আমি জানি শুভ ইঙ্গিতে মরণ অনেক ভাল। তোমরা শান্ত হয় এবং ধৈর্য ধারণ কর।' তাঁর একথা শুনে আমরা লজ্জিত হলাম। এবং কান্না থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর তাঁর পদদ্বয় ভারী হয়ে এলো। তিনি লোকটির নির্দেশানুযায়ী আপন পৃষ্ঠদেশে শয়ন করলেন। অতঃপর বিষপ্রদাতা সক্রেটিসকে এসে ধরলেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি সক্রেটিসের পা ও পায়ের পাতা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। পায়ে প্রবল একটা চাপ দিয়ে তিনি সক্রেটিসকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কিছু অনুভব করতে পারছেন কি না। সক্রেটিস বললেন, না। তারপর তিনি তাঁর উরুযুগল চাপ দিলেন এবং এ ভাবে তিনি উপর দিকে চাপ দিয়ে যেতে লাগলেন এবং পরে দেখালেন যে, সক্রেটিস ক্রমশঃ শীতল ও কঠিন হয়ে যাচ্ছেন। সক্রেটিস নিজেকে স্পর্শ করে বললেন, এ-বিষ যখন তার হৃদয়-স্পর্শ করবে তিনি তখন শেষ হয়ে যাবেন। কিন্তু এ সময়ের মাঝেই তার পেটের সমস্ত তলদেশ একেবারে শীতল-হয়ে গেছে। সক্রেটিস আচ্ছাদন মুক্ত করে যে কথা কয়টি উচ্চারণ করলেন তা-ই তাঁর শেষ কথা। কথাগুলো হল ঃ 'ক্রিটো, আমরা এই সকিউলেপার নিকট একটা মোরগের জন্য ঋণী; তা ফিরিয়ে দিয়ো—এতে অবহেলা করো না যেন' ক্রিটো বললেন, 'আপনি যা বললেন তা পালন করা হবে। কিন্তু বলুন, আপনার আর অন্য কিছু বলবার আছে কিনা।' এ প্রশ্নের উত্তর সক্রেটিস দিতে পারেননি। ঠিক সে সময়ই তাঁর সমস্ত শরীর কম্পন দিয়ে খেঁচিয়ে উঠল। বিষপ্রদাতা তাঁর শরীরটা আবৃত করে দিলেন—কিন্তু সক্রেটিসের চোখ যেন তখনও স্থির হয়ে আছে। ক্রিটো সব বুঝতে পেরে তাঁর চোখ-মুখ-নাক বন্ধ করে নিল।"

সক্রেটিসের দর্শনতত্ত্ব প্রধানতঃ আমরা প্লেটো ও জেনোফেন্‌সের কাছ থেকে পাই। সক্রেটিস স্বয়ং তাঁর দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন লিপি বা গ্রন্থ না রেখে গেলেও, তাঁর শিষ্য জেনোফেন্‌স্ এবং প্লেটোর লেখনী থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এ দু' মহাত্মার বিবরণে অনৈক্য

থাকলেও এরিস্টটলের নিরপেক্ষ সমালোচনায় কোন ভুল ধারণা আসতে পারেনি। সক্রেটিস সফিস্টদের শিক্ষার প্রকাশ্য সমালোচনা করেন। সক্রেটিসের মতে, মানুষের নৈতিক জ্ঞান হল জীবনের অমূল্য সম্পদ। অন্যসব জ্ঞানই নৈতিক জ্ঞানের অধীন। পদার্থ, জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত শাস্ত্রের জ্ঞানকে তিনি খুব বেশী একটা মূল্যবান বলে মনে করেন না। তিনি শহরের বাইরে কোথাও বেড়াতে যাননি; কারণ, দিগন্ত মাঠ এবং সুবিস্তৃত পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা থেকে শিখবার কিছু নেই। সফিস্টস্‌দের জ্ঞান সংবেদনের উপর নির্ভরশীল। এ সংবেদন দিয়েই সফিস্টরা বস্তুত সত্যকে একেবারে ধ্বংসের পথে নিয়ে আসে। সক্রেটিসের মতে, জ্ঞান প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। প্রজ্ঞার মারফতেই আমরা বস্তুর বস্তুগত-সত্যতা নির্ধারণ করতে পারি। সংক্ষেপে বলতে গেলে 'সার্বিক জ্ঞান' (concept) হল বস্তুর যথার্থ জ্ঞান। 'সার্বিক-জ্ঞান' দিয়েই বস্তুর জ্ঞান। সার্বিক-জ্ঞান বলতে বস্তুর জ্ঞানকে বুঝায়। প্রশ্ন : সার্বিক-জ্ঞান কি? কোন শ্রেণী বা জাতি সকলের মধ্যে যে সাধারণ ও আবশ্যক গুণগুলো (Common & essential attributes) থাকে, তাদের সমষ্টিকে সার্বিক জ্ঞান বলে। সার্বিক-ধারণা জাতি নামের মানসিক প্রতিরূপ। সার্বিক-ধারণা কেবল জাতি বা শ্রেণীর বেলায় ব্যবহার যোগ্য, ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের বেলায় নয়। কোন শ্রেণীর সকল সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ ও আবশ্যক গুণাবলিবিশিষ্ট বস্তুনিচয়ের সমগ্র শ্রেণীর মানসিক প্রতিবেদনকে সার্বিক বা সামান্য ধারণা বলে। মানুষ মরণশীল বলতে কোন ব্যক্তি বিশেষের মরণশীলতাকে না বুঝিয়ে সমগ্র মানব জাতির মরণশীলতাকেই বোঝায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের উপর প্রযোজ্য। আমাদের ধারণার এই সার্বিক রূপকেই সামান্য বা সার্বিক ধারণা বলা হয়।

প্রজ্ঞা হল সার্বিক-ধারণার ধী-শক্তি (Faculty)। প্রজ্ঞা দু'ভাবে হতে পারে: প্রথমতঃ, অবরোহ এবং দ্বিতীয়তঃ, আরোহ। বিশেষ বস্তু বা ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে যে সাধারণ সত্য বা নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে 'সামান্যীকরণ' বলে এবং এ 'সামান্যীকরণ' কেবল মাত্র

আরোহ পদ্ধতি দ্বারাই সম্ভব এ সামান্যিকরণ কোন বিশেষ বস্তু বা ঘটনাকে না বুঝায়ে কোন শ্রেণী বা জাতি সমগ্রকে বুঝায়, (Whole class of things) অর্থাৎ সামান্যীকরণ সব-সময়ই শ্রেণী বা বস্তুর সার্বিক ধারণা (concept)। একটা শ্রেণী বা জাতি থেকে কয়েকটা বিশেষ ঘটনা বা দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে আরোহ-পদ্ধতিতে সামান্যীকরণে উপনীত হয়ে সার্বিক ধারণা করা হয়। রহিম, করিম ও কালাম প্রভৃতি কয়েকজনের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ অবলোকন করেই আমরা সকল মানুষের মৃত্যুকে আন্দাজ করে বলি 'সব মানুষ মরণশীল।' কতক বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুকে পর্যবেক্ষণ করে যখন আমরা একটা "সাধারণ সত্যে" উপনীত হই, তখনই সেটা হয় আরোহ-পদ্ধতি (Inductive method)। আরোহ-পদ্ধতির প্রধান কাজই হল কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তকে লক্ষ্য করে একট সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। অন্যদিকে অবরোহ-পদ্ধতি (Deductive method) আরোহ-পদ্ধতির ঠিক বিপরীত আরোহের সাহায্যে উপনীত সার্বিক (Universal) সিদ্ধান্ত কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের বেলায় সঠিক প্রযোজ্য হয় কি না, তা-ই নিয়ে আলোচনা করে অবরোহ-প্রণালী। একটা উদাহরণ নেয়া যাক্। রহিম, করিম, রাম, ও শ্যাম নামক কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুকে পর্যবেক্ষণ করে যখন আমরা একটা সার্বিক সিদ্ধান্ত করি যে, "সব মানুষই মরণশীল" তখনই সেটা হয় আরোহ অনুমান। পুনরায়, "সব মানুষ মরণশীল" এ সার্বিক বা সাধারণ অনুমান থেকে যখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের "করিমও মরণশীল" তখন সেটা হয় অবরোহ-অনুমান। সব মানুষই যদি মরণশীল হয় এবং আমাদের করিমও একজন মানুষ হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই "করিমও মরণশীল" এ সিদ্ধান্ত অনুসৃত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সার্বিক-ধারণা (Concept) গঠন (Formation) করাই হইল আরোহ-তর্ক বিচারের কাজ। অপর দিকে, এ 'সার্বিক-ধারণা' ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের ক্ষেত্রে সঠিক প্রয়োগ হয় কি না, তা' উপপাদন করাই হল অবরোহ-বিজ্ঞানের কাজ।

সমস্ত জ্ঞানকে 'সার্বিক-ধারণা'র উপর ছেড়ে দিয়ে সক্রেটিস প্রজ্ঞাকেই

জ্ঞানের মুখপত্র হিসেবে ধরে নেন। এখানেই সফিস্টস্ বা তার্কিক-গোষ্ঠীর সঙ্গে সক্রেটিসের মূল পার্থক্য। যেখানে তার্কিক-গোষ্ঠী ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা সংবেদনকে জ্ঞানের প্রধান উপায় হিসেবে ধরে নেন, সক্রেটিস্ সেখানে প্রজ্ঞা বা বোধিকে (Understanding) জ্ঞানের প্রধান উৎস হিসেবে ধরে নেন। বস্তুতঃ সক্রেটিসের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অভিন্ন ও একাত্ম। জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাকে একাসনে অভিষিক্ত করায় মনে হয় সক্রেটিস্ যেন সার্বিক ও সার্বজনীন এক মানদণ্ড প্রণয়ন করারই প্রচেষ্টা করছেন। যেখানে সফিস্টস্‌গণ ব্যক্তি-বিশেষকে বস্তুর মূল্য নির্ধারক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সক্রেটিস্ সেখানে বস্তুর এক 'সার্বিক ধারণা' গঠনেরই নির্দেশ দেন। এ 'সার্বিক ধারণা' আমরা মেনে নিতে বাধ্য। কারণ, এ 'সার্বিক-ধারণা' প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। এখন সঠিক 'সার্বিক-ধারণা' গঠন করাই হল সক্রেটিসের দর্শনের মূল কথা। জ্ঞান বলতে সক্রেটিস কোন ব্যক্তি-বিশেষের ইন্দ্রিয় বা সংবেদনের খেয়াল-খুশীমত দেওয়া যে-কোন নামকে গ্রহণ করতে রাজী নন। জ্ঞান বলতে তিনি বুঝেন, বস্তুর সাধারণ সত্যতা যা ব্যক্তি বিশেষের ইন্দ্রিয় সংবেদনকে ছাড়িয়ে শাশ্বত এক সার্বিক-সাধনার সৃষ্টি করে যা মেনে নিতে আমরা সবাই বাধ্য। পূণ্য (virtue) কি ? বিজ্ঞতা (prudence) কি ? সহিষ্ণুতা (Tempernce) কি ? এ-সব প্রশ্ন সক্রেটিস জানতে চান। আসলে এ সবের যথার্থ সার্বিক ধারণার রূপ তিনি জানতে চান যা দিয়ে তিনি এক বস্তুগত সত্য এবং সাধারণ বস্তুগত নীতি আবিষ্কারেরই প্রচেষ্টা করেন। 'পূণ্য', 'বিজ্ঞতা' এবং 'সহিষ্ণুতা' সাধারণ ও আবশ্যক গুণগুলো নিয়ে সক্রেটিস এক সার্বিক ধারণার সৃষ্টি করে ব্যক্তি-বিশেষ-এর যথার্থতা প্রমাণ করেন। সার্বিক ধারণা এবং বস্তু যদি সামঞ্জস্য-পূর্ণ না হয়, তবে তিনি আরেকটা নতুন সার্বিক ধারণা সৃষ্টিতে অগ্রসর হন। সক্রেটিসের জ্ঞান-মতবাদ তাঁর নিজের জন্য নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এর সৃষ্টি। লক্ষ্য করার বিষয় যে, সক্রেটিস তাঁর জ্ঞান-মতবাদকে সব সময় কার্যের অধীন করে রেখেছেন। মহৎ, উদার এবং পুণ্যভাবে জীবনকে

পরিচালিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি পুণ্যের সার্বিক স্বরূপকে জানতে চান। সক্রেটিস্ বিশ্বাস করেন যে, কোন মানুষই ন্যায় কাজ করতে পারে-না, যদি না সে ন্যায়ের সার্বিক-জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। তাঁর ধারণা সার্বিক-জ্ঞান লাভ করলে কেউ কখনও কোন অন্যায় করতে পারে না, জ্ঞান থেকেই নীতি-শাস্ত্রের উৎপত্তি। জ্ঞানের অভাব হলে ন্যায় কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। অজ্ঞতা থেকে সমস্ত অন্যায়ের উৎপত্তি। সক্রেটিস্ বলেন, ন্যায়ের সার্বিক-রূপ জানতে পারলে একজন নিশ্চিত-ভাবে ন্যায় কাজ করবেই—এর অন্যথা হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষই মঙ্গল (good) কামনা করে; কিন্তু মঙ্গলের যথার্থ সার্বিক-রূপ জানা নেই বলেই আমাদের আজ এ দুর্গতি। সক্রেটিসের মতে, কোন মানুষই ইচ্ছা করে অন্যায় করে না। মানুষের অজ্ঞতা এবং ন্যায়ের সার্বিক-ধারণার অভাব হেতু সে অন্যায় করে। সক্রেটিস্ বলেন, "যদি একজন ইচ্ছে করে অন্যায়ও করেন, তবে তিনি ঐ ব্যক্তি থেকে অধিকতর শ্রেয়ঃ, যিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করেন। কারণ, প্রথমজন মঙ্গলের সার্বিক এবং সাধারণ শর্তগুলো মেনে চলেন; কিন্তু অপরজন 'মঙ্গল' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।"

সক্রেটিসকে সমালোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল বলেন যে, সক্রেটিস্ মানবাত্মার ভাবাবেগ অনুভূতি এবং সংবেদন দিকটাকে একেবারে অবহেলা করেছেন, কিংবা আদৌ এদিকটা আলোচনা করতে ভুলে যান। সক্রেটিসের মতে, সব কাজই প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু তিনি ভুলে যান যে, সাধারণ মানুষের কাজগুলো প্রায়ঃশই আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে পরিচালিত। আত্মার প্রজ্ঞার অংশটুকু সাধারণের জন্য নয়। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আত্মার আবেগ, অনুভূতি ও সংবেদনের অংশ প্রাধান্য লাভ করে। এরিস্টটলের সমালোচনা অখণ্ডনীয় ও অপ্রতিরোধ্য। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, মানুষ ন্যায়কে সম্পূর্ণরূপে জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করে। কিন্তু সক্রেটিস্ এখানে একটা সাধারণ ভুল করেন। সম্ভবতঃ নিজ ব্যক্তিগত জীবন থেকে তাঁর যুক্তির অবতারণা করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সাধারণ মানুষের মানসিক

দুর্বলতা থেকে অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। জীবনে কোন দিন তিনি ভাব বা অনুভূতি দিয়ে পরিচালিত হননি; প্রজ্ঞার দ্বারাই প্রশাসিত এবং পরিচালিত হয়েছেন। প্রজ্ঞার মারফতে যখন তিনি একবার ন্যায়কে জেনেছেন, তিনি ন্যায় করবেনই, কেউ তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। মানুষ কিভাবে যে ন্যায়কে জেনেও অন্যায় করতে পারে, সে কথা তিনি বুঝতেই অক্ষম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ন্যায়কে পুরোপুরিভাবে না জানার জন্যেই মানুষ পাপ বা অন্যায় করে। সক্রেটিসের ব্যক্তিগত চরিত্র ও গুণাবলীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে তাঁর যুক্তিকে অবহেলা করা চলে না।

পুণ্য এবং জ্ঞানকে একত্রীভূত করায় সক্রেটিসের যুক্তিতে দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, জ্ঞানের মত পুণ্য শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। গণিতশাস্ত্রের মত পুণ্য শিক্ষা করা যায় বলে আমরা সাধারণতঃ মনে করি না। বিশেষ কতগুলোর প্রকৃতির উপর পুণ্য নির্ভরশীল বলে আমাদের বিশ্বাস। জন্মগত বৈশিষ্ট্য, বংশ, পারিপার্শ্বিকতা, অভ্যাস, রীতিনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি মিলে সহজ স্বাভাবিকভাবে মানুষের 'পুণ্য' বা 'সৎ' গুণ গড়ে ওঠে। মানুষ যাই হোক না কেন, তার আসল চরিত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। অভ্যাস এবং আত্ম দমনে মানুষ নিজেকে শুধরিয়ে নিতে পারলেও তার সমগ্র চরিত্রের কোন আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। যতই চেষ্টা করুক না কেন, চিতাবাঘ কখনও তার পায়ের দাগগুলোকে একেবারে মুছে নিতে পারবে না। কিন্তু সক্রেটিসের অভিমত হল, যেহেতু জ্ঞান 'পুণ্যে'র শর্ত এবং জ্ঞানকে শিক্ষা দেওয়া চলে; সুতরাং পুণ্যকেও শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে। (Virtue can be taught) আমরা পুণ্য সম্বন্ধেও শিক্ষা-লাভ করতে পারি। কিন্তু সব চেয়ে অসুবিধা হল 'সার্বিক পুণ্যে'র প্রভু বা শিক্ষক পাওয়া, যিনি আমাদের নিকট পুণ্যের স্বরূপ উদঘাটন করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, সক্রেটিস বলেন, পুণ্য এক (Virtue is one)। আমরা সাধারণতঃ 'মেজাজ' (Temperence), বিজ্ঞতা (Prudence), পরিণামদর্শিতা (Foresight), সদিচ্ছা (Benevolence), দয়া (kindness)

প্রভৃতি পুণ্যের কথা উল্লেখ করি। কিন্তু সক্রেটস বলেন, এক জ্ঞান থেকেই এসব বিশেষ বিশেষ পুণ্যের উৎপত্তি। পুণ্যের উৎস হল পাণ্ডিত্য (Wisdom) বা জ্ঞান। এ জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের ভেতরেই অন্যসব পুণ্য লুকিয়ে আছে। জ্ঞান এবং পুণ্যকে একই সঙ্গে বসিয়ে তিনি আমাদের কাছে আবার নতুন এক রূপে ধরা দেন। জ্ঞান অর্থাৎ পাণ্ডিত্য হল চরম পুণ্য (Sole v rtue) যা অন্যসব পুণ্যকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। আসলে পুণ্য এক এবং জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যই হল চরম-পুণ্য।

প্রশ্ন হতে পারে, দর্শন-ইতিহাসে সক্রেটিস্ কোন স্থান দখল করে আছেন? উত্তরে বলা চলে, সক্রেটিসের দর্শন-তত্ত্বের দু'টো দিক রয়েছে ঃ প্রথমতঃ, তার জ্ঞান-মতবাদ (doctrine of knowledge); দ্বিতীয়তঃ, তাঁর নীতি-শাস্ত্র বা নৈতিক-বিধানাবলী। মানুষের অনুভূতি ও সংবেদনের দিকটাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাঁর নীতি-দর্শনে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে, ইতিহাসে তিনি খুব বড় একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর 'সার্বিক-ধারণা' বা 'সামান্যীকরণ' দর্শন-ইতিহাসে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। এ সার্বিক ধারণা অবলম্বন করেই প্লেটো এবং প্লেটোর মাধ্যমে এরিস্টটল এবং পরবর্তী সব ভাববাদিগণ তাঁদের বিরাট বিরাট গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী রচনা করে যান। এ সার্বিক ধারণার সৃষ্টিতেই তিনি ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ স্থান দখল করে আছেন। সার্বিক ধারণার সৃষ্টিতে তিনি যে-যুক্তির অবতারণা করেন, তা অত্যন্ত আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত।

সক্রেটিসের সার্বিক-ধারণা দর্শন-ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আধুনিক সমস্ত ভাববাদের অন্তর্নিহিত বীজ এখানে মিলে। কোন একটা শ্রেণী সকলের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ ও আবশ্যকীয় গুণাবলীর সমাহারে একটা সর্বসম্মত ধারণা বা কল্পনা করার এই প্রথম প্রয়াস। সামান্যীকরণের মাধ্যমে সার্বজনীন অক্ষয় সত্য সৃষ্টির গৌরব পুরোপুরিভাবে সক্রেটিসের। তাঁর বিশেষত্ব এখানে যে, যে-যুগ ব্যক্তি-বিশেষের যুক্তির উপর নির্ভর করে মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা,

বিদ্যা-বুদ্ধি একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছিল, সক্রেটিস সে যুগে এক বস্তুগত সত্য প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত দর্শনকে এক জটিল পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করেন। বহু বর্ষব্যাপী ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারের সমালোচনা করে তিনি এক অনন্ত সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করেন। বুদ্ধি-বৃত্তির অভাবজনিত ঘোর অরাজকতার দিনে জনসাধারণকে চিন্তার সাহায্যে বিষয়সমূহের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ধার করতে উপদেশ দেন। অজ্ঞান তিমির দূর হলে মানুষ যাতে নির্ভুল ধারণার সাহায্যে সামাজিক মঙ্গল সাধন করে সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করতে পারে তারই চেষ্টা তিনি করে গেছেন। তাঁর সময় হতে ধর্মনীতি দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জ্ঞান ও ইচ্ছা নিয়েই সক্রেটিসের দর্শন। অর্থাৎ, মানুষ যতই চিন্তা করবে এবং বুঝতে চাইবে, ততই সে কর্তব্য পালনে সমর্থ হবে।

নীতি-শাস্ত্রের দিক থেকে যদিও তাঁর বিশেষ একটা কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় না, তবুও সক্রেটিসই নীতি-বিজ্ঞানের প্রবর্তক। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, সক্রেটিস প্রোটাগোরাসের ন্যায় মানুষমাত্রই সৎ ও সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড—এ নীতির অনুসরণ করেন; কিন্তু আসলে তা নয়। সক্রেটিসের বিশেষত্ব এই যে, তিনি নীতি-শাস্ত্র বিশেষ (particular) হতে সামান্যী-করণের প্রকরণ বিশেষ-বিধি থেকে সার্বজনীন বিধির সংকলনের প্রচেষ্টা করেন। বিভিন্ন প্রকৃতির মানব-চরিত্রের পার্থক্য থেকে অপরিবর্তনীয় এক মানবচরিত্র নির্ণয়ের প্রচেষ্টাও তিনি করেন। তাঁর সময় হীনচরিত্র সাধারণ মানুষের ভিতরে যে বহু বর্ষব্যাপী ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কারসমূহ প্রচলিত ছিল, সে সব ধারণা ও সংস্কারের সমালোচনা করে তিনি এক অখণ্ড ও অপরিবর্তনীয় সত্যে উপনীত হন। সে সত্য সমগ্র মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি 'বিবেক'—মানব মনের অবশ্য পালনীয় বিধি। জেনোফেনসের মতে, সক্রেটিস সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞতা, সাহস-ভীরুতা, রাজ্য ও রাজ্যের বাসিন্দা এ সব শব্দের যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপণ করে কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না। নীতি-জ্ঞান যে মানুষের একান্ত প্রয়োজন, এ জ্ঞান ব্যতিরেকে যে মানুষের সুপ্ত জ্ঞানাঙ্কুরগুলো প্রস্ফুটিত হয় না, তারই প্রচার তিনি করে গেছেন। জ্ঞানালোকের সাথে নৈতিক উৎকর্ষতা সমানুপাতিক।

"সক্রেটিসের নাম শুধু তাঁর দর্শনের জন্যে নয়, বীরের ন্যায় মৃত্যুকে নির্ভীকভাবে আলিঙ্গন করায় তাঁর মাহাত্ম্য অনেকাংশে বেড়ে গেছে। তাঁর দর্শনে মৌলিকতা কিছু থাক্ বা না থাক্ যে-সব মহাপুরুষদের আগমনে সংসারে স্থায়ী ও অত্যাবশ্যক সংস্কারসমূই সাধিত হয়, তিনি তাঁদেরই একজন। বিবেককে উচ্চাসন দেওয়ায় এবং সার্বজনীন অক্ষয়-সত্য আবিষ্কার করায় তিনি ইতিহাসের পাতায় আজও সমুজ্জ্বল। যে সময় মানুষ সৎ-গুণগুলোকে আপেক্ষিক (relative) গুণবলে অভিহিত করত এবং যখন অনুষ্ঠান-মাত্রের ভাল-মন্দের বিচার, বিবেকবাণীর অনুসরণ না করে কৃতকার্যতার অনুসরণ করে বলে বিশ্বাস ছিল ; সে সময়ই সক্রেটিস বিবেকের প্রভুত্ব ও ব্যক্তিগত খাম-খেয়ালির উপর নৈতিক শাসনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সাহসী হয়েছিলেন। তার ফলে দর্শন ও নীতিশাস্ত্র উভয়ের সংস্কার সাধিত হয়।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্ধ-সক্রেটিক্‌স্ সম্প্রদায়

(The Semi-Socratics)

সক্রেটিসের মৃত্যুর পর চিন্তার জগতে এক বিরাট বিপর্যয় ঘটে। সতত, মহত্ব বা পুণ্যের (Virtue) কোন সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে না পারায় সক্রেটিসের শিষ্যদের মধ্যে এ নিয়ে এক মতভেদ দেখা দেয়। বহু শিষ্যদের মধ্যে সক্রেটিসের দর্শন-তত্ত্বকে একমাত্র প্লেটোই পুরোপুরি ও সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর অন্যান্য অনুসারী ও ব্যক্তিগত বন্ধুদের মধ্যে এন্টিস্‌থেনিস (Antisthenes), এরিস্‌টিপ্পাস (Aristippus) এবং ইউক্লিড (Euclid)-এর নাম করা যেতে পারে। তাঁরা প্রত্যেকই সক্রেটিসের 'পুণ্য' কথাটিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। এন্টিস্‌থেনিস সিনিক (cynic) বা উদাসীন সম্প্রদায় এরিস্‌টিপ্পাস সিরেনেইক (cyrenaics) বা শুদ্ধ-আনন্দবাদ গোষ্ঠী এবং ইউক্লিড মিগারিক (Megarics) সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

এন্টিসথেনিস (Antisthenes) ঃ উদাসীন (Cynics) বা বৈরাগ্যবাদ

এন্টিস্‌থেনিস উদাসীন বা সিনিক (Cynic) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বহুল প্রচলিত কথা সততা এক, জ্ঞানের উপর সততা প্রতিষ্ঠিত এবং একে শিক্ষা দেওয়া চলে এ-যুক্তি বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেন। এন্টিসথেনিস সক্রেটিসকে শ্রদ্ধা করেন একজন মহৎ এবং স্বাধীনচেতা ব্যক্তি চরিত্রের অধিকারী হিসেবে, বিদ্বান, পণ্ডিত বা দার্শনিক হিসেবে নয়। সক্রেটিস অন্যান্য মতবাদ ও মতাদর্শকে উপেক্ষা করে স্বীয় 'মঙ্গলে'র (Right) ধারণাকে উচ্চাসন দিয়েছেন। সক্রেটিস স্বাধীন, মুক্ত ও নিরপেক্ষ চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তাঁর এ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাব তাঁর স্বীয় ব্যক্তিত্বেরই উপজাত (By product)। সক্রেটিসের অন্তঃকরণ পাণ্ডিত্য ও অগাধ জ্ঞানে পূর্ণ থাকায় তিনি বাহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। অন্যের মত ও মতাদর্শের

প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—বরং উদ্দেশ্য সাধনের এক উপায়-বিশেষ ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, উদাসীন সম্প্রদায়ের লোকগণ সক্রেটিসের ব্যক্তিগত পার্থিব সুখ-বিলাস বঞ্চিত জীবনকেই তাদের দর্শনের লক্ষ্য বস্তু করে নেয়। ফলে, উদাসীন গোষ্ঠী পার্থিব সমস্ত মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে এক কঠোর ও সংযম জীবন যাপনে প্রয়াসী হন। সক্রেটিস 'নৈতিকদর্শন'কে অত্যন্ত উচ্চাসন দেন। নৈতিক জ্ঞান সর্বোচ্চ ও শ্রেয়—অন্যান্য জ্ঞান নৈতিক জ্ঞানের অধীন। কিন্তু সক্রেটিসের এ 'নীতিজ্ঞান'কে উদাসীন সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ভুল করে ভিন্ন অর্থ করে। তাদের মতে, নৈতিক জ্ঞান সর্বোচ্চ জ্ঞান—অন্যান্য জ্ঞান একেবারে অপ্রয়োজনীয়। ফলে, তারা শিল্প, সাহিত্য ও কলা বিদ্যা এবং অন্যান্য জ্ঞানকে অত্যন্ত অবহেলা ও উপেক্ষা করে চলে। এন্টিসথেনিস বলেন, সুখের জন্যে সততাই যথেষ্ট; সততার জন্যে অন্য কোন কিছুর প্রায়োজন নেই। সক্রেটিসের শক্তিই প্রয়োজন (Strength of Socrates), মহাত্মের জন্যে কল্পনার চাইতে কার্যের প্রয়োজন—কোন বিদ্যা বা শিক্ষার প্রয়োজন নেই। উদাসীন সম্প্রদায়ের মূল আদর্শ হল এমনিভাবে নেতিবাচক। বাহিক ও পার্থিব মূল্যবোধের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন করাই হল উদাসীন সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য। সিনোপীবাসী ডাইওজিনিস (Diogenes of sinope) সাধারণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ঔদ্ধত্যের প্রতিমূর্তি বলে উক্ত হয়েছেন।

উদাসীন সম্প্রদায়ের নিকট সততা বা পুণ্যই হল একমাত্র মঙ্গল, অসৎ অমঙ্গল। এ কল্যাণ ও অকল্যাণ ব্যতিরেকে এ জগতে আর কিছু নেই। অন্য সব কিছু হল উদাসীন (Indifferent)। ধন দৌলত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি জীবনকেও মঙ্গলরূপে গ্রহণ করা যায় না। ঠিক তেমনি দুঃখ-দারিদ্র্য এবং মৃত্যুকেও অকল্যাণ রূপে গ্রহণ করা যায় না। আত্মহত্যা পাপ নয়। মানুষ তার জীবনকে ধ্বংস করতে পারে; কারণ, এগুলো অকল্যাণকর নয়, বরং এ করে মানুষ তার জীবনের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়। সৎ ও অসৎ-এর পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট, পাণ্ডিত্য ও মূর্খের পার্থক্য তেমনি পরিষ্কার। সমস্ত মানুষকে পণ্ডিত ও মূর্খ এ দু'-

শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। এ দু'য়ের ভেতর কোন তৃতীয় পদ নেই। 'সততাকে' এক এবং অবিভাজ্য হওয়ার দরুন, মানুষ 'সততাকে' হয় পূর্ণাঙ্গ-রূপে গ্রহণ করে, অথবা একেবারেই গ্রহণ করে না। মহত্ত্বকে পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করলে মানুষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়। অপরপক্ষে মহত্ত্বকে গ্রহণ করতে না পারলে সে মূর্খে পরিণত হয়। পণ্ডিতব্যক্তি জগতের সব সততা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মূর্খ ও সমগ্র পূর্ণতার অধিকারী। অন্যদিকে মূর্খব্যক্তির মধ্যে সমস্ত অকল্যাণ ও অপূর্ণতা বিদ্যমান।

আত্ম সুখবাদ বা আনন্দবাদ

(Cysenaies)

এরিস্টিপ্পাস (Aristippus)

সিরেনেইকদের মতে, সততা বা পূণ্যই হল জীবনের মূল লক্ষ্য। তবে, এই সততা বা পূণ্যকে তারা নামেমাত্র মুখে স্বীকার করে নেয়। সক্রেটিস অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও 'মহত্ত্বের' (Virtue) কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করে যেতে পারেননি। এই ক্ষেত্রে, সিরেনইক-গোষ্ঠী তাদের নিজেদের মনগড়া মত 'মহত্ত্বের' এক সংজ্ঞা দান করে 'মহত্ত্বে'র ব্যাপকতাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে পরিণত করে; সততা হল সুখের একমাত্র পথ। কিন্তু তাই বলে সুখই আমাদের একান্ত কাম্য, একথা বলা উচিত নয়। সততা বা পুণ্য সুখ আনয়ন করে বলেই সক্রেটিস 'পুণ্য'কে গ্রহণ করেননি। 'সততাই সর্বোত্তম উপায়' (Honesty is the best policy)—তার মানে এই নয় যে, ক্ষেত্রবিশেষে সর্বোত্তম উপায় না হলে, মানুষ তার সততার কর্তব্যকে অবহেলা করবে। উত্তম উপায় না হলেও সততার কর্তব্য আমাদের পালন করা উচিত। যদিও সক্রেটিস সুখ কথা ব্যতিরেকে 'পুণ্য' কথাটি আমাদেরকে বুঝাতে পারছিলেন না. তথাপি এই থেকে এ মনে করা উচিত নয় যে, সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য বস্তু। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সিরেনেইকগোষ্ঠী সক্রেটিসের এ তত্ত্বকে ভুল করে সুখকেই জীবনের মুখ্য

উদ্দেশ্য মনে করে। এরিস্‌টিপ্পাস সুখ বা আনন্দকেই মূল লক্ষ্য বলে মনে করেন। এরিস্‌টিপ্পাস বলেন, সততা বা পুণ্য নিঃসন্দেহে জীবনের চরম লক্ষ্য, কারণ, এটা সুখ আনয়ন করে। সুখ বা আনন্দ আনয়ন করে বলেই সততা অর্থপূর্ণ।

এরিস্‌টিপ্পাসের এ মনোভাব প্রোটাগোরাস (Protagoras) এবং সফিস্টস্ (Sophists) কর্তৃক প্রভাবিত বলে মনে হয়। প্রোটাগোরাস বস্তুগত সত্যের মানদণ্ডকে অস্বীকার করেন। সফিস্টসগণও নৈতিক মানবিচারকে অস্বীকার করেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার স্ব-স্ব কার্যের মানদণ্ড। নিজের স্ব স্ব বিচার ব্যতিরেকে নৈতিকতার কোন সার্বজনীন মানদণ্ড নেই। এরিস্‌টিপ্পাস্ নৈতিকতার এই নীতি তাঁর আনন্দবাদ বা সুখবাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। আনন্দ বা সুখের কোন সার্বিক মানদণ্ড নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের নিকট তার নিজ নিজ আনন্দ বা সুখ তার নিকট ভাল। কোন কিছুই মন্দ বা অমঙ্গল নয়; কেবলমাত্র আনন্দদান করার ক্ষমতা থাকলেই হল। যে উপায়েই হোক, সুখ বা আনন্দ লাভ করাই হল পরম লক্ষ্য। আনন্দবাদের মতে, যুক্তি বিবেচনা নয় বরং বাসনা কামনাই হল মানব জীবনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। সুখবাদীর নীতি বিজ্ঞানের মতে, বাসনা কামনা বিসর্জন দিয়ে আত্ম নিগ্রহের প্রচার বাস্তব জগতে নিতান্তই অচল। এই হিসেবে বলা যেতে পারে, আনন্দ বা সুখবাদের দৃষ্টিতে মানুষ হল বাসনা কামনার আজ্ঞাধীন জীব। সংবেদনশীল মানুষের জীবন থেকে ভোগ বিলাস বাদ দিলে তার জীবন একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ আনন্দবাদের মতে, সর্বাধিক আনন্দ লাভই হল মানব জীবনের পরম নৈতিক আদর্শ।

এই নৈতিক দর্শন ব্যবহারিক জগতে কোন বিপর্যয় ডেকে আনবে কিনা, তা নির্ভর করে ব্যক্তি কোন ধরণের আনন্দ পেতে চায় তার উপর। ব্যক্তি সদানন্দ লাভ করতে চাইলে, সে সদানন্দ পেতে পারে। ইন্দ্রিয়ানন্দ চাইলে, তাও সে লাভ করতে পারে। তবে, সব বিষয়ে মিতাচার ভোগ-বিলাস, আত্ম সংযম এবং পাশবিক বৃত্তি দমন একান্ত আবশ্যক। যে কোন অবস্থায় হোক, মানব সর্বদা আত্ম-সংযম

করতে শিখবে। তারতম্য অনুসারে আনন্দের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে। মানসিক সুখসমূহ বন্ধুত্ব পিতামাতার প্রতি ভক্তি, সাহিত্য সেবা এবং কলাবিদ্যার চর্চা এরা ইন্দ্রিয়জ ক্ষণিক সুখাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের সুখদান করে। জ্ঞানীগণ ইন্দ্রিয়জনিত ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে সচ্চরিত্র লব্ধ স্থায়ী সন্তোষ ও আনন্দ কামনা করেন। এরিস্‌টিপ্পাসের আনন্দবাদ বহু পরিবর্তনের পর অবশেষে নৈরাশ্যবাদে (Pessimism) পরিণত হয়। কিরীনায়িক সম্প্রদায়ের মতে, সুখলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। তবে কেউ-বা সুখকে ইন্দ্রিয়জ ও ক্ষণিক বলে মনে করেছেন, কেউ-বা তাকে স্থায়ী সুখ বা সন্তোষ বলেছেন। জীবনের সুখের অপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক। অবিমিশ্র সুখ স্বপ্নাতীত। মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা অবিমিশ্র সুখলাভ মানুষের পক্ষে দুর্ঘটনা বলে জীবনের কোন মূল্য নেই। সুতরাং জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। কারণ, মৃত্যুতে দুঃখের অবসান হয় এবং প্রকারান্তরে সুখ লাভেরই সম্ভাবনা। কিরীনবাসী এ্যানিসিরিসের (Aniceris) হাতে নৈরাশ্যবাদে পুনরায় আশার সঞ্চার হয় এবং ইপিকিউরাস (Epicurus) কর্তৃক উন্নতি সাধিত হয়।

মিগারা সম্প্রদায়
(The Megaries)

ইউক্লিড (Euclid)

মিগারার ইউক্লিড মিগার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতবাদ সক্রেটিক্‌বাদ ও ইলিয়াটিক্‌বাদের সমন্বয়মাত্র। সততা বা পুণ্য হল জ্ঞান, কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কিসের জ্ঞান? এখানে ইউক্লিডের উপর ইলিয়াটিক্‌সদের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। মিগার সম্প্রদায় পারমানাইডিসের মত এক পরম সত্তায় বিশ্বাসী। 'গতি' ও 'বহু' অবভাস মাত্র। ইন্দ্রিয়জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। জীবন সত্তাই প্রকৃত সত্য। সততা যদি জ্ঞানই হয়, তবে তা হল জীবন সত্তার জ্ঞান। এখানে ইউক্লিড সক্রেটিস-দর্শনের মূল তত্ত্ব মঙ্গলের (good) ধারণাকে ইলিয়াটিক্‌সদের 'জীবন সত্তার' (Being) সাথে

একত্রে মিশিয়ে এ দুই মতবাদের মধ্যে এক সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হন। কল্যাণ বা মঙ্গলকে তিনি জীবন সত্তার সাথে এক ও অভিন্ন করে দেন। এক (One), জীবনসত্তা, ঈশ্বর বা মঙ্গল হল একই বস্তুর বিভিন্ন নামকরণ। ঘটা বা জন্মব্যাপার (Be coming), বহু ও অকল্যাণ জীবন সত্তার বিরোধী নামকরণ, অর্থাৎ অসত্তা। 'বহু'কে আবার তিনি অকল্যাণ, বা অমঙ্গলের সাথে সনাক্ত করেন। বহু ও অমঙ্গল উভয়ই মায়া এবং অবভাসমাত্র। এদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। জীবন সত্তা বা কল্যাণই একমাত্র প্রকৃত সত্য। বিভিন্ন গুণাবলী, যেমন দয়া, সহিষ্ণুতা, বিজ্ঞতা ও পরিণামদর্শিতা সত্তারই বিভিন্ন নামকরণ। অর্থাৎ জীবন সত্তার জ্ঞানই হল পরম জ্ঞান।

উদাসীন সম্প্রদায় পার্থিব মূল্যবোধকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে সততা বা পুণ্য প্রতিষ্ঠিত করে। অপরদিকে পার্থিব মূল্য বোধকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে যেখানে সিরেনেইক সম্প্রদায় সততাকে একমাত্র আনন্দলাভের উপকরণ বলে মনে করে, সেখানে মিগারিক সম্প্রদায় দার্শনিক ধ্যান-ধারণার উপরই যে সত্য প্রতিষ্ঠিত, তারই জয়ধ্বনি করে। সত্তার জ্ঞানই হল পরমজ্ঞান—চাওয়া-পাওয়ার একমাত্র কাম্যবস্তু। বস্তুতঃ মিগারিক সম্প্রদায়ে এ মনোভাব পরবর্তী দার্শনিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

সপ্তম অধ্যায়

চিন্তার প্রাধান্য (ভাববাদ)

প্লেটো (Plato)

প্লেটো-আগমনপূর্ব পর্যন্ত কোন দার্শনিকই আমাদেরকে একটা সুস্পষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ দিয়ে যেতে পারেননি। পৃথিবীর ইতিহাসে প্লেটোর নাম সর্বজনবিদিত। যে-কোন শাস্ত্রে প্লেটোর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিসীম। দর্শনেও তাঁর প্রভাব পূর্ণব্যাপ্ত। অন্যান্য যে-কোন শাখার তুলনায় দর্শনে যে তাঁর প্রভাব সমধিক, এ কথা বলাই বাহুল্য। দর্শন-ইতিহাসে প্লেটোই বোধ হয় সর্বপ্রথম ব্যক্তি; যিনি আমাদেরকে প্রথম বারের মত সুস্পষ্ট, সুষ্ঠু এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা দর্শন, দর্শন-পদ্ধতি ও চিন্তাধারা দিয়ে যান। তিনি পূর্ববর্তী সব দার্শনিকদের দর্শন, চিন্তা এবং মতবাদকে সাহায্যস্বরূপ গ্রহণ করেন। তবে তিনি তাদের মতবাদগুলোকে একত্র করে একটা দর্শন সৃষ্টি করেন নি। প্লেটো স্বয়ং একজন পৃথিবীর মৌলিক সর্বোচ্চ চিন্তাবিদ। তিনি তাঁর পূর্বকার সব চিন্তানায়কদের দর্শনকে ভিত্ হিসেবে গ্রহণ করে তার উপর বিরাট এক সৌষ্ঠবমণ্ডিত দর্শন-রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। পুরানো সব চিন্তা ও দর্শন তাঁর হাতের ছোঁয়া পেয়ে নতুন এক মৌলিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

জীবনী ও গ্রন্থাবলী

প্লেটোর জন্মক্ষণ সঠিক করে বলা দুষ্কর। তবে, আনুমানিক খ্রীঃ-পূঃ ৪২৯—৭ অব্দে তাঁর জন্ম বলে বিশ্বাস। তিনি সম্ভ্রান্ত এথেনীয় পরিবারের ছেলে। বিরাট ঐশ্বর্য্যের মাঝে প্রতিপালিত। ফলে দর্শন-সাহিত্য চর্চা করার মত প্রচুর সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। দার্শনিক প্লেটোর কৈশোর ও তরুণ জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু একটা জানা যায় না। তিনি কবিতা রচনা করতেন। এথেনীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা যে-সব ভাল ও মহৎ শিক্ষা পেয়ে থাকেন, তিনি তাই পেয়েছিলেন।

প্রথমে তিনি হিরাক্লিটাসের শিষ্য ক্রেটিলাসের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরে সক্রেটিস ও মিগারার ইউক্লিডিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইউক্লিডিসের নিকট তিনি পারমাইডিসের দর্শন অধ্যয়ন করেন। পীথাগোরীয়দের গণিত গবেষণায় তাঁর চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। সফিস্টস মতবাদ সম্বন্ধেও তিনি একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। কারণ, সফিস্টসরা তাঁরই সম-সাময়িক। সম্ভবতঃ তিনি এনেক্সোগোরাসের গ্রন্থাবলীও পাঠ করে ছিলেনা কারণ, এসব পুস্তকগুলো তখন এথেন্সে সহজলভ্য ছিল। কিন্তু এ সবই অনুমান সাপেক্ষ। একমাত্র, সক্রেটিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও আজীবন সঙ্গলাভ করার কথা ইতিহাস থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়। সক্রেটিসের জীবনের শেষ আট বৎসর পর্যন্ত প্লেটো তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য এবং বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে কাজ করেছিলেন। স্বীয় শিক্ষকের শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবনে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। প্লেটোর গ্রন্থাবলী এবং দর্শন-সাহিত্যে সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সময়ের ব্যবধানে সক্রেটিসের প্রভাব মুছে যাওয়ারই কথা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে, কালের গতির সাথে সাথে সক্রেটিসের শিক্ষা যেন প্লেটোকে আরও বিজড়িত করে ফেলেছে। কারণ, প্লেটোর শেষ গ্রন্থাবলীতে সক্রেটিস্ জীবনের বহু বিচিত্র গল্প-কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। সক্রেটিস্ প্লেটোর জীবনে এক বিরাট আদর্শ এবং সত্যিকার দার্শনিকের এক মহৎ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"হিরাক্লিটাস্, সক্রেটিস এবং ইটালীয় দর্শন-তত্ত্ব হতে প্লেটোর দর্শন মতবাদের উদ্ভব। হিরাক্লিটাসের মত প্লেটো জগতের নিত্যপরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাস করেন। ইন্দ্রিয়-অনুভূতি প্রতারণা পরায়ণ। সংবেদন দিয়ে কোন ধ্রুব-জ্ঞান জন্মে না। আশু সত্য ইন্দ্রিয় জগতের অতীত। এটা জ্ঞান জগতের সামগ্রী। বিশ্বের চরম সত্য (Ultimate principle) আমাদের অজ্ঞের থাকলেও সকলেই যে আপন-আপন চরিত্র সম্বন্ধে অবগত হতে পারে, এ শিক্ষা তিনি সক্রেটিসের কাছ থেকে পান। একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য আত্মচেতনার সাহায্যেই জীবনের সর্বোচ্চ শ্রেয় কি, সে সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করা

যায়। সক্রেটিস অধ্যাত্ম বিদ্যাতে (metaphysis) সন্দিহান ছিলেন। ইটালীয় দর্শন আলোচনায় প্লেটো অবশ্যই অধ্যাত্ম বিদ্যায় সন্দেহের কোন কারণ দেখতে পাননি। পীথাগোরীয় ও ইটালীয় দর্শনে প্লেটো সক্রেটিস বর্ণিত অন্তরেন্দ্রিয়কে কেবল যে নৈতিক-বিচার বুদ্ধি এবং ব্যবহারিক আধাররূপেই দেখেছেন তা নয়, (moral couscience & practical reason) এতে বস্তুসমূহের অন্ত, অবশ্যম্ভাবী এবং নিরপেক্ষ সত্তা-প্রকাশিকা বিচার-বুদ্ধিরও সন্ধান পেয়েছিলেন (Theoritical reason)। এ ছাড়া, গণিত শাস্ত্র এবং জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধমূলক সূক্ষ্ম বিচার প্রণালীতে তিনি যথেষ্ট মুগ্ধ হন। প্লেটো আধ্যাত্মবিদ্যায় জ্যামিতির বিচার প্রণালীর অনুসরণ করেন। যে-সব স্বাভাবিক সংস্কারের উপর ওঁার দর্শন প্রতিষ্ঠিত, তাদিগকে তিনি 'আদর্শ' (Ideas) 'অনিত্য দ্রব্য-জাতের নিত্য আকার (Typs)', 'পারমার্থিক সত্য (Noumenon) এবং বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য বলেছেন। আদর্শগুলো জগৎ-প্রপঞ্চ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্লেটোর দর্শন প্রকৃতপক্ষে, আদর্শ-বিজ্ঞান।"

"অনন্ত অদ্বন্দ্ব এবং আদর্শই যেন প্লেটোর আলয় ও বিচরণভূমি। সক্রেটিসের চিন্তাস্রোত মন্থর, দায়িত্ববিমুখ, সন্দেহ কিংবা অজ্ঞাতের আশঙ্কায় সঙ্কুচিত। প্লেটোর দর্শন উদ্দাম, তরঙ্গময়, সমস্যা ভঙ্গনে সমুৎসুক। কূপমণ্ডুকের ন্যায় তাঁর চিন্তাস্রোত হাট বাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জন্মভূমি বা শহরের চৌহদ্দির সাথে তাঁর জগত শেষ হয় নি। নিখিল বিশ্ব পরিভ্রমান্তর তিনি যেন সম্রাটের ন্যায় স্বীয় প্রাসাদে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, তাঁর দৃষ্টি যেন অনন্তশূন্যে নিবদ্ধ ছিল। রাজপথের অর্থহীন কোলাহল উপেক্ষা করে তিনি সজ্জন ও সুধী সমাজে স্থান লাভ করেছিলেন; স্বয়ং বীণাপাণি সে সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁর ভাষা অমৃতবর্ষিণী এবং উচ্চভাবময়ী।"

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের মধ্যে প্লেটোর গ্রন্থই সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে। গ্রন্থগুলোর কয়েকটা, যথা- 'পারমানাইডিস', 'সফিস্ট' 'ক্রেটাইলাস' এবং 'কিলেবুস' প্রভৃতির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন। 'এপকোজি'

ও 'ক্রিটো' সম্বন্ধে সন্দেহের কারন না থাকলেও সমালোচকগণ কর্তৃক এ দু'খানি প্লেটোকৃত নয় বলে স্থির হয়েছে। যে কয়টি গ্রন্থ সর্ববাদী সম্মতিক্রমে প্লেটোর লিখিত বলে গণ্য, তাদের পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হলঃ

(১) 'ফিড্রাস' (Phaedres) অর্থাৎ স্বর্থান্ধ তার্কিকদের বিচারের প্রতিবাদ। (২) 'প্রোটাগোরাস্' (Protagoras) বা সক্রেটিক সম্প্রদায় ধর্মমত। (৩) 'সিম্পোসিয়াম' (Symposium) অর্থাৎ ইন্দ্রিয় লালস যা থেকে আরম্ভ হয় সত্য, সুন্দর, ও মঙ্গলের বিচার। (৪) গার্জিয়াস (Gorgius) বা প্রকৃত জ্ঞানী। (৫) The Republic রিপাবলিক বা আদর্শ-বিচারপ্রণালী। (৬) টিমিয়াস (The timaeus) বা সৃষ্টি-তত্ত্ব। (৭) থীটেটাস (The Theatetus) বা জ্ঞান-আদর্শ। (৮) ফীডো (The Phaedo) বা আত্মার অবিনাশিত্ব। (৯) লস্ (The laws) বা রিপাবলিক সম্বন্ধে স্বীয় মতের আংশিক প্রত্যাহার। গ্রন্থগুলো সমস্তই কথোপকথনে (Dialoque) লিখিত। একটা গ্রন্থই সক্রেটিসকে প্রধান বক্তারূপে এবং তাঁর উক্তির সাথে গ্রন্থকর্তার চিন্তাশক্তির প্রকাশ দেখা যায়। কথোপকথন প্রণালী অবলম্বন করায় একাধারে তাঁর নিজ দর্শন মত এবং সক্রেটিক্ সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তি উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়।" প্লেটোর গ্রন্থে রূপক ও কাল্পনিক দেবতার প্রচুর উল্লেখ আছে। ফলে, তাঁর গ্রন্থগুলো কোন কোন স্থলে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। সমালোচকদের আক্রমণ এড়াবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে কবিত্বেরও আশ্রয় নেন। তাঁর দেবতাদের অনেকেই যে তাঁর কল্পনাপ্রসূত তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন এবং তাদের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে পাঠকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সেগুলোর রূপকে তাঁর নিজের মত প্রকাশ পেয়েছে। আসল কথা, কোন রূপক কোন উদ্দেশ্যে লিখিত, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। 'টিমিয়াস' এবং 'ফিডো' পাঠকালে কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যে, সে সম্বন্ধে পাঠকদের ধাঁধাঁ লাগে। তবে তাঁর রচনা যে সহজ স্বাভাবিক ভাষা যে চিন্তানুবর্তী, তাতে সন্দেহ নেই। 'টিমিয়াস' গ্রন্থে তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব রূপকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু রূপকের ধাঁধাঁ পড়ে মনে হয় যে তিনি সৃষ্টি তত্ত্বের কথাই বলছেন। আবার, সাধারণের বিশ্বাসানুসারে তিনি

যখন সৃষ্টিকর্তাকে শিল্পির সাথে তুলনা করেন, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, একেশ্বরবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল। 'ফিডো'ও কল্পনারূপকে ভরপুর। প্লেটো পাঠের পূর্বে একটা জিনিস স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে, পাঠক- যেন কল্পনা-রূপকের হেরফেরে পড়ে গ্রন্থকর্তার মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হন। আবার এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্লেটো কোন সিদ্ধ পুরুষ নন যে, তিনি একেবারে ভুল ভ্রান্তির অতীত ; তাঁর ধারণাশক্তি একেবারেই কল্পনাদুষ্ট হতে পারে না।

জ্ঞান-মতবাদ

প্লেটোর বিখ্যাত ভাববাদ (Theory of Ideas) তাঁর জ্ঞান-মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন জাগেঃ জ্ঞান কি ? সত্য বলতে আমরা কি বুঝি ? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর সাধারণতঃ দু'ভাবে দেওয়া যায়। প্রথমতঃ, সদর্থকভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ; নঞর্থকভাবে। প্লেটো নঞর্থক দিকটাই বেছে নেন। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে কোন্ বস্তু জ্ঞান নয় ও সত্য নয়, তাই আমাদের প্রথমে লক্ষ্য করা উচিত। প্লেটোর উদ্দেশ্যই হল সব ভ্রান্ত ও অসত্য মতবাদগুলোকে খণ্ডন করা। ভ্রান্ত ও অসত্য মতবাদ- গুলোকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে প্লেটো তাঁর এই পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান-মতবাদের সুস্পষ্ট ভূমিকা প্রস্তুত করেন। এই পরিপেক্ষিতে অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ জ্ঞানকে তিনি প্রথম আক্রমণ করেন। অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ জ্ঞান যে ভ্রান্ত ও মিথ্যে, তা প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করেন, তা হলঃ

(১) 'অনুভূতি যে জ্ঞান' প্রোটাগোরাস ও সফিস্টসদের এ মতবাদ প্লেটো সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। 'ব্যক্তিই বস্তুর মূল্য নির্ধারক' গর্জি- য়াসের এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না—'ব্যক্তিবিশেষের কাছে যা সত্য, তাই তাঁর কাছে সত্য ; 'ব্যক্তিবিশেষের নিকট যা মিথ্যে, তা-ই তাঁর নিকট মিথ্যে ; এ মেনে নিলে আমাদের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির উপর এর যথোপযুক্ত প্রয়োগ একেবারে মিথ্যে হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ ভুলগুলোই এর প্রমাণ। আগামী বৎসর আমি প্রধান বিচারপতি হব বলে আমার এখন মনে হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল যে, তখন আমি জেলখানায় আবদ্ধ। ব্যক্তিবিশেষের নিকট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা সত্য মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে কার্যতঃ তা প্রায়শঃই হয় না।

(২) ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সংবেদন প্রায়শঃ দু'বিরোধপূর্ণ ধারণার সৃষ্টি করে। একই বস্তু কাছ থেকে দেখলে বড় দেখায়, দূর থেকে আবার ছোট মনে হয়। আবার তুলনামূলকভাবে একই বস্তু হালকা ও ভারী মনে হয়। একই আলোকে একটা জিনিস সাদা, অন্যটিতে সবুজ, আবার অন্ধকারে এর কোন রূপই লক্ষ্য করা যায় না। এখন এগুলোর কোনটি সত্য? যুক্তি অবতারণা করে বলা যায়; জ্ঞান যদি অনুভূতি হয়, তবে এক অনুভূতিকে অপর অনুভূতির চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া আমাদের কোন অধিকার নেই; কারণ, সব অনুভূতিই সমান—সবই সত্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবং বাস্তবে আমরা তা স্বীকার করে নিতে পারি না।

(৩) 'ব্যক্তিই বস্তুর মূল্য নির্ধারক' এ মতবাদ সমস্ত শিক্ষা-দর্শন, আলোচনা ও প্রমাণাদিকে এক ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। ব্যক্তির অনুভূতি-সংবেদনই যদি প্রকৃত জ্ঞান হয়, তবে জগতের সবকিছুই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সব অনুভূতি একইভাবে সত্য হলে, একটা শিশুর অনুভূতিও তাঁর শিক্ষকের অনুভূতির মাঝে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। যেহেতু অনুভূতিতে পার্থক্য নেই; অতএব শিশুর শিক্ষক শিশুকে নতুন কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। দর্শন আলোচনা এবং প্রমাণাদির ব্যাপারেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। কোন কিছু নিয়ে যদি দু'টু লোকের মাঝে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তবে বুঝতে হবে তারা বহির্জগতে এক বাস্তব সত্যে বিশ্বাসী। তাদের উভয়ের যদি বিরোধপূর্ণ মতামত হয়, তবে দু'টু বিরোধ-মতই সত্য হতে পারে না; কারণ, তাহলে দ্বন্দ্বের কোন মানেই হয় না। ব্যক্তির অনুভূতি-সংবেদনই যদি সত্য হয়, তবে কোন দ্বন্দ্বই থাকতে

পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবে তা হয় না। ব্যক্তির অনুভূতি-সংবেদন বহির্জগতের সমগ্র বাস্তবতা ও শিক্ষাকে এক বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

(৪) অনুভূতি যদি সত্য হয় এবং ব্যক্তি-মানুষই বস্তুর মূল্য নির্ধারক হয়, তবে মানুষ একটা অনুভূতিশীল প্রাণী বৈ আর কিছু নয়। অন্যান্য জীবজন্তুও যেহেতু অনুভূতিপরায়ণ; অতএব নিম্নস্তরের একটা পশুও মানুষের মত বস্তুর মূল্য নির্ধারক। একটা পশু ও মানুষের মাঝে এ-ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই।

(৫) প্রোটাগোরাসের মতবাদ স্ব-বিরোধাত্মক। আমার নিকট যা সত্য, তা-ই যদি সত্য হয়, তবে যুক্তি অবতারণা করে বলা যায় যে, আমার নিকট এ-ই সত্য যে, প্রোটাগোরাসের মতবাদ মিথ্যে; তবে প্রোটাগোরাস নিজে স্বীকার করতে বাধ্য থাকলে তা মিথ্যে।

(৬) 'ব্যক্তি বস্তুর মূল্য নির্ধারক' এ মতবাদ সত্যের বস্তুগত সত্যকেই (objectivity of truth) অস্বীকার করে নেয় এবং সত্য-মিথ্যের পার্থক্যকে নিছক অর্থহীন ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

একই বস্তু একই সময়ে সত্যে-মিথ্যে উভয়ই। আমার জন্যে যা সত্য, অপরের নিকট তা-ই আবার মিথ্যে। একই জিনিসকে একই সময়ে সত্য-মিথ্যে বলে অভিহিত করা নিছক অর্থহীন। আসলে, সব অনুভূতিতে এমন একটা বিশেষত্ব আছে; যা ইন্দ্রিয়াভূক্ত নয়। 'কাগজ-খণ্ডটি সাদা' একথা বললে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়, ইহা কেবল ইন্দ্রিয়াভুক্ত এক বাক্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। 'কাগজ খণ্ডটি সাদা' বলার সাথে সাথে আমাদের প্রথমতঃ 'কাগজ খণ্ডটি'র কথা চিন্তা করতে হয়। তারপর আমরা তাকে একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করি। কাগজ খণ্ডটিকে আমরা কাগজ খণ্ডই বলি, অন্য কিছু বলি না। অন্যান্য কাগজখণ্ডের সাথে তুলনা করে আমরা এটাকে 'কাগজ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি। আমাদের চিন্তনের সাথে তখন দু'টু জিনিস বিশেষভাবে জড়িত থাকে। প্রথমতঃ, তুলনা (Comparison), দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীকরণ (classification)। আসলে বস্তু হল কতগুলো অনুভূতি বা সংবেদন গুণের সংমিশ্রণ। 'কাগজখণ্ডটি'কে

আমরা 'কাগজ খণ্ড' বলে জানতে পারি তখনই, যখন আমরা কাগজের সংবেদন গুণগুলোকে বুঝতে পারি। লক্ষ্য করার বিষয়, এ গুণগুলোর সাথে আমরা কিন্তু পূর্বেই পরিচিত। কেবল যে-সংবেদনের সাদৃশ্য গুণগুলোই আমরা বুঝতে পারি তা নয়, এর বৈশাদৃশ্য গুণগুলোও আমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। কাগজখণ্ডের অনুভূতিকে আমরা কাষ্ঠখণ্ডের সংবেদন থেকে আলাদা করতে শিখি এবং এ দু'টু সংবেদন আমাদের মনের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব বা কলহের সৃষ্টি করে না। কাগজ খণ্ডটিকে জানার অনেক পূর্বেই সংবেদনের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য গুণগুলোর সাথে পরিচিত থাকতে হয়। লক্ষ্য করার বিষয় যে, সংবেদনের এ সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য ধারণা আমাদের ইন্দ্রিয়াভুক্ত কোন কিছু নয়, এ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়বহির্ভূত এক ধারণা। মানুষের বিচার-বুদ্ধি প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানই এ ধারণাটুকুকে বস্তুতে রূপান্তরিত করে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি জ্ঞানের উর্ধ্বে মানুষের প্রজ্ঞা এখানে বস্তু-পরিচিতিতে এক প্রধান ভূমিকা পালন করে। জ্ঞান বলতে প্রকৃতপক্ষে, প্রোটাগোরাসের ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানকে বুঝায় না। জ্ঞান বলতে ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত প্রজ্ঞারও এক বিশেষ ভূমিকা রয়ে গেছে। অতি নগণ্য ও সামান্য বস্তুতেও এ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এবারে জ্ঞানই ধারণা (opinion) ; এ মতবাদের বিরুদ্ধে প্লেটো তাঁর দ্বিতীয় আক্রমণ চালান। ভুল ধারণা যে প্রকৃত জ্ঞান নয়, তা সর্বজন স্বীকৃত। সঠিক (right opinion) ধারণাগুলোকেও ঠিক প্রকৃত জ্ঞান বলা চলে না। যদি বলি, 'কাল বৃষ্টি হবে,' এবং বাস্তবিক কাল বৃষ্টিই হয়, তবে আমাদের এ অনুমানটিকে (gners-work) ঠিক জ্ঞান বলা চলে না। এটা একটা সঠিক ধারণা। সঠিক ধারণা অনুমানের উপর নির্ভর না করে ভুল বুঝাবুঝি থেকেও সৃষ্টি হতে পারে। আমরা প্রায়শঃই অনেক কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, যদিও আমরা এর যথাযথ কারণ দর্শাতে পারি না। আমাদের এ অনুমান সত্য হতে পারে, কিন্তু তাই বলে প্লেটোর মতে এটা 'জ্ঞান' নয়। এটা হল একটা সঠিক ধারণা। জ্ঞান বলতে শুধুমাত্র বস্তুকে জানলেই চলবে না

কেন, এবং এর কারণ কি, তা-ও জানতে হবে। প্রজ্ঞা দিয়ে বস্তুকে পুরোপুরি জানার নামই জ্ঞান। জ্ঞান বলতে প্রজ্ঞা-শক্তিকেই বুঝায়—কোন ধারণাকে নয়। ধারণা সত্য-মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু জ্ঞান সব সময়ই সত্য—এ মিথ্যা হতে পারে না। মিথ্যা ও অসত্য মতবাদ-গুলোকে এভাবে খণ্ডন করে প্লেটো এবার তাঁর দর্শনের সদর্থক বা উজ্জ্বল দিকটা আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, জ্ঞান যদি সংবেদন বা অনুভূতি কিংবা ধারণা না হয়, তবে জ্ঞান কি, এবং জ্ঞান বলতে আমরা কি-ইবা বুঝি, এ প্রশ্নের জওয়াবে প্লেটো সক্রেটিস মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেন। সক্রেটিসের মত তিনিও বলেন যে, বস্তুর 'সার্বিক-ধারণা' হল জ্ঞান। সংজ্ঞা যেমন নির্ধারিত ও স্থায়ী, সার্বিক-ধারণাও তেমনি নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়। 'সার্বিক-ধারণা' আমাদেরকে বাস্তব সত্যের সন্ধান দেয়। জ্ঞান প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ, প্রজ্ঞা 'সার্বিক-ধারণা-র মৌলিক শক্তি বা আধার। প্লেটো এখানে সক্রেটিসের 'সার্বিক-ধারণার' মতবাদকে স্বীকার করে নিলেও আমাদেরকে এমন এক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের (Metaphysics) সন্ধান দেন, যা সক্রেটিস-দর্শন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন। এ দর্শন তাঁর স্বকীয় ও নিজস্ব মৌলিক চিন্তা। সক্রেটিসের জ্ঞান-মতবাদকে তিনি মেনে নেন সত্যি; কিন্তু তা দিয়ে তিনি তাঁর ভুবনবিখ্যাত মৌলিক 'ভাব-জগত' সৃষ্টি করেন। প্লেটোর ভাববাদ সক্রেটিসের 'সার্বিক-ধারণা'র বাস্তবতা নিয়েই আলোচনা করে। 'সার্বিক-ধারণা' যে মনের কেবলমাত্র একটা ধারণা নয়, মন-বহির্ভূত এর যে এক নিরপেক্ষ স্বাধীন স্বকীয় সত্তা আছে, এটাই প্লেটোর মূল বক্তব্য এবং তাঁর সমগ্র দর্শনের সারবস্তু।

কিন্তু প্রশ্ন : প্লেটো এ মতবাদে কেমন করে পৌঁছলেন? আমাদের ধারণার সঙ্গে যদি বাস্তব সত্তার মিল থাকে, তবে তা-ই সত্য বলে প্লেটো মনে করেন। যদি একটা গোলাপ ফুলের ধারণা করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবে সে গোলাপ ফুলের অস্তিত্ব থাকে, তবে গোলাপ ফুলের ধারণা সত্য। আর যদি বাস্তবে সে গোলাপ

ফুল না থাকে, তবে গোলাপ ফুল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মিথ্যে। অর্থাৎ সত্য হল আমার মনের কল্পনা, যা মন-বহির্ভূত বিষয়গত কিছুর একটা নকল বা প্রতিচ্ছবি। আর মিথ্যে হল সেই ধারণা, যার নকলরূপ বাস্তবে নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'সার্বিক-ধারণা' তখনই সত্য, যখন তা মন-বহির্ভূত একটা যথার্থ বিষয়গত সত্তাকে নির্দেশ করে। 'সার্বিক-ধারণার' অবস্থিতির জন্যে মন-বহির্ভূত এক বাস্তব 'সার্বিক ধারণার' প্রয়োজন, যার প্রতিচ্ছবি হবে আমাদের 'সার্বিক-ধারণা'। প্লেটো বলেন, 'সার্বিক-ধারণা' সত্য ; কারণ, ভাবজগতে এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

সমস্যাটিকে ভিন্নভাবে একটু আলোচনা করা যাক। সৌন্দর্য কি? যদি বলা হয়, তা'হলে সাধারণতঃ আমরা একটা সুন্দর ফুল বা যে-কোন বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে বলি, ফুলটি সুন্দর। কিন্তু এ বললে প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জিজ্ঞসার কোন উত্তর দেওয়া হয় না। এ ফুল বা ঐ-ফুল সুন্দর, এসব সুন্দর বস্তু সম্বন্ধে আসলে আমরা কিছু জান্তে চাই না। আমাদের প্রশ্ন : সৌন্দর্য কি? যে-সৌন্দর্য সুন্দর বস্তু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হয়তো বলা যেতে পারে, সুন্দর বস্তুকে বাদ দিয়ে কোন সৌন্দর্য হতে পারে না। কিন্তু তা ঠিক নয়। আসলে সৌন্দর্য আমাদের মনের 'সার্বিক-ধারণা'। সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা আছে, যে ধারণার সাথে আমরা সুন্দর বস্তুগুলোর তুলনা করে সুন্দর বস্তুগুলোর সঙ্গে পরিচিত হই। এ ধারণা হয় মনের বাইরের কোন এক সত্য, কিংবা আমাদের মনের একটা বিশেষ কল্পনা। সৌন্দর্য আমাদের মনের বিশেষ কল্পনা হতে পারে না ; কারণ, ব্যক্তি-বিশেষের কোন কল্পনা বা ধারণা বস্তুর মূল্য নিরূপণের মানদণ্ড হতে পারে না। যদি হয়, তবে আমরা সফিস্টস্‌দের বিখ্যাত উক্তি 'ব্যক্তি-মানুষই বস্তু-মূল্য নির্ধারক', এ জটিল প্যাঁকে জড়িয়ে পড়ি। সুতরাং, এখন উপায় শুধু মন-বহির্ভূত এক 'সার্বিক-সৌন্দর্যে' বিশ্বাস করা। এ 'সার্বিক সৌন্দর্য' আমাদের মনের বাইরে ভাবজগতে অবস্থান করে, যা সুন্দর বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে যা বলা হল, 'ন্যায়পরায়ণতা', 'মঙ্গল' এবং অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। ন্যায় ও মঙ্গল কাজ বহু ; কিন্তু

'ন্যায়পরায়ণতা' এবং 'মঙ্গল' একটাই। ন্যায়পরায়ণতা ও মঙ্গলের সত্যিকার অবস্থিতি আছে, যা ন্যায় ও মঙ্গল কাজগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের 'সার্বিক-ন্যায়' ও 'সার্বিক-মঙ্গল'। সত্যিকারের অবস্থানরত 'ন্যায়পরায়ণতা' ও 'মঙ্গলের' সঠিক প্রতিচ্ছবি বা নকলরূপ। 'সৌন্দর্য', 'ন্যায়পরায়ণতা' ও 'মঙ্গল' সবই, 'সার্বিক ধারণা'। প্লেটোর কথা হল, 'সার্বিক-ধারণা'গুলো সব সত্য। কারন, এদের বিষয়গত-সত্তা আছে। এ বস্তুগত সত্তাগুলো মন-বহির্ভূত ভাবজগতে বিরাজ করে। প্লেটোর ভাবজগত থেকেই পৃথিবীর সব কিছুর উৎপত্তি।

এবারে প্লেটোর ভাবের বা আদর্শের বৈশিষ্ট্য কি, লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে, ভাব বা আদর্শগুলো বস্তুজাত দ্রব্যবিশেষ। বস্তু বলতে স্বনির্ভর বস্তুকে বুঝায়। বস্তুর সত্তা অন্য কোন বস্তু থেকে আগত নয়, এটা স্ব-নির্ভর ও স্বপ্রতিষ্ঠিত। যদিও এটা নিজে অন্য কোন সত্তা থেকে আগত নয়, তথাপি এ অন্যসব সত্তার মূল বা আধার। এ এক চরম সত্তা, যা থেকে সব কিছুর উদ্ভব, অথচ নিজে স্বনির্ভর। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা ... 'ভগবান জগত সৃষ্টি করেছেন', তিনি এক চরম সত্তা যা থেকে পৃথিবীর সব কিছুর উদ্ভব, অথচ তিনি নিজে কোন কিছু থেকে উদ্ভব নন; তিনি স্বনির্ভর। এখানে ভগবানকে বস্তুজাত বা দ্রব্যবিশেষ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, সব ভাবগুলোকে বস্তুজাত বা দ্রব্যবিশেষ। ভাবগুলো চরম ও মৌলিক-সত্তা। এ ভাবগুলো থেকেই জগতের উদ্ভব। দ্বিতীয়তঃ, এ-ভাবগুলো সার্বিক ও সার্বজনীন। ভাব কোন ব্যক্তি বিশেষের জিনিস নয়। ঘোড়ার ভাব বলতে কোন বিশেষ ঘোড়াকে বুঝায় না। ঘোড়া বলতে, ঘোড়ার সার্বিক-ধারণা বা সার্বজনীন রূপকেই বুঝায়। তৃতীয়তঃ, ভাব কোন দ্রব্য বা বস্তু নয়। ভাব হল চিন্তন। 'সার্বজনীন' বা 'সার্বিক ঘোড়া' বলতে প্রকৃতপক্ষে, কিছু নেই। ভাব আবার কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ভগবানের চিন্তন নয়। ভাব বলতে, মন-বহির্ভূত স্বনির্ভর বস্তুগত ভাবকেই বুঝায়। (They are cbjective Ideas, which have their realif on their own found independents of an ᶅ mind) চতুর্থতঃ, প্রত্যেক ভাবই

এক একটা একক। এ বহুর মাঝে এক। ব্যক্তি-মানুষ বহু, কিন্তু মানব-ভাব এক। একই শ্রেণীর কোন বস্তুর একটার বেশী ভাব থাকতে পারে না। ধরা যাক, ন্যায়ের যদি বহুভাব থাকত, তবে সে বহু-ভাব থেকে আবার একটা সাধারণ গুণ বেছে নিয়ে একটা 'একক ভাব' তৈরী করা হত। পঞ্চমতঃ, ভাবগুলো অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়। সুন্দর সুন্দর বস্তুগুলো একবার সৃষ্টি হচ্ছে, আবার কালের বিবর্তনে বিলীন হচ্ছে; কিন্তু 'সৌন্দর্য' বা 'সুন্দর-ভাবের' কো সৃষ্টি বা লয় কোনটাই হচ্ছে না। 'সুন্দর-ভাবের' প্রারম্ভ বা সমাপ্তি কোনটাই নেই—এ অনন্ত, অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়। পৃথিবীর সব মানুষ ধ্বংস হয়ে গেলেও 'মানব-ভাব' চিরকাল একই থাকবে—কোন জন্ম-মৃত্যু-লয় এটাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ষষ্ঠতঃ; ভাবগুলো বস্তুগুণের সারাংশ (essence of things)। মানুষের মাঝে যে-সকল গুণ সাধারণভাবে বিদ্যমান, তাকে নিয়েই 'মানব-আদর্শ' গঠিত। আদর্শ বলতে বস্তুর সমগ্র গুণকে না বুঝায়ে সাধারণভাবে বিদ্যমান বস্তুর বিশেষ গুণগুলোকেই বুঝায়। সপ্তমতঃ, প্রত্যেকটা আদর্শই পূর্ণাঙ্গ (perfect) এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। আদর্শের পূর্ণাঙ্গতাই এর সত্তা। পূর্ণাঙ্গ আর আদর্শ সমার্থক। পূর্ণাঙ্গমানুষ বলতে সার্বজনীন ও সার্বিক 'মানব-প্রতীক'কেই বুঝায় (universal man type) বা মানব-ভাবকেই বুঝায়। সব ব্যক্তি-মানুষ অপূর্ণ ও অসত্য; কারণ, সব ব্যক্তি-মানুষ 'মানব-ভাব' থেকে কম-বেশী স্থানচ্যুত। অষ্টমতঃ, ভাবগুলো স্থান-কাল বহির্ভূত। ভাবগুলো যে স্থান-বহির্ভূত, তা সুস্পষ্ট। ভাবগুলো যদি কোন স্থানে অবস্থান করত, তবে আমরা তা দেখতে পারতাম। ভাবগুলো কালেরও বহির্ভূত; কারণ, তারা অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন। ভাবগুলো কালহীন। 'টিমিয়াসে' অনন্ত ও অনির্দিষ্ট কালের মাঝে একটা পার্থক্য করা হয়েছে। অনির্দিষ্ট কাল (Infinite time) অনন্তের (eternity) নকল প্রতিলিপি। নবমতঃ, ভাবগুলো প্রজ্ঞেয় (s εt'enal)। প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধি দিয়েই ভাবগুলোকে জানা সম্ভব। একমাত্র প্রজ্ঞার দ্বারাই আমরা আদর্শসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারি; কোন সজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান

দ্বারা নয়। (Intuition & mystiecstasy ।

জীবনের শেষের দিকে প্লেটো তাঁর ভাবগুলোকে পীথাগোরীয়ানদের সংখ্যাবাদের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সনাক্ত করেন। প্লেটোর (Dialopre) কথোপকথনে এর কোন উল্লেখ না থাকলেও এরিস্টোটলের নিকট থেকে আমরা তা জানতে পারি। ভাবকে সংখ্যাবাদের সাথে সনাক্ত করায় মনে হয় প্লেটো যেন তাঁর নির্মিত ভাব-সৌধের একস্তর নেমে পড়েছেন। এখানে পীথাগোরীয়ানদের 'গাণিতিক রহস্যবাদের' প্রভাব প্লেটোর উপর খুব ক্ষতিকর।

প্লেটোর সমগ্র ভাবদর্শন থেকে শুধু একটা কথাই প্রতিয়মান হয় যে, মানব-অভিজ্ঞতার দু'টো দিক রয়েছে। এর একটি ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং অপরটি প্রজ্ঞা (semse perception dreason) । ইন্দ্রিয়ানুভূতির জন্যে ইন্দ্রিয়জগত, প্রজ্ঞার জন্যে ভাব-জগত। ভাব-জগত চরম ও পরম সত্য। ইন্দ্রিয় বা সংবেদন-জগত 'ভাব-জগতের' ঠিক উল্টো। ইন্দ্রিয় ও বস্তুজাত দ্রব্যগুলো ভাবে অংশ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইন্দ্রিয়জ বস্তুগুলো মিথ্যে ও অসত্য থাকে। ভাবে অংশ গ্রহণ করলেই তারা বাস্তব ও সত্য হয়। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় বা সংবেদিত দ্রব্যগুলো 'ভাব' ও 'সত্তা' (being) উভয়ের মাঝেই অংশ গ্রহণ করে। তারা 'সত্তা' ও 'অসত্তা' উভয়ের মাঝ-পথ (half-way) । তারা আধেক সত্য। ভাবগুলো সার্বিক। ইন্দ্রিয় দ্রব্যবিশেষ (particular) । ভাব এক। ইন্দ্রীয়দ্রব্য বহু। ভাবগুলো স্থান-কাল বহির্ভূত। ইন্দ্রিয় দ্রব্যগুলো স্থান-কাল অন্তর্গত। ভাব অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়-দ্রব্যগুলো চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল।

বস্তুজাতদ্রব্যগুলো চঞ্চল পরিবর্তনশীল ; এ ধারণা প্লেটো হিরাক্লিটাসের চরম জন্মব্যাপার থেকেই গ্রহণ করেন (absolute becoming) । তিনি বস্তুজাতদ্রব্যগুলোর সাথে ইন্দ্রিয় জগতের সনাক্ত করেন। বস্তুজাত-দ্রব্যগুলো নিত্য পরিবর্তনশীল। ভাব সব সময়ই 'হয়' (is) অবস্থায় থাকে, এটার কখনও জন্ম ঘটে না (never becomes) । কিন্তু ইন্দ্রিয়জ দ্রব্যের সব সময় জন্ম-ঘটে (Things of semse always becomes

কখনও 'হয়' অবস্থা থাকে না (never is)। এই মতকে অবলম্বন করেই প্লেটো বলেন, ইন্দ্রিয়-জগত থেকে কোন জ্ঞান সম্ভব নয় ; কারণ, যা নিত্য পরিবর্তনশীল, তার থেকে জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। জ্ঞান তখনই সম্ভব, যখন জ্ঞানের বিষয়বস্তু স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে। ভাব স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ; সুতরাং ভাব-জ্ঞানই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়জগতের জ্ঞানকে অসম্ভব বলা আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা একই কথা। কিন্তু, অন্ততঃপক্ষে বস্তুর আপেক্ষিক স্থায়ীত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্লেটো যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করেন, তা যথার্থ নয়। 'ইন্দ্রিয়' বা 'সংবেদন' বলতে প্লেটো কেবল প্রজ্ঞাশূন্য এক বিশুদ্ধ অনুভূতিকে (Pure Senvibilty) বুঝাচ্ছেন। কিন্তু এরূপ বিশুদ্ধ অনুভূতি কোন বিজ্ঞানই সমর্থন করেন না। বিজ্ঞানের দ্রব্যগুলো বিচার-বুদ্ধিসাপেক্ষ অনুভূতিবিশেষ।

এখন প্রশ্ন : ভাবের সাথে ইন্দ্রিয়বস্তুর কি সম্পর্ক ? ভাব ইন্দ্রিয়বস্তুর কারণ। ভাব চরম সত্য। কোন বস্তু বা দ্রব্যের সত্তা ভাব থেকেই উদ্ভব। বস্তু ভাবের ছায়া, নকল বা প্রতিলিপি। ভাবের সাথে বস্তুর সুসংগত সাদৃশ্য থাকলেই বস্তুর সত্যতা। ভাব থেকে বস্তুর অমিল বা বৈশাদৃশ্য দেখা দিলে এটা অসত্য ও মিথ্যে। প্লেটোর মতে, বস্তু ভাবের অত্যন্ত ক্ষীণ প্রতিলিপি। প্লেটো বলেন, বস্তু ভাবে অংশ গ্রহণ করে (Participale)। অংশ গ্রহণ কথাটির উপর প্লেটো বেশ গুরুত্ব আরোপ করেন। শুভ্রবস্তুগুলো 'শুভ্রভাবে' অংশ গ্রহণ করে। সুন্দর বস্তু 'সুন্দর-ভাবে' অংশ গ্রহণ করে। সৌন্দর্য নিজেই সুন্দর বস্তুর কারণ ও তার ব্যাখ্যা। অন্যান্য ভাবগুলো সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা চলে। ভাবগুলো লোকোত্তর বা বিশ্বাতীত (Transcendent) এবং অন্তর্লীন (immanent) উভয়ই। ভাবগুলো যখন ইন্দ্রিয়দ্রব্যে অবস্থান করে, তখন এরা অন্তর্লীন। ভাব যখন আবার ইন্দ্রিয়দ্রব্যের বাইরে আপন সত্তা বিরাজ করে, তখন এরা বিশ্বাতীত।

কোন্ শ্রেণীর ভাব বিদ্যমান ? 'ন্যায়পরায়ণতা', 'মঙ্গল' ও 'সৌন্দর্য' (justice, good & the Idea of Beauty) ; ভাব একত্রে মিলে

'নৈতিক-ভাব' (Idea of Morality) গড়ে তোলে। তেমনি, গরু-ঘোড়া, ভেড়া-ছাগল, গাছ-পালা, নদী-নালা প্রভৃতি ভাব মিলে 'দেহী-ভাব', (Ideas of corposeal things) সৃষ্টি করে। গুরুত্ব (heaviness) ও মধুরতা মিলে গুণবাচক ভাব তৈরী করে। কেবল যে দেহধারী বস্তরই ভাব আছে, তা নয়। নির্মিত দ্রব্যেরও ভাব রয়েছে। যেমন, কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি। শুধু তা-ই নয়। 'কুৎসিত-ভাব' (Ideal ugliness), অন্যায় অবিচার আদর্শও রয়েছে (Ideal Injustice)। প্লেটোর পারমানাইডিসের হীন ও ঘৃণিত ভাবের কথারও উল্লেখ আছে। সক্রেটিস হীন-ঘৃণিত ভাবের কথা স্বীকার করেন না। দর্শনের সর্বোচ্চ শিখরে পোঁছে সক্রেটিস এ-সকল বস্তুকে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত মনে করেন নি। সত্য, শিব, সুন্দর ভাব. যেমন তাদের স্বীয় জগতে এক পরিপূর্ণ আদর্শ বা ভাব ঘৃণিত দ্রব্যের ভাবগুলোও তদ্রূপ। মোটকথা, প্লেটোর মতে, কোন শ্রেণীর বস্তু থেকে 'সার্বিক-ধারণা' গঠন করতে পারলেই তার একটা ভাব থাকবে। এবার সেই বস্তু উত্তমই হোক, বা মন্দই হোক। এখানে বস্তুর ভাল-মন্দ কথাটি বড় নয়; বড় হল বস্তুর সার্বিক বা সামান্য ধারণা সৃষ্টি করা। যে-কোন দ্রব্যের সামান্য ধারণা করতে পারলেই তার একটা ভাব থাকবে।

'এক' ও 'বহু'র (one & many) মধ্যে সম্পর্কের কথা নিয়েও প্লেটো আলোচনা করেন। 'এক' কেবল 'একই' নয়; কারণ, প্রত্যেক 'এক' বা 'একক' (unit) স্বভাবতঃই 'বহু'। 'বহু' ও 'এক' পারস্পরিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। একে অপরের মধ্যে অন্তর্নিহিত। একটাকে ছেড়ে অন্য-টাকে কল্পনা করা যায় না। একটা শূন্য 'একের' কল্পনা অযৌক্তিক। যে. 'একে'র মধ্যে কোন 'বহু' অন্তর্নিহিত নেই, সে এক হিসাবে অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ। কারণ, 'একে'র সংজ্ঞা দিতে গেলেই বলতে হয়, এক হল সেই, যা 'বহু' নয়। 'বহু' হল সেই, যা 'এক' নয়। 'বহু'র পটভূমিকা ব্যতিরেকে এক অচিন্ত্যনীয়। অনুরূপে 'একে'র পটভূমিকা ব্যতিরেকে 'বহু'ও অচিন্ত্যনীয়; কারণ, 'বহু' হল কতগুলো বহু একের

সমষ্টি। সুতরাং পরমসত্তা বস্তু নিরপেক্ষ 'এক' বা 'বহু' হতে পারে না। পরমসত্তা বহুর মধ্যে এক। অনুরূপে, 'সত্তা' ও 'অসত্তা' পারস্পরিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। সকল 'সত্তার' মধ্যেই 'অসত্তা' অন্তর্নিহিত। ভাব 'বহু'; কারণ, আমাদের অনেক ভাব রয়েছে। পুনরায়, ভাব আবার 'এক'; কারণ, ভাবগুলো পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন একক সত্তা নয়, এরা পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত। প্রত্যেক বিশেষভাবই এক সংঘবদ্ধভাব পদ্ধতির সদস্য বিশেষ। বস্তুতঃ, ভাবের এক সুসংবদ্ধ সরকার পদ্ধতি রয়েছে। এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাধারণভাবে বিগুমান কতকগুলো বিশেষ গুণ নিয়ে যেমন এক 'ভাব' তৈরী হয়, তেমনি কতকগুলো নিম্নতর ভাব (Lower Ideas) থেকে তাদের মধ্যে সাধারণ গুণের অংশটুকু নিয়ে আরেক উচ্চতর ভাবের স্থষ্টি হয়। রক্তবর্ণ, শুভ্র ও নীল বর্ণের নিম্ন-ভাবগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে বিগুমান সাধারণ গুণ নিয়ে উচ্চতর এক 'বর্ণ-ভাবের' স্থষ্টি হয়। এ-ভাবে, ভাবগুলো ক্রমে এক সংঘটিত পিরামিডের স্থষ্টি করে। এ পিরামিডের সর্বোচ্চ শিখরে থাকে উচ্চতম এক 'ভাব'। এ উচ্চতম ভাব সমগ্র বিশেষভাবকে পরিচালনা করেছে। এ উচ্চতম-ভাব হল সর্বশেষ ভাব। এ উচ্চতম ভাব বস্তুর চরম সত্তা। এ ভাবের উপর সমগ্র ভাব, এমন কি সমগ্র বিশ্বব্রমাণ্ড পর্যন্ত ভিত্তি করে আছে। এ সর্বশেষ ও উচ্চতম ভাবকে প্লেটো 'মঙ্গল-ভাব' (Idea of the good) নামে আখ্যায়িত করেন। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, ভাব বহু। কিন্তু এখানে দেখছি, ভাব প্রকৃতপক্ষেই এক। কারণ, 'মঙ্গল-ভাব' চরম ভাব। এককেই এ চরম ভাবের প্রকাশ। ঠিক অনুরূপে, পৃথক পৃথক ভাবগুলো আবার বহুর মধ্যে এক। আমরা যদি অন্যান্য ভাবগুলো থেকে 'একক' ভাবের আপেক্ষিক (Relative) সম্বন্ধকে অবহেলা করি, তবে সেই ভাব তার নিজ দিক থেকে এক। আবার আপেক্ষিক সম্বন্ধকে স্বীকার করে নিলে সেই ভাবই আবার বহু। প্রত্যেক ভাবই একটা পৃথক সত্তাবিশেষ। প্রত্যেক সত্তার মধ্যেই আবার অসত্তা অন্তর্নিহিত। কারণ, প্রত্যেক ভাবই অন্য ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত; কিন্তু অপরের সঙ্গে নয় (Each Idea Combines with Some Ideas but

not with thers)। 'দেহধারী-ভাব', 'গতি ও বিরাম' উভয় (rest & motion) ভাবের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু, 'গতি ও বিরাম-ভাব' পারস্পরিক সংযুক্ত নয়। 'বিরাম ভাব' তার নিজ দিক থেকে একটা সত্তা বিশেষ। কিন্তু 'গতির, দিক থেকে বিচার করলে বিরাম অসত্তাবিশেষ। সব ভাবই তাদের নিজ দিক থেকে সত্তাবিশেষ ; কিন্তু এরা যখন অপর ভাবে সংযুক্ত হয় না, তখন আবার অসত্তা। ভাব নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সত্তা; কিন্তু, অপ্রাসংগিক অন্য ভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ যাদের সঙ্গে তারা যুক্ত নয়, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা আবার অসত্তা।

এ পদ্ধতিতে গড়ে উঠে 'ভাববিজ্ঞান' (Science of Ideas) বা ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ (Dialectics)। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ অনেক সময়ই ভাববাদের সমর্থক (Identical)। তবে ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ শব্দটি সংকীর্ণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সংকীর্ণ অর্থে, ভাবগুলোকে সঠিকভাবে সংযুক্তি ও বিযুক্তিকরণ (joining & disjoining) হল ডায়ালেক্‌টিক্‌স্। সমস্ত ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধ জ্ঞান নিরূপণই হল ডায়ালেক্‌টিক্‌স্।

এ সম্বন্ধ জ্ঞান নিরূপণ প্লেটোর মতে, দর্শনের প্রধান সমস্যা। সব ভাবকে নিরপেক্ষভাবে জানা ও তাদের সঙ্গে অন্য ভাবের সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ সত্যি এক কঠিন কাজ। তবে, আমরা তা দু'ভাবে করতে পারি। প্রথমতঃ, সার্বিক-ধারণা গঠন করে ভাবগুলোকে আলাদা রূপে জানা। দ্বিতীয়তঃ, ভাবগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভে। পারস্পরিক সম্বন্ধ জ্ঞান আবার দু'উপায়ে হতে পারে। প্রথমতঃ, শ্রেণীকরণে (Classification)। দ্বিতীয়তঃ, বিভক্তিকরণে (Division)। ক্রমে নিম্নতর ভাব থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর ভাবের দিকে গমন করলে হয় শ্রেণীকরণ পদ্ধতি। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চতর ভাব থেকে ক্রমশঃ নিয়ে নামতে থাকলে হয় বিভক্তিকরণ পদ্ধতি। শ্রেণীকরণের গতি নিম্ন থেকে উচ্চে বিভক্তি করণের গতি উচ্চ থেকে নিম্নে। 'রক্তিমতা', 'শুভ্রতা' ও 'নীল' প্রভৃতি নিম্ন ভাবগুলো নিয়ে যখন আমরা উচ্চতর 'বর্ণ ভাব' তৈরী করি, তখন তা শ্রেণীকরণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আবার যখন উচ্চতর 'বর্ণ' ভাব থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে নিম্নভাব রক্তিম 'শুভ্র, 'নীল' পৌঁছি তখন

তা বিভক্তিকরণের মাধ্যমেই হয়। প্লেটো বিভক্তিকরণ করতে গিয়ে প্রায়শঃই দ্বি-কোটিক (Dichotomy) বিভাগ ব্যবহার করেন। 'বর্ণকে' আমরা লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রং-এ প্রত্যক্ষভাবে বিভক্ত করতে পারি।' আবার, বর্ণকে আমরা দু'টু শাখা শ্রেণীতে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন—বর্ণকে, প্রথমে, 'লাল' ও 'না-লাল ; না লালকে, 'সাদা, ও 'না-সাদা ; 'না-সাদাকে ; নীল ও 'না-নীল, ইত্যাদি ইত্যাদিতে বিভক্ত করতে পারি। পদের এরূপ বিভক্তিকরণকেই দ্বিকোটিক বলা হয়। দ্বিকোটিক যদিও কঠিন ও কষ্টকর, তথাপি, ইহা পূর্বোক্ত বিভক্তিকরণের চেয়ে নির্ভুল ও বেশী ব্যাপক। এ কারণেই প্লেটো দ্বিকোটিক বিভাগকে অধিক পছন্দ করেন।

'যুক্তি-কৌশল' বিশ্লেষণে প্লেটোর খুব বেশী একটা কৃতিত্ব নেই। কারণ, তিনি 'যুক্তি-কৌশলে'র কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ দিতে সক্ষম হন নি। তার 'যুক্তি কৌশলে'র আরেকটি বিরাট ত্রুটি রয়েছে। তিনি বলেন, 'মঙ্গল-ভাবই চরম ভাব'। পরম সত্তা হিসেবে এ অন্যসব ভাবের মূল ও মূলাধার। সুতরাং এ পরমসত্তা থেকে অন্যসব ভাবগুলো উদ্ভব করাই তার কর্তব্য ছিল ; কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং তিনি অনেকটা যুক্তিহীনভাবেই বলতে থাকেন যে, 'মঙ্গল-ভাব' 'চরম-ভাব' এটাকে অন্য ভাবের সাথে যোগ করার মত তিনি কিছু দেখতে পান-না। তাঁর এ উক্তি তাঁর পদ্ধতির এক সহজ-সরল তার্কিক-সিদ্ধান্তেরই পরিণাম। কারণ, প্রত্যেক ভাবই নিজে নিজে পূর্ণাঙ্গ। পূর্ণাঙ্গতা সব ভাবগুলোতে সাধারণভাবে বিদ্যমান। সুতরাং পূর্ণাঙ্গতা চরম ভাব। চরম ভাব বা 'মঙ্গল-ভাব' নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ। আবার অপরপক্ষে, সব ভাবই সহজ দ্রব্যজাতবিশেষ (Substance)। সুতরাং 'চরম-ভাব' ও দ্রব্যজাত (Idea of substance)। যুক্তিগুলো অনেকটা হেঁয়ালীর মত শুনায়। আসলে প্লেটোর ধারণাগুলো খুব দুর্বোধ্য। মোটকথা 'মঙ্গল-ভাব' (Idea of good) হল সর্বোচ্চ ভাব। এই হল প্লেটোর মোটামুটি বক্তব্য।

প্লেটোর 'মঙ্গল-ভাব' স্বভাবতঃই আমাদের উদ্দেশ্যবাদেরকে (Teleology)

দিকে টেনে নেয়। প্রশ্ন জাগে : পরম মঙ্গল উদ্দেশ্যমূলক কি না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্লেটোর মতবাদ আগা-গোড়া সম্পূর্ণরূপেই একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত। তাঁর নিম্নতর ভাব ও চরম ভাবের আলোচনা করলেই আমরা তা দেখতে পাই। প্রত্যেক ভাব তাঁর নিজ দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। আবার প্রত্যেক ভাবই স্বীয়জগতের বস্তুবিশেষের উৎপত্তির কারণ। প্লেটোর 'প্রজাতন্ত্রে'ও (Republic) তাঁর উদ্দেশ্যবাদের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছ। প্লেটো যে-রাষ্ট্রের বর্ণনা আমাদেরকে দেন, তা স্বভাবতঃই আমাদের নিকট তাঁর খেয়ালী মনের কল্পনার রাষ্ট্র বলেই মনে হয়। কিন্তু, আসলে তা নয়। 'ভাব-রাজ্য' (Idea State) অংশ গ্রহণ না করা পর্যন্ত এথেন্স বা স্পার্টা বা অন্যসব রাষ্ট্র অবাস্তব। 'ভাবরাজ্য' হল প্রকৃত সত্তা। এ ভাবরাজ্য থেকেই সকল বাস্তব রাষ্ট্রের উৎপত্তি। তাদের অস্তিত্ব ভাবরাজ্য দ্বারাই ব্যাখ্যা করা চলে। আমরা এখনও 'আদর্শ রাষ্ট্রে' (Ideal State) পৌঁছুতে পারি নি বলে আমাদের বাস্তব রাষ্ট্রগুলো আদর্শ-রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্লেটোর এ কল্পনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ধারণা মূলতঃই উদ্দেশ্যমূলক। রাষ্ট্রের সঠিক বিশ্লেষণ তাঁর উদ্দেশ্য লক্ষ্যবস্তুতে বা পূর্ণাঙ্গতায় পাওয়া যাবে। উদ্দেশ্য (End) সম্ভাব্যরূপে প্রারম্ভেই অন্তর্নিহিত থাকে (The end must be in the beginning potentially)। নতুবা এটার আরম্ভ হতে পারে না। অন্যান্য সকল বস্তুর ব্যাপারে এই একই কথা। প্লেটোর উদ্দেশ্যবাদ পরম মঙ্গলে গিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। এই পরম মঙ্গলে অন্যসব ভাবের সর্বশেষ ব্যাখ্যা। এমনকি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশেষ বিশ্লেষণ। এ পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে কেন্দ্র করেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর উৎপত্তি এবং একে লক্ষ্য করেই সমস্ত বস্তু ধাবিত।

একটা বিষয়ে এখানে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা দরকার। বিষয়টি হল প্লেটোর পদ্ধতিতে ভগবানের স্থান কোথায়? ভগবান শব্দটি তিনি অনেকবার অনেক জায়গা ব্যবহার করেছেন, কখনও এক বচনে কখনও বহু বচনে। ভগবানকে একবচনে ও বহু বচনে ব্যবহার করার সুবিধে

হল যে, প্লেটো এর মারফতে অতি সহজেই একেশ্বরবাদ থেকে বহুশ্বরবাদে চলে যেতে পারেন। বহু দেবত্ববাদ ব্যতিরিকেও তিনি জগতের এক পরম স্রষ্টিকর্তার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। এ পরম স্রষ্টিকর্তা সর্ব মানবের জীবন-ভাগ্যকে পর্যবেক্ষণ করছেন। কিন্তু প্রশ্ন: এ পরমেশ্বরের সাথে প্লেটোর ভাবের কি সম্পর্ক, বিশেষকরে তাঁর 'মঙ্গল ভাবের' সাথে। সর্বোচ্চ ভাবের সাথে যদি ভগবান ভিন্ন হয়ে থাকেন, তবে জেলারের (zeller) মতে তিন উপায়ে তা সম্ভব। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তিনটি উপায়ই সমভাবে আপত্তিজনক। প্রথমতঃ, ভগবান মঙ্গল ভাবের মূল কারণ। কিন্তু আমাদের এরূপ কল্পনা ভাবের মূল বিষয় বস্তুকে এক ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। প্লেটোর দর্শনের সারবস্তুই হল তাঁর ভাব। ভাব স্বনির্ভর এক পরমসত্তা। সব কিছুর মূল এ পরমসত্তা; কিন্তু নিজে কোন কিছু থেকে উদ্ভূত নয়। কিন্তু এ ধারণা প্লেটোর ভাবকে ভগবানের এক স্রষ্টি-বস্তুতে পরিণত করে, যার সত্তা ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ, ভাব থেকে ভগবান সত্তার বিকাশ, এ ধারণাও অত্যন্ত বে-মানান। কারণ, আমাদের কল্পনার সর্বেসর্বা ভগবান অন্যান্য বস্তুর মত একটা আগত (Derivative) বস্তু হিসেবেই পরিণত হয়। অর্থাৎ ভগবানের কোন নিজস্ব সত্তা নেই; তিনি কেবল ভাব-সত্তার প্রতিরূপ। ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত আপত্তিজনক। তৃতীয়তঃ, ভগবান এবং ভাব দুটুই নিরপেক্ষ আদিসত্তা। 'তারমানে, প্লেটো পরম সত্তার দু'টু পারম্পরিক অসমাঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অথবা বলা চলে, তাঁর পদ্ধতি অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকভাবে দ্বৈতবাদে পরিণত হয়। এ যুক্তিগুলোর কোনটিকেই যেহেতু গ্রহণ করা যায় না; সুতরাং 'ভগবান' ও মঙ্গল ভাব অভিন্ন বলেই মনে করতে হবে। 'ফিলিবিয়াসে' অবশ্য আমরা এ ধরনের কিছু আলোচনা দেখতে পাই। কিন্তু সেখানে ভগবান বলতে কোন ব্যক্তিবিশেষ ভগবানকে বুঝায় নি। কারণ, ভাব ব্যক্তি বিশেষ হতে পারে না। ভগবান শব্দের ব্যবহার সেখানে সম্পূর্ণ ভাবের রূপক।

যুক্তি-কৌশল আলোচনা শেষ করার পূর্বে যুক্তি-কৌশলের স্থান ও মানব-জীবনে তার গুরুত্ব কতটুকু, তা আলোচনা করা দরকার। এ প্রশ্নে প্লেটোর খুব সাবলীল জওয়াব আছে। যুক্তি-কৌশল জ্ঞানের সর্বোচ্চ মণি এবং জ্ঞানের সর্বোচ্চ মণি হল মানব-জীবন। অন্যান্য পারমার্থিক ক্রিয়ার মূল্যবোধ আছে, যখন কেবল এটা আমাদেরকে ভাবজ্ঞানের দিকেই টানে। বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়গুলোর অধ্যয়ন দর্শন পাঠের প্রাথমিক প্রস্তুতি. বিশেষবিজ্ঞানের কোন মূল্য ও গুরুত্ব নেই যে পর্যন্ত না তারা ভাবে অংশ গ্রহণ করে। ভাবে অংশ গ্রহণ না করা শান্তি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলোর কোন মূল্যবোধ থাকে না। গণিতশাস্ত্র সবিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ, গণিত আমাদেরকে ইন্দ্রিয়-জগত থেকে ভাবজগতে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করে। ইন্দ্রিয়জগত থেকে ভাবজগতে পৌঁছানোর প্রথম সোপান হল গণিতশাস্ত্র। প্লেটোর শিক্ষা পাঠ্যতালিকায় দর্শনের স্থান সর্বশেষ। দর্শনশিক্ষা সবার জন্যে নয়। যুক্তি-কৌশলে প্রবেশ করার পূর্বে একজনকে পুরোপুরি-ভাবে দর্শনের প্রাথমিক বিষয়বস্তুগুলো সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখতে যারা এই প্রাথমিক বিষয়বস্তুগুলো কৃতকার্যতার সাথে জ্ঞান আহরণ করতে পারে, তারাই কেবল দর্শনপাঠের উপযুক্ত। এভাবে, যুক্তি-কৌশলে সবস্তুজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে। দর্শনশাস্ত্রের কমতিতে জীবন কখনও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। কোন কিছুর জন্যে দর্শন নয়, বরং প্রত্যেকটা জিনিসই দর্শনের জন্যে। দর্শনকে কেন্দ্র করেই সব কিছুর উদ্ভব। পরমসত্তায় নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই হল প্রত্যেকটা বস্তুর প্রধান লক্ষ্য। পরমসত্তায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েই বস্তুর সার্থকতা। ‘চরমসত্তা’ ও ‘ভাব’ জ্ঞানে জীবনকে বিলিয়ে দেওয়াই হল ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের মূল কথা।

জড়বিজ্ঞান বা অস্তিত্বের মতবাদ
Physics or the theory of Existence

ডায়ালেকটিক্‌স (Dialectics) বা যুক্তি-কৌশল হল সত্তার মতবাদ। জড়বিজ্ঞান, অস্তিত্বের মতবাদ। ডায়ালেকটিক্‌সকে কেন্দ্র করেই বস্তুর উৎপত্তি। ডায়ালেক্‌টিক্ বস্তুর মূলাধার বা ভিত্তিস্বরূপ। অপরপক্ষে, পদার্থের জড়বিজ্ঞান মূলীভূত দ্রব্যবিশেষ। জড়বিজ্ঞান পারমার্থিক জগতের প্রতিলিপি বা অবভাস (appearance) মাত্র। জড়বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিকবিজ্ঞান হল পার্থিব (phenomenal) এবং অবভাস-বিশেষ। জড়বস্তু স্থান-কালের অন্তর্ভুক্ত। এ-জড়বস্তু স্থান-কাল বহির্ভূত ভাবজগতের (Ideas) এক ছায়া বা প্রতিলিপিবিশেষ। এ জাতীয় জড়বস্তুর মধ্যে দেহধারী (Corporeal) ও বিদেহী বা দেহহীন (Incorporeal) উভয় গুণই বর্তমান। জড়বিজ্ঞানকে দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ, জগত-আত্মার বিদেহী সারাংশটুকু নিয়ে সৃষ্ট আমাদের এ 'স্থূল জগত' এবং দ্বিতীয়তঃ, 'মানবের বিদেহী আত্মার মতবাদ'।

স্থূল জগতের মতবাদ
The doctrihe of the world

'ভাব' (Ideas) বা আদর্শই যদি আদিসত্তা হয়, তবে আমাদের এ-সংবেদনশীল জগত এ-ভাবজগত থেকে কিভাবে উদ্ভূত? এ প্রশ্নে প্লেটোর ভাবদর্শন এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইন্দ্রিয়জগত, ভাবজগতের 'নকল' বা 'প্রতিরূপ' বিশেষ। সংবেদনশীল জগত, আদর্শে বা ভাবজগতে 'অংশ' গ্রহণ করে (Participate)। কিন্তু প্রশ্ন ঠেকে, ভাব-জগতের কোন 'নকল', 'প্রতিরূপ' বা 'অবভাস' থাকবে কেন? ভাব কেন নিজের ছায়া বা অবভাসের সৃষ্টি করবে? এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্লেটো দিতে পারেন নি। তিনি যে উত্তর দেবার প্রচেষ্টা করেন, তা বিজ্ঞানভিত্তিক না হয়ে রূপক ও কাব্যিকরূপ ধারণ করে। ফলে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বিশ্লেষণকে বাদ দিয়ে এখানে প্লেটোর কাব্যিক বর্ণনাই বিশেষভাবে

প্রকটিত হয়ে উঠে। জগত-উৎপত্তির কাহিনী প্লেটোর 'টিমিয়াসে' (Timaeus) কাব্যিক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ভাব চরমসত্তা। ইন্দ্রিয়বস্তু অর্ধসত্য, অর্ধ-মিথ্যা। তারা আংশিক সত্য; কারণ, এরা 'সত্তা' অংশ গ্রহণ করে। আবার এরা আংশিক মিথ্যে; কারণ, এরা 'অসত্তা' অংশ গ্রহণ করে। অতএব দেখা যাচ্ছে, চরম অসত্তারও (absolute not being) একটা আদি বা মূল থাকার প্রয়োজন। প্লেটোর মতে, জড়বস্তু (Matter) চরম অসত্তার আদিরূপ। জড়ের উপর ভাবের ছাঁচে ভাবের প্রতিলিপি হয়ে ইন্দ্রিয়দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। (Things of Sense are copies of the Idea fashioned out or stamped upon matter)। জড় বলতে অধুনা আমরা যা বুঝি, প্লেটো কিন্তু তখন তা মনে করতেন-না। জড় বলতে সাধারণতঃ আমরা কোন বিশেষ দ্রব্যকেই বুঝি। যেমন—কাষ্ঠখণ্ড, লোহ বা পাথরবিশেষ। জড়ের কতগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আছে। এ নির্দিষ্ট গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেই জড় ভাবের ছাঁচে ভাবের অনুলিপি হয়ে বস্তুরূপ ধারণ করে। এ জগতে অনেক জাতের লোহ পদার্থ আছে। তাদের মধ্যে একটা সাধারণ সত্য বিদ্যমান, যার ফলে তাদের সবকে আমরা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে 'লোহ' নামে আখ্যায়িত করি। অর্থাৎ এখানে আমরা লোহের একটা সার্বজনীন বা 'সার্বিক-ধারণা' তৈরী করি। এ-সার্বিক ধারণা গঠন করেই বিশেষ লোহ এই 'সার্বিক ধারণার' অন্তর্ভুক্ত কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করি। ভাবজগতে লোহ-ভাব (Idea of iron) বলে এক ভাব (Idea) রয়েছে। এ জগতে যে-লোহ-খণ্ডটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, এটা প্রকৃত লোহ ভাবজগতের নকল প্রতিলিপি হয়ে জড়বস্তুরূপে আমাদের নিকট ধরা দিচ্ছে। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। মূল-কথা হল, বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য যা আমাদের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সবই ভাবের (Idea) কারসাজি (operation)। ভাবের কোন প্রতিচ্ছবি পড়ার পূর্বে জড় (matter) নির্গুণ, নিরাকার ও বৈশিষ্ট্যহীনরূপে বিরাজ করে। তবে নির্গুণ, নিরাকার ও বৈশিষ্ট্য-

হীন মানে এই নয় যে, এটা কিছুই নয়। প্লেটোর মতে, জড় (matter) এক চরম অসত্তাবিশেষ।

এবারে আমরা প্লেটোর দর্শনে একাধারে 'ভাবজগত' এবং অন্যদিকে জড়স্তূপ দেখতে পাচ্ছি। এ জড়স্তূপের উপর ভাবের ছাপে বা সীলমোহরে দ্রব্য বা বস্তুর উৎপত্তি ঘটছে। স্তূপের উপর ভাবের চিহ্নকরণ হলেই বিশেষ ইন্দ্রিয়দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এখন স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রিয়বস্তু কিভাবে সত্তা ও অসত্তা উভয়ে অংশ গ্রহণ করছে। কিন্তু প্রশ্ন : সত্তা ও অসত্তার এ সংমিশ্রণ কিভাবে সম্ভব হল? ঠিক এ জায়গাই আমরা প্লেটোর রূপরাজ্যে প্রবেশ করি। ভাব যদি বস্তুর মূলাধার হয়, তবে প্রতিলিপি ক্রিয়াও ভাবের দ্বারা সম্পাদিত হবে। বস্তুর উৎপত্তির কারণ ভাবই হবে। কিন্তু এটা প্লেটো কিছুতেই স্বীকার করবেন না। কারণ, উৎপাদন পরিবর্তনেরই নামান্তর। ভাব যদি নিজেদের দিয়েই বস্তুর উৎপাদন ঘটায়, তবে বুঝতে হবে ভাবগুলো পরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, প্লেটো ভাবকে অপরিবর্তনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। অপরিবর্তনীয় বলার অর্থই হল অনুর্বর বা বন্ধ্যা। অর্থ্যাৎ এর কোন উৎপাদন ক্ষমতা নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাবগুলোর ভেতর বস্তু উৎপাদনের কোন নীতি নেই। এখানে প্লেটো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করে স্বীয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, বস্তুর উৎপত্তির মূলে রয়েছে এক জগত-সংঘটক। তিনি মানব-শিল্পির ন্যায় 'গঠনক্ষম' (Plastic matter) পদার্থের উপর ভাবের প্রতিচ্ছবি তৈরী করছেন।

জগত-সংঘটক নিজ স্বকীয়তা বজায় রেখে একাধারে পান ভাব, অন্যদিকে নিরাকার পদার্থ। প্রথমে, তিনি জগত-আত্মা (world soul) সৃষ্টি করেন। এটা অশরীরী, কিন্তু স্থান দখল করে আছে। তিনি জগত-আত্মাকে প্রকাণ্ড জালের ন্যায় শূণ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আবার এটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে খণ্ডিত অংশগুলোকে বক্র করে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ দু'টু বৃত্তে পরিণত করেন। পরে দু'টু বৃত্তই গ্রহ ও নক্ষত্র গোলকে পরিণত হয়। তিনি পদার্থকে প্রতিপাদ্যরূপে

গ্রহণ করে এটাকে চারিটি উপাদানে সমন্বয় করেন। এ উপাদান-গুলো দিয়ে পরে জগত-আত্মার শূন্য কাঠামো (empty frome work of the world soul) সৃষ্টি করেন। এভাবে জগৎ সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পৃথিবীকে প্লেটো জগতের মধ্যকেন্দ্র বলে মনে করেন। স্বর্গীয় নক্ষত্ররাজি একে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে আবর্তন করে। আবর্তন বৃত্তাকারে হয়; কারণ, বৃত্তই হল পূর্ণাঙ্গ ছাঁচ। নক্ষত্রগুলো স্বর্গীয় হওয়ায়, এরা প্রজ্ঞার দ্বারা প্রশাসিত। তাদের গতিও বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়; কারণ, বৃত্তায়িত গতিই হল প্রজ্ঞার গতি।

জগৎ-উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত কারণগুলো রূপক-কাহিণী বলেই মনে হয়। প্লেটো স্বয়ং এ বিষয়ে অবগত। প্লেটো স্পষ্টতঃই যা বিশ্বাস করেন, তা' হল জগতেই আত্মার অবস্থিতি। এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন। প্লেটোর পদ্ধতিতে আত্মা হল 'ভাবজগত' ও 'ইন্দ্রিয়-জগতের' মধ্যস্থকারী (mediator) এ অশরীরী ও অবিনশ্বর। এটা আবার স্থান দখল করে আছে। গতি ও বস্তুর যুক্তি সঙ্গত কার্যকারণের জন্যে প্লেটো মনে করেন যে, পৃথিবীতে এক আত্মা বিরাজ করছে। যে প্রজ্ঞার দ্বারা জগত প্রশাসিত, তা জগত আত্মাতেই অন্তর্নিহিত। মানবাত্মা যেমন মানব গতির কারণ, জগত-আত্মাও তেমনি বহির্জগতের গতির কারণ। পৃথিবী একটা জীবন্ত সত্তাবিশেষ।

মানবাত্মার মতবাদ

মানবাত্মা জগতাত্মার অনুরূপ। মানবাত্মা দেহের গতির কারণ, মানবাত্মায় মানব-প্রজ্ঞার বসতি। ভাব ও ইন্দ্রিয় উভয় জগতের সঙ্গেই মানবাত্মার সম্পর্ক ঘনিষ্ট। মানবাত্মাকে দু'অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এর এক অংশকে দু'ভাগে পুনর্বিভক্ত করা হয়। আত্মার সর্বোচ্চ অংশ প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা ভাবকে উপলব্ধি করে। প্রজ্ঞা সরল ও অবিভাজ্য, অক্ষয় ও অবিনশ্বর। আত্মার বিচার শক্তিহীন বা অযৌক্তিক

অংশ (Irrational Part of the soul) মরণশীল। একে আবার উচ্চতর (higher noble) এবং নীচ-হীনকে (ignoble) এ দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে। সাহস, ভালবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি ইত্যাদি মহৎ গুণগুলো বিচার শক্তিহীন বা অযৌক্তিক আত্মার উচ্চতর অংশ। ইন্দ্রিয় বা অনুভূতিজাত বস্তুগুলো বিচার শক্তিহীন। অযৌক্তির আত্মার হীন-নীচ অংশ। আত্মার উচ্চতর অংশ প্রজ্ঞার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রজ্ঞার স্থান হল মস্তিষ্কে। নিম্নতর আত্মার উচ্চ অংশ বক্ষ, শরীরে নিম্নস্তর হল হীন আত্মার অংশ। কেবল মানুষই আত্মার তিনটে অংশ গ্রহণ করে। জীবজন্তু আত্মার নিম্নতর দু'অংশ ও বৃক্ষাদি আত্মার কেবলমাত্র প্রবৃত্তি অংশটুকুই গ্রহণ করে। একমাত্র প্রজ্ঞাশক্তির জন্যেই মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা হয়ে আছে।

প্রজ্ঞা আত্মার অমরত্ব মতবাদকে প্লেটো 'স্মৃতি' ও 'দেহান্তর প্রাপ্তি' মারফতে ভাব মতবাদের সাথে সংযোগ করে দেন। স্মৃতি মতবাদ অনুযায়ী, জ্ঞান বলতে অশরীরীর আত্মার জন্ম-পূর্ব-অনুভূতির স্মৃতিকেই বুঝায়। (Knowledge is recollection of what was exprienced by the soul in its disembodied state before beth) এখানে স্বরণ-রাখা প্রয়োজন যে, 'জ্ঞান' শব্দটাকে প্লেটো একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। এখানে জ্ঞান ভাবজগতে বিদেহী অবস্থা আত্মার অভিজ্ঞতার স্মৃতিকেই ইঙ্গিত করে (It refers only to recollection of the expriences of the soul in its disembodied state in the world of ideas)। কিন্তু প্রশ্ন, জ্ঞান যদি স্মৃতিশক্তিই হয়, তবে যখন প্রয়োজন তখন আমরা স্মরণ করতে পারিনা কেন? স্মরণ করার নিমিত্ত গণিত বা অন্যান্য বিদ্যার এত বিরক্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রক্রিয়া কেন? তার যথার্থ কারণ হল, আত্মা তার 'ভাবজগত' থেকে 'ইন্দ্রিয়জগতে' প্রবেশ কারার পর জ্ঞান একেবারে অনুভূতিহীন ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন কেবলমাত্র ছায়ার মত একটা অস্বচ্ছ স্মৃতিশক্তি থাকে। এ অস্বচ্ছ স্মৃতিশক্তিকেই বহু ঘষামাজা করে হারানো জ্ঞানকে পুনরুদ্ধার করতে হয়। স্মরণ

করার এ পদ্ধতিকেই শিক্ষা বলা যেতে পারে (Education)। এটার সঙ্গে প্লেটো আবার 'দেহান্তরপ্রাপ্তি' মতবাদ (Transmigration) সংযোগ করে দেন। দেহান্তর মতবাদের ধারণাটুকু প্লেটো নিঃসন্দেহে পীথাগোরীয়ানদের কাছ থেকে পেয়েছেন। প্লেটোর এ দেহান্তর মতবাদ সম্পূর্ণ অলীক ও কাল্পনিক। আত্মা অবিনশ্বর। এটার পূর্বে অস্তিত্ব ছিল। ভাবজগতেই আত্মার বাস। অশরীরী বা বিদেহী অবস্থায় আত্মা পরম সুখে ভাবচিন্তায় গভীর মগ্ন ছিল, কিন্তু ইন্দ্রিয়-জগতের সঙ্গে এটার ঘনিষ্ট সান্নিধ্য হওয়ায় ক্রমান্বয়ে আত্মা ইন্দ্রিয় শরীরে অনুপ্রবেশ করে। তারপরেই ঘটে তার পতন। মৃত্যুর পর যদি মানব মহৎ জীবন যাপনে দর্শন ও ভাবজ্ঞানে লিপ্ত থাকে, তবে আত্মা পুনরায় তার পরমানন্দ 'ভাবজগতে' ফিরে যাবে। কিন্তু এখানেই সে ক্ষান্ত থাকবে না। সে আবার পূর্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়জগতে ফিরে আসবে এবং পুনরায় পরমানন্দের সঙ্গে মিলিত হবে। এ-প্রক্রিয়া চক্রাবর্তের মত অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। যারা মন্দ কাজ করে, মৃত্যুর পর এরা শাস্তি পায় এবং তাদের আত্মা আরো নিম্নস্তরের জীবদেহে প্রবেশ করে পুনর্জন্মলাভ করে।

নৈতিকদর্শন বা নীতিবিজ্ঞান

প্লেটোর জ্ঞান-মতবাদ যেমন সমর্থক দিয়ে আরম্ভ, নৈতিক-দর্শনও তেমনি নঞর্থক দিয়ে শুরু। নঞর্থক যুক্তি দিয়ে যেমন করে তিনি সমস্ত সত্য ও মিথ্যাকে দুরীভূত করে বস্তুর সাধারণ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন, অনুরূপভাবে তিনি অসৎ-মন্দ, অশুদ্ধ-অপবিত্রগুলোকে বিতাড়িত করে পবিত্র ও সৎ-এর স্বরূপ নির্ধারণ করেন। জ্ঞান মতবাদে জ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয়লব্ধ নয়, নৈতিক-দর্শনেও মঙ্গল মানেই আনন্দ বা সুখ নয়। সঠিক মতামত যেমন জ্ঞান নয়, সঠিক কর্মও তেমনি সৎ বা বিশুদ্ধ নয়। জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়লব্ধ করার ফলে সত্যের উপর যে ক্ষতিসাধণ করা হয়, পুণ্য বা সৎকে আনন্দ-সুখের পর্যায়ভুক্ত করার

ফলেও তেমনি ক্ষতিসাধন করা হয়। আমরা এখানে প্লেটোর যুক্তিগুলো সংক্ষিপ্তকারে বিবৃত করছি ঃ

(১) সফিস্টস্‌দের জ্ঞান-মতবাদ বিষয়গত-সত্যকে যেমন করে নৈরাশ্যজনকভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাদের পুণ্য বা মঙ্গল মতবাদও তেমনি মঙ্গলের বিষয়গত সত্তাকে অস্বীকার করে নৈতিকদর্শনে এক নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। সফিস্টস্‌দের মতে, কোন কিছুই আত্মগতভাবে ভাল নয়। বস্তুগুলো কেবল আমার জন্যে বা তোমার জন্যে ভাল। তারা আত্মগতভাবে ভাল নয়। অর্থাৎ মঙ্গলের কোন নৈতিকমান নেই। (২) মঙ্গলের কোন নৈতিকমান না থাকায়, তারা মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রভেদটুকুকে অস্বীকার করে। মঙ্গল যেহেতু, ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল ; অতএব একব্যক্তির সন্তোষ, অপরের অসন্তোষ। অর্থাৎ, একই বস্তু একই সময় মঙ্গল-অমঙ্গল উভয়ই। একের জন্যে যা মঙ্গল মনে হচ্ছে, অপরের নিকট তা-ই আবার অমঙ্গল ঠেকছে। বস্তুতঃ মঙ্গল-অমঙ্গলের কোন প্রভেদ নেই—তারা একই। (৩) আনন্দ বা সুখ হল ইচ্ছার প্রশান্তি। (satisfaction of Desirs)। ইচ্ছাগুলো হল কতগুলো অনুভূতি-বিশেষ (feeling)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সফিস্টস্‌দের মঙ্গল মতবাদ নৈতিক-আদর্শকে অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাবিশেষ ; কিন্তু নৈতিকআদর্শ কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতির উপর নির্ভরশীল নয়—এ-সবের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, সার্বিক-প্রজ্ঞা থেকেই আমরা নৈতিক-আদর্শের মান পেতে পারি।

নৈতিককার্যাবলির অভিপ্রায় (the end of moral activits) নৈতিককার্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত—এর বাইরে নয়। নৈতিকতার বহির্মূল্য ব্যতিরেকেও অন্তঃস্থ-মূল্য আছে (Intransic value) কোন কিছুর স্বার্থে আমাদের ন্যায় কাজ করা উচিত নয়। কেবলমাত্র ন্যায় বা মঙ্গলের জন্যেই আমরা মঙ্গল কাজ করব। মঙ্গল কাজে 'মঙ্গল'ই হবে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সফিস্টস্‌রা তা অস্বীকার করে। তাদের মতে, আনন্দ বা সুখের জন্যেই

আমরা মঙ্গল বা ন্যায়কাজ করব। ন্যায়কাজের উদ্দেশ্যই হবে আনন্দ বা সুখ। তাদের মতে, নৈতিক-আদর্শে নৈতিকতা চরম উদ্দেশ্য নয়। নৈতিকতা হল উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায়বিশেষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ন্যায়ের খাতিরেই আমাদের ন্যায় কাজ করা উচিত। প্রজ্ঞার মারফত প্রকৃত সত্যের স্বরূপ নির্ধারণ করে ন্যায় ও ন্যায়কাজকে আমাদের জানতে হবে ঃ নৈতিকতার উদ্দেশ্য কি? নৈতিকতার উদ্দেশ্য নৈতিক কর্মের মাঝেই অন্তর্নিহিত। মঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলই। এখন প্রশ্ন ঃ মঙ্গল কি? চরম মঙ্গল বলতে কি বুঝায়? নৈতিক কর্মের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্লেটো প্রায়ই 'সুখ' শব্দটি ব্যবহার করেন। সুখ হল নৈতিক কাজের লক্ষ্যবস্তু এবং এতেই এর পরিসমাপ্তি। আপাতঃ দৃষ্টিতে প্লেটোকে সুখবাদী বা উপযোগবাদী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা নন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, 'সুখ' কি? এ প্রশ্নের উত্তর প্লেটো শুধু 'সুখ'কেই নয়, এমন কি তার সমগ্র 'নৈতিকদর্শন'কে পর্যন্ত আদর্শ মতবাদের প্রয়োগে ব্যাখ্যা করেন। এখানে প্লেটোর মাঝে দু'টু বিপরীতধর্মী চিন্তাশক্তি ক্রিয়ারত দেখা যায়। প্রথমে, প্লেটোর দর্শনে ভাবই হল চরম সত্য। ইন্দ্রিয়বস্তু মিথ্যা। ইন্দ্রিয়বস্তু আত্মার দৃষ্টিকে 'ভাব' থেকে বঞ্চিত করে রাখে। বস্তুদ্রব্য হল সে জিনিসে যা আদর্শের মুক্ত-স্বাধীন গতির ব্যাঘাত ঘটায়। সুতরাং ইন্দ্রিয়জগত সম্পূর্ণ এক মন্দ জগত। এ জগত থেকে যতই দূরে সরে থাকা যায়, ততই মঙ্গল। ইন্দ্রিয়জগতের সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ, ভোগ-বিলাস, ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে গভীর দর্শন চিন্তায় মগ্ন হওয়াই প্রকৃত মঙ্গল। দর্শন বা আদর্শজ্ঞানই হল জীবনের চরম লক্ষ্য। অপরপক্ষে, ইন্দ্রিয় বস্তুকে আবার অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা চলে। ইন্দ্রিয়বস্তু আর যাই হোক, তারা ভাবের নকল অবভাস। অতএব তারা ভাবজগতের এক মূর্ত প্রকাশ। ঠিক এ জায়গা প্লেটো ইন্দ্রিয় জগতের একটা বিশেষ মূল্য স্বীকার করতে বাধ্য হন। তার ফলে, প্লেটোর চরম উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একটি একক উদ্দেশ্যের (single end) মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বস্তুতঃ চারটির অংশের সংমিশ্রণের ফল। এর মধ্যে দর্শন হল প্রথম ও

প্রধান। দ্বিতীয়তঃ, ভাবের ধ্যান বা প্রতিনিয়তই ইন্দ্রিয়জগতে প্রকাশ পাচ্ছে। তৃতীয়তঃ, শিল্প ও বিশেষবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন। চতুর্থতঃ, নীচহীন প্রবৃত্তিগুলো বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ-পবিত্র ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন। প্লেটো পুণ্যের একতা অস্বীকার করেন নি। 'বহু'-র সাথে সংগতি রেখে তিনি পুণ্যের 'এককতা'কে স্বীকার করেন। প্রধানতঃ চার প্রকারের পুণ্য বা সৎ আছে। এর মধ্যে তিনটেই আত্মার তিনটে বিশেষ-অংশকে নির্দেশ করে। তিনটের সুসংগত ও সঙ্গতিপূর্ণ কার্যের মাঝেই চতুর্থ পুণ্যের প্রকাশ। চতুর্থ পুণ্য তিনটের সুসংগত ও সংহতিপূর্ণ পুণ্যে একক সংমিশ্রণ। নশ্বর আত্মার উচ্চতর অংশ সাহস; নিম্নতর অংশ হল ক্ষুধার্ততা, আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা, যার মধ্যে নীচহীন প্রবৃত্তিগুলো প্রজ্ঞার দ্বারা প্রশাসিত। ন্যায় পরায়ণতা চতুর্থ পুণ্য। তিনটে গুণ থেকে সৃষ্টি হয়। আত্মার তিনটে অংশ যখন সহযোগিতায় সুনির্দিষ্টভাবে তাদের নির্দিষ্ট কার্যাবলী সমভাবে সুসম্পন্ন করে একতানের সুর তুলে, তখনই 'ন্যায়পরায়ণতার' সৃষ্টি হয়। আত্মার তিনটে অংশের সুসম্পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ কার্যাবলীই ন্যায়পরায়ণতা।

রাষ্ট্র

নৈতিক-দর্শনের ন্যায় রাষ্ট্রের ব্যাপারেও প্লেটোর মাঝে দুই বিপরীতধর্মী চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়। ভাবই একমাত্র চরম ও পরম সত্য। বাস্তব-জগতের অবস্থান স্থিতিভাবেরই আবাস (appearance) মাত্র। সুতরাং দেশের পরিচর্যা করা কোন মহৎ লোকের আদর্শজীবন হতে পারে না। এ ইন্দ্রিয়জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করে। ভাব-জগতে বসবাস করাই হল মহৎ উদ্দেশ্য। আমাদের সাধারণ রাজনীতিবিদ্‌দের উদ্দেশ্য একেবারে নিছক অর্থহীন। রাষ্ট্র পরিচালনার ভার দার্শনিকদের উপর ন্যস্ত হলেও একমাত্র বাধ্য-বাধকতা পর্যায়ভুক্ত কতগুলো বিশেষকর্ম ব্যতিরেকে তাদের কিছু করা উচিত নয়। রাষ্ট্রের রাজনীতিক্ষেত্রে দার্শনিকরা কেবল দেহটা

নিয়ে নামেমাত্র থাকেন, আসলে তাদের আত্মা দেশের রাজনৈতিক জীবনের ধরা-ছোয়ার বাইরে। কিন্তু দ্বন্দ্ব ঠেকে তখনই, যখন বলা হয় যে, রাষ্ট্রেই নাগরিক ও সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি তার পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে। এ দুই-বিপরীতধর্মী মতবাদগুলোকে সমন্বয় করার একটা উপায় হল, যে-রাষ্ট্রের বিধিকে দর্শন-উপযোগী করে নেওয়া। রাষ্ট্রের আদর্শ সংবিধানগুলো দর্শনের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে। আমাদের রাষ্ট্র থাকবে; কিন্তু সে রাষ্ট্র হবে আদর্শ ও প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত। আদর্শ ও প্রজ্ঞার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হলেই দার্শনিক তাঁর দেহ ও আত্মা নিয়ে রাষ্ট্রে অবস্থান করতে পারেন। ব্যক্তি বা রাষ্ট্র তখনই তাঁর নিজ পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হতে সক্ষম। প্লেটোর রাজনীতি-দর্শনের মূল কথাই হল, রাষ্ট্রকে প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রজ্ঞা-প্রশাসিত রাষ্ট্রে জ্ঞানী-গুণী ও চতুর-বুদ্ধিমান লোকেরাই হবে দেশের কর্ণধার। তারা রাষ্ট্রের অভিজাত সম্প্রদায়। কিন্তু স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে, আভিজাত্যের মানদণ্ড হবে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে। রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনার মূলসূত্র হবে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার পরে বল ও নৈতিক-শক্তির স্থান। শক্তি-বল একান্ত প্রয়োজন; কারণ, প্রজ্ঞার আইন সাধারণ লোকেরা সহজে মেনে নিতে চাইবে না। তাদেরকে বল প্রয়োগে বিধি মানিয়ে নিতে হবে। জগতের বর্ম, যেহেতু অনবরত চলতেই থাকবে; সুতরাং কার্য পরিচালনার তৃতীয় সূত্র হবে পরিশ্রম (Labour)। প্লেটো কার্যের শ্রেণীকরণে বিশ্বাস করেন। এ তিনটে মূলসূত্র তিনটে বিশেষ সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে, প্রজ্ঞা, অভিজাতসম্প্রদায়; বল ও শক্তি, সৈনিক গোষ্ঠি, শ্রম, সাধারণ সম্প্রদায়। রাষ্ট্রের কার্য বিভক্তিকরণ (Division of the function of state) আবার আত্মার তিনটে অংশের উপর নির্ভরশীল। অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্যে আত্মার প্রজ্ঞার অংশটুকু জীবাত্মার উচ্চতর মহৎ অংশটুকু যোদ্ধা বা সৈনিকদের জন্য এবং আত্মার স্বাভাবিক স্পৃহা প্রবৃত্তিটুকু সাধারণ মানুষের জন্য। রাষ্ট্রে আবার চারটে গুণ আছে। অভিজাতশ্রেণীর জন্যে জ্ঞান; যৌধেয় শ্রেণীর জন্যে

সাহস ; সাধারণের জন্যে সহিষ্ণুতা। দার্শনিকদের জ্ঞান, সৈনিকদের সাহস ও সাধারণের সহিষ্ণুতা যখন সহযোগিতায় সুনির্দিষ্টভাবে নিজ নিজ কার্য সমভাবে সুসম্পাদন করে সুসম্পূর্ণ রূপে এক ঐকতানের সৃষ্টি করে, তখনই চতুর্থ গুণ, ন্যায়ের উৎপত্তি ঘটে।

আর্ট বা শিল্প

বর্তমানে আর্ট বা শিল্পকে দর্শন থেকে পৃথক করে একটা স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্লেটোর সময়ে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল না। সুতরাং আর্ট বা শিল্প সম্বন্ধে প্লেটোর কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদ নেই। যা আছে. তা কেবল কতগুলো বিক্ষিপ্ত আলোচনা। প্লেটো শিল্পকে নীতিদর্শনের অধীনে ও অনুগত বলেই মনে করেন। শিল্প কোন চরম উদ্দেশ্য নয়। শিল্প উদ্দেশ্য সাধনের এক উপায়বিশেষ। শিল্পনীতি ও দর্শনশাস্ত্রের অভিষ্ট সাধনের এক উপায়। সমগ্র শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য 'আদর্শজ্ঞান'। এ উদ্দেশ্য সাধনের প্রস্তুতি হিসেবে সমস্ত বিষয়, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র ও শিল্পসমূহকে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্লেটোর প্রজাতন্ত্রে (Republic) সিম্পোসিয়ামে (Symposium) বা 'আলোচনা সভায়' এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিল্প বলতে প্লেটো বস্তুর অনুকরণ বা অনুলিপি মনে করেন। শিল্প ইন্দ্রিয়বস্তুর নকল। কিন্তু ইন্দ্রিয়বস্তু হল আবার আদর্শের নকল। সুতরাং শিল্প হল নকলের নকল। প্লেটো শিল্পের 'সৃজনশক্তি'কে (creativeness) স্বীকার করেন না। বস্তুকে অকনুরণ বা নকল করেন না। শিল্পী বস্তুকে আদর্শরূপ (idealizs) দান করেন। এ সূক্ষ্ম জিনিসটুকু প্লেটো দেখতে ভুল করেন। শিল্পী কোন প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করেন না, বরং স্বর্গীয় প্রত্যাদেশে অনুপ্রাণিত হয়েই কাজ করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, প্লেটো 'অনুপ্রেরণা'কে প্রজ্ঞার অধীন বলে মনে করেন। তিনি শিল্পকেও দর্শনের অধীন ও অনুগত বলে মনে করেন। আর্ট

বা শিল্প সম্বন্ধে প্লেটোর ধারণা ও অভিমত খুব বেশী একটা সুস্পষ্ট ও জোরালো বলে মনে হয় না।

এরিস্টোটল (Aristotle)

মেসিডোনিয়ার দক্ষিণে চালকিডিস, বর্তমানে চালকিস রাজ্য। এ-রাজ্যের অন্তর্গত মাউন্ট এথেন্সের নিকট প্রাচীন স্টাগিরা নগরে ভুবন-বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ দার্শনিক, মহামান্য এরিস্টোটলের জন্ম। খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৫ অব্দে তাঁর জন্ম বলে অনুমান করা হয়। তাঁর পিতা নাইকোমেকাস মেসিডনের রাজা এমিন্টাসের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। এ চিকিৎসা ব্যবসায়েই তাঁদের পারিবারিক জীবিকা উপার্জনের একমাত্র উপায় ছিল। আঠারো বৎর বয়সে তিনি এথেন্সে আগমন করেন এবং প্লেটোর শিষ্যরূপে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে পরিণত বয়সে তাঁর স্বীয় উস্তাদ প্লেটোর একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হন। খ্রীঃ-পূঃ ৩৪৩ থেকে ৩৪০ অব্দ পর্যন্ত এ চার বৎসরকাল তিনি ফিল্পি পুত্র মহাবীর আলেক-জাণ্ডারের শিক্ষকতা করেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সাথে বন্ধুত্ব বশতঃ তাঁর জ্ঞান সঞ্চয়ের পথ সহজ-সুগম ও প্রশস্ত হয়। খ্রীঃ-পূঃ ৩৩৪ অব্দে লিসিয়ামের পথে পাদচারণযোগে সর্বপ্রথম দর্শনশিক্ষার প্রচলন করেন। এ জন্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে তখন 'পেরিপেটিক' সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হত। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এরিস্টোটলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নাস্তিকতার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। তিনি কালচিস (chalchis) শহরে পলায়ন করেন এবং সেখানে খ্রীঃ-পূঃ ৩২২ অব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এরিস্টোটলের দর্শনতত্ত্বে প্রবেশ করার আগে, তাঁর গ্রন্থাবলির সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাঁর গ্রন্থাবলী সমুদ্রবিশেষ। খ্রীঃ-পূঃ ৫০ থেকে ৬০ অব্দের মাঝে নিকাস কর্তৃক এ-সমুদ্র প্রথম আবিকৃত হয় এবং পরে প্রকাশিত হয়। যে-সমস্ত গ্রন্থাবলী আজও বিদ্যমান, তাদের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

অন্যান্য গ্রন্থের অনেকগুলো প্রক্ষিপ্ত এবং বেশ কিছুসংখ্যক গ্রন্থ একেবারে লোপ পেয়েছে। সমগ্র গ্রন্থাবলির যে দু'টু তালিকা পাওয়া গেছে, তাঁর মাঝে যেটি ২০০ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাওয়া যায়, তার সর্বমোট পুস্তক সংখ্যা চারশত। তালিকাটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়; কারণ, এতে প্রচলিত গ্রন্থের নাম নেই। আলেকজেন্দ্রিয়ার পুস্তকাগারে এরিস্টোটলের যে-সব গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়েছে, এ তারই তালিকা। অন্য তালিকাটি আরবদেশীয় লেখকদের নিকট হতে প্রাপ্ত ও অপেক্ষাকৃত-ভাবে সম্পূর্ণ। এই তালিকায় পুস্তকসংখ্যা এক হাজার। এরিস্টোটলের সমগ্র গ্রন্থাবলিকে মোটামুটি পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়।

১। অর্গানন বা তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী।
২। জড়বিজ্ঞান।
৩। অধ্যাত্মদর্শন।
৪। নীতিবিজ্ঞান।
৫। সৌন্দর্যবিজ্ঞান।

যুক্তিবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্র

এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে খুব বেশী একটা কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, যে-কোন তর্কশাস্ত্র পাঠ করলেই এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। তর্কশাস্ত্রের অবরোহ ও আরোহ পদ্ধতির মাঝে এরিস্টোটল আরোহকেই মূলতঃ স্বীকৃতি দেন। আরোহের উপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সুক্ষ্ম ও প্রসর। তবে, তিনি আরোহকে বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করেন নি। আরোহচিন্তায় তিনি আমাদেরকে মূলসূত্র (fendanenbal canous) দিয়ে যান নি। মূল সূত্রগুলোর আবিষ্কার বর্তমান কালের। এরিস্টোটলের নাম অবরোহ তর্কশাস্ত্র বিশেষভাবে জড়িত। তিনি অবরোহ তর্কশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তর্কবিজ্ঞানকে শুধু প্রতিষ্ঠিত করেই যান নি, তিনি এর একটা সুষ্ঠু ও স্বয়ংসম্পূর্ণরূপও দান করে যান। এরিস্টোটলের তর্কবিজ্ঞান বর্তমানে

আকারগত (formal) তর্কশাস্ত্রকে বুঝায়। চিন্তার মৌলিক সূত্র, বোধজাত-আকারে দশ শ্রেণীকরণ (Ten categorig of enderstending) পঞ্চবিধেয়ক, পদ ও বাক্যের বিভিন্ন বিভাগ, সহানুমান, বিভিন্ন আকারের যুক্তিযুক্তধারা, রূপান্তর প্রভৃতি এরিস্টোটলের আকার-গত তর্কবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। উপরোক্ত নামগুলো বর্তমান আকারগত সূচীপত্রে তালিকা হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এরিস্টোটলের পর তাঁর তর্কবিজ্ঞানের খুব বেশী একটা উন্নতি লাভ করতে পারে নি। পরবর্তী তার্কিকগণ দুই উপায়ে এরিস্টোটলের তর্কবিজ্ঞানকে উন্নত করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথমে, সহানুমানের চতুর্থ আকার (fourth figure) ও দ্বিতীয়তঃ, সাপেক্ষ ন্যায় বা সহানুমান (conditional syllogism) এরিস্টোটল এ দু'টুর কোনটিকেই স্বীকৃতি দেন নি। যা হোক, সহানুমানের চতুর্থ আকারের আদৌ কোন মূল্য আছে কিনা, তা নিয়ে এখনও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সাপেক্ষ সহানুমানের ব্যাপারে বলা যায় যে, যদিও এ প্রয়োজনীয়, তথাপি অত্যাবশ্যক নয়। কারণ, সাপেক্ষ সহানুমানকে নিরপেক্ষ সহানুমানে রূপান্তরিত করা চলে। নিরপেক্ষ সহানুমান যুক্তির প্রধান রূপ যাতে সবপ্রকারের অবরোহকেই রূপান্তরিত করা চলে। মোটকথা এরিস্টোটলের পর তাঁর তর্কবিজ্ঞানের আর কোন উন্নতি সাধন হয় নি। এরিস্টোটল প্রথম থেকেই তর্কবিজ্ঞানকে শেষরূপ দান করে আমাদের নিকট তুলে ধরেছেন।

অধ্যাত্মদর্শন (metaphysis)

'অধ্যাত্মদর্শন' এ্যারিস্টোটলের দেওয়া প্রকৃত মৌলিক নাম নয়। 'অধ্যাত্ম-দর্শন' কথাটার আবিষ্কার সম্পূর্ণ আধুনিক। এরিস্টোটলের দেওয়া এর প্রকৃত মৌলিক নাম হল 'প্রাথমিক-দর্শন' (First philosophy)। প্রাথমিক দর্শন বলতে এরিস্টোটল জগতের সর্বোচ্চ ও প্রথম জ্ঞানকেই ইঙ্গিত করেন। জগতের সার্বজনীন সাধারণ জ্ঞান প্রাথমিক দর্শনের মূল বিষয় বস্তু। এরিস্টোল দর্শনশাস্ত্রকে সাধারণ সংজ্ঞা বা নামমূলক বিজ্ঞান (Science of the universal) বলে

আখ্যায়িত করেছেন। প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের এক একটি করে বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, যাকে কেন্দ্র করে সে বিজ্ঞানের সৃষ্টি। তাদের প্রত্যেকেই এক একটি খণ্ডদর্শন। তাদের প্রত্যেকেই আবার এক বা একাধিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ-সমস্ত যাবতীয় বিশেষ বিজ্ঞান বা খণ্ডদর্শনের সত্যসমূহকে নিয়ে যে একটি সাধারণ বা সার্বভৌম দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, সেটাই এরিস্টোটলের মুখ্য বা প্রাথমিক দর্শন। খণ্ডদর্শনগুলো গৌণ। প্রাথমিক দর্শনও একটা বিজ্ঞানবিশেষ। সবখণ্ডদর্শনগুলো একত্রীভূত হলেও প্রাথমিক দর্শনের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু ঠিকই থাকে। খণ্ডদর্শনের মিলিত উদ্দেশ্য ও প্রাথমিক দর্শনের উদ্দেশ্যের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, তাদের প্রত্যেকই এক আনন্দ মহাসত্তার এক একটি রূপের প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত। এরিস্টোটলের অধ্যাত্মদর্শন প্লেটোর আদর্শ মতবাদেরই স্বাভাবিক পরিণামের ফল। বস্তুতঃ এরিস্টোটল প্লেটোর আদর্শ মতবাদের দোষ ত্রুটিগুলো শুধরিয়ে তাঁর নিজ মত প্রতিষ্ঠা করারই প্রচেষ্টা করেন। প্লেটোর আদর্শ মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি যে-যুক্তির অবতারণা করেন তা হচ্ছে ঃ

(১) প্লেটোর ভাব, বস্তুর অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে না। জগত কি ও কেন, এ প্রশ্নই হলো দর্শনের মূল সমস্যা। কিন্তু প্লেটোর ভাববাদ-জগত ও বস্তুর উৎপত্তির কোন যথাযথ কারণ দর্শাতে পারে না। প্লেটোর নমনীয়, শ্বেত-শুভ্র আদর্শকে মেনে নিলেও এ আদর্শ কি উপায়ে যে শ্বেত বস্তুর উৎপত্তি ঘটায়, তা আমরা জানতে পারি না প্লেটো নিজেও এ প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে পারেন নি।

(২) বস্তুর সাথে তাঁর ভাবের কি সম্বন্ধ, এর যথাযথ ব্যাখ্যাও প্লেটো দিয়ে যেতে পারেন নি। বস্তু ভাবের 'নকল', বস্তুভাবে অংশ গ্রহণ করে, আমাদেরকে শুধু এ পর্যন্তই বলা হয়। কিন্তু নকল বা অংশ গ্রহণ কথাগুলোকে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করবো। এরিস্টোটল বলেন, প্লেটোর এরূপ কাব্যিক ছন্দের ব্যবহার, মূল সমস্যার আসল সমাধান নয়। আসল সমস্যা এড়িয়ে প্লেটোর এ-ক্ষেত্রে কাব্যিক ছন্দের ব্যবহার আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুর সাথে ভাবের

সম্বন্ধ এ প্রশ্নের, প্লেটো প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত কোন কারণ দর্শাতে পারেন নি।

(৩) বস্তুর অস্তিত্বকে ভাবের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলেও বস্তুর গতিকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। শ্বেত-শুভ্র আদর্শ শ্বেতবস্তুর উৎপত্তি ঘটায়, কথাটা মেনে নিলেও বস্তুর গতিকে আমরা মেনে নিতে পারি না; কারণ আদর্শ বা ভাব স্বয়ং অপরিবর্তনীয় ও গতিহীন। অতএব নকলরূপ পৃথিবীও অপরিবর্তনীয় ও গতিহীন হতে হবে। সুতরাং প্লেটোর এ-মতবাদে আমাদের এ-বাস্তব সম্পূর্ণ স্থির ও অচঞ্চল। কিন্তু আমাদের জগত বস্তুতঃ পরিবর্তনশীল, চঞ্চল ও গতিসম্পন্ন। আসলে জগতের জন্ম ব্যাপার (Becoming) প্রশ্নে, প্লেটো কোন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রচেষ্টাই করেন না। শ্বেত-আদর্শ যদি শ্বেত-বস্তুর অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে, তবে বস্তুর উৎপত্তি, উন্নতি ও লয়ের স্থান কোথায়? এ গুলো ব্যাখ্যা করতে গেলে ভাবের গতিকে স্বীকার করে নিতে হয়, কিন্তু প্লেটোর মতে ভাব অনড় ও গতিহীন। সুতরাং প্লেটোর অনুকরণে এদের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

(৪) বহু বস্তুর সমন্বয়ে এ জগত গঠিত। দর্শনের মূল উদ্দেশ্য এ বহু-বস্তুর অস্তিত্বকে যুক্তিগতভাবে বিশ্লেষণ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, প্লেটো এসব বস্তুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনর্থকই 'ভাব' দ্রব্যের পরিমাণ নামক অপর এক বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেন। এতে বস্তু বা দ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে গেলেও বস্তুর যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে না। এরিস্টোটল মনে করেন যে, প্লেটোর ধারণা, বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই বস্তুর অস্তিত্বকে প্রমাণ করা সহজতর হবে।

(৫) প্লেটোর ভাবগুলোকে (Ideas) অতীন্দ্রিয় বলে প্রতীয়মান হয় (Non sensous)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ ভাবগুলোও ইন্দ্রিয়লব্ধ। প্লেটোর ধারণা, ইন্দ্রিয় জগতের ব্যাখ্যার জন্য এক অতীন্দ্রিয় সত্তার আবশ্যক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এরূপ কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার খোঁজ না পেয়ে প্লেটোর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে, প্লেটো ইন্দ্রিয় বস্তুকেই অতীন্দ্রিয়সত্তা নামে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ 'অশ্ব' ও 'অশ্বভাব'

(Horse & the Idea of Horse), 'মানুষ' ও 'মানুষ-আদর্শে'র (Man & the Idea of man) মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। প্লেটো অযথা এবং অনর্থক 'অশ্ব' এবং 'মানুষ' শব্দের পূর্বে 'সত্তা' ও 'সার্বিক' একটা ভাব জুড়ে দেন। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বস্তুর পূর্বে 'সাধারণ' (General) শব্দটুকু ব্যতিরেকে 'বস্তু' ও 'বস্তু-ভাবে'র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভাবগুলো ইন্দ্রিয়বস্তুরই স্বতন্ত্র সত্তা (Ideas are bypostatized things of sense)। এরিস্টোটল তাদেরকে প্রচলিত ধর্মের মানবাকৃতি-দেবতা বলেই মনে করেন। "এগুলো", তিনি বলেন, "যেমন মনুষ্যে দেবত্ব আরোপ বৈ কিছু নয়, ভাবগুলোও ঠিক তেমনি প্রকৃতির সনাতন বস্তু বৈ অন্য কিছু নয়।" প্লেটো বস্তুকে ভাবের প্রতিলিপি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু, এরিস্টোটল ভাবকেই বস্তুর প্রতিলিপি বলে মনে করেন।

(৬) প্লেটোর ভাববাদের বিরুদ্ধে এরিস্টোটল এবার তাঁর 'তৃতীয় ব্যক্তির' (Third man) যুক্তি অবতারণা করেন। বহু বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ গুণটুকু নিয়ে ভাবের সৃষ্টি। সব মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ গুণকে নিয়েই 'মানব-ভাব' গঠিত। কিন্তু প্রশ্ন ঃ ব্যক্তি 'মানুষ' এবং 'মানব-ভাবের' মধ্যেও আবার কতকগুলো সাধারণ গুণ বিদ্যমান। এদেরকে ব্যাখ্যা করতে গেলে পুনরায় অন্য এক 'ভাবের' প্রয়োজন। এ ভাব হল 'তৃতীয় ভাব।' এ 'তৃতীয়-ভাব' ও 'ব্যক্তি বিশেষে'র মধ্যে আবার সাধারণ গুণ বিদ্যমান। এভাবে, এক ভাবকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা অনন্ত ভাবের সম্মুখীন হই।

(৭) ভাববাদের বিরুদ্ধে এরিস্টোটলের প্রধান যুক্তি হল, বস্তুর সারবত্তা বলে ভাবকে কিভাবে প্লেটো বস্তু থেকে আলাদা ও ভিন্ন করে রাখেন। প্লেটোর মতে, ভাব বস্তুর সারবত্তা; কিন্তু ভাব নিজে বস্তু-বহির্ভূত। ভাবগুলোকে বস্তু থেকে পৃথক করে রাখায় মনে হয় প্লেটো যেন তাঁর ভাবকে এক রহস্যজগতে বিচরণ করতে দেখেন। কিন্তু প্লেটো ভুলে যান যে, বস্তুর সারবত্তা বস্তুর মাঝেই অন্তর্নিহিত। বস্তুর সারাংশ বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান, এর বাইরে নয়। ভাব সার্বিক হিসেবে কেবলমাত্র বিশেষেই (Particular) অবস্থান করতে পারে।

সব অশ্বের সত্যতা এক সার্বিক-অশ্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সার্বিক অশ্ব বলতে কোন অশ্বের অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ সার্বিক অশ্বের কোন স্বাধীন স্বকীয়সত্তা নেই। কিন্তু প্লেটো মনে করেন, ব্যক্তি-অশ্বকে আমরা এমনিতে জান্‌ছি; উপরন্তু সার্বিক-অশ্ব বলে এক অশ্বের স্বাধীন স্বকীয়সত্তা কোথাও না কোথাও রয়েছে। কিন্তু প্লেটো ভুলে যান যে, তিনি একথা বলে নিজেই নিজের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। প্লেটো সার্বিককে সত্য ও বিশেষকে অবভাস ও মিথ্যা অভিহিত করেন। কিন্তু তিনিই আবার সার্বিককে এক স্বাধীন স্বকীয়সত্তা দিয়ে ইহাকে বিশেষের পর্যায়ভূক্ত করে ফেলেন। এবং বিশেষের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে প্লেটোর সার্বিক প্লেটোর অজ্ঞাতসারেই মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায়। এ উপরোক্ত যুক্তি অবলম্বনেই এরিস্টোটলের দর্শনের উৎপত্তি। সার্বিক বা সামান্য হ'ল চরমসত্তা। কিন্তু এ সার্বিক বিশেষেই অবস্থান করে। সত্তা কি? দ্রব্য কি? এ হল দার্শনিকদের প্রথম প্রশ্ন। যে বস্তুর নিরপেক্ষ স্বাধীন স্বকীয়সত্তা আছে, তাই দ্রব্য। দ্রব্য কখনও বিধেয় নয়; বরং সব বিধেয় এর উপর নির্ভরশীল এ সামান্য কথাটুকু স্মরণ রেখে আমরা এবার প্রশ্ন করতে পারি, প্লেটোর সার্বিকগুলো কি দ্রব্যবিশেষ? উত্তর হল 'না'। কারণ, প্লেটোর সার্বিক সাধারণ বিধেয়, যা বহুশ্রেণী-বস্তুকে সংযুক্ত করে। সুতরাং সার্বিক দ্রব্য নয়। আবার অন্য দিকে, বিশেষগুলোকেও দ্রব্য বলা যায় না। কারণ এমন কোন বস্তু নেই, যা চরম ও সম্পূর্ণরূপে বিশেষ ও আলাদা। সার্বিক ও বিশেষ পারস্পারিক সম্পূরক। একক ছেড়ে অপরের স্বাধীন অস্তিত্ব কল্পনাতীত। সার্বিক কিংবা বিশেষ এদের কোনটিকেই আলাদা করে নিয়ে আমরা তাকে দ্রব্য বলতে পারি না। এরিস্টোটলের মতে, দ্রব্য বলতে গেলে সার্বিক ও বিশেষ উভয়ের যৌগিক (Compound) কে বলা উচিত। অর্থাৎ বিশেষের ভেতর সার্বিকই হল দ্রব্য। দ্রব্য সমস্ত গুণ-সম্পন্ন এক বিশেষবস্তু। এরিস্টোটল বিশেষের ভেতর সার্বিককে দ্রব্য বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তিনিই আবার সেই সার্বিককে 'অকার' নামে অভিহিত করে

বিশেষের উচ্চস্তরে স্থান দেন। সার্বিককে 'আকার' বলে উচ্চস্তরে স্থান দেওয়া মনে হয়, এরিস্টোটল যেন, নিজের কথাকে নিজেই বিরুদ্ধাচারণ করছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আসলে তিনি প্লেটোর নিরপেক্ষ স্বাধীন স্বকীয় সার্বিককেই অস্বীকার করেন। তবে, তাঁর কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি। এরিস্টোটল যখন সার্বিক দ্রব্য নয় বলেন, তখন তিনি প্রকৃত পক্ষে, সে সার্বিকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। পুনরায় সার্বিককে দ্রব্য বলে তিনি আসলে বুঝাতে চান যে, যদিও সার্বিকের কোন অস্তিত্ব নেই, তবু তা সত্য। বস্তুতঃ এরিস্টোটলের বলার ভঙ্গী বিরোধপূর্ণ বলে মনে হয়; কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে বিচার করিলে তাঁর বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। আসলে তিনি নিজেকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারেন নি। এরিস্টোটলের কার্য কারণ-মতবাদ তাঁর সমগ্র অধ্যাত্ম দর্শনের মূলমন্ত্র। বর্তমানে কার্য কারণ বলতে আমরা যা বুঝি, এরিস্টোটল কিন্তু তখন তা মনে করতেন না। এরিস্টোটলের কার্যকারণ মতবাদ অত্যন্ত ব্যাপকতর।

এরিস্টোটলের কার্যকারণ-মতবাদ কারণ ও যুক্তি (Cause & reason) উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। একটা বস্তুর অস্তিত্ব বা অবস্থিতিকে পুরোপুরিভাবে বুঝাতে যা কিছুর প্রয়োজন, এরিস্টোটলের 'কার্যকারণ' মতবাদ তাকেই ইঙ্গিত করে। বস্তুর অস্তিত্বকে বুঝাতে কোন ঘটনা বা মূলসূত্র, কারণ বা যুক্তি যাই কিছুর প্রয়োজন হউক না কেন, এরিস্টোটলের কার্যকারণ তাকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

কারণের এ ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এরিস্টোটল চার প্রকারের কারণের কথা উল্লেখ করেন। (১) উপাদানকারণ (Material cause), (২) আবয়িককারণ (Formal cause) (৩) নিমিত্তকারণ (Efficient cause), (৪) উদ্দেশ্যসাধক বা চরমকারণ (Final cause)। মূর্তি একটি শিল্পজাত দ্রব্য। এ মূর্তিটিকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা এ চারটা কারণ দেখতে পাই। প্রথমতঃ যে-উপাদানে মূর্তিটি গঠিত, কাঠ, লৌহ বা তামা, সে-উপাদানের উপস্থিতি প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ যে-ধারণা বা নক্শা অবলম্বনে মূর্তিটি তৈরী, সেই নক্শার প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, 'হাত-বাহু বা যন্ত্রপাতি যা দিয়ে মূর্তিটির গঠনকার্য সম্পন্ন হয়েছে, তার প্রয়োজন এবং চতুর্থতঃ, যে উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন শক্তিগুলো মূর্তিটিকে বাস্তবরূপ দান করেছে, সে উদ্দেশ্যের প্রয়োজন। স্বভাবজাত দ্রব্যগুলোর একই নিয়ম। মানব উৎপত্তির ব্যাপারেও ঠিক একই কথা বলা চলে। প্রথমতঃ, জীবকোষ উপাদান দ্বিতীয়তঃ, বিশিষ্ট আকার অনুসারে সে জীবকোষের পুষ্টি সাধনক্রিয়া, তৃতীয়তঃ, গর্ভধান-ক্রিয়া, চতুর্থতঃ, যে নৈসর্গিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন কারণ হতে মানবরূপ কার্যসম্পন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দ্রব্যমাত্রেই উপাদান, ধারণা, নিমিত্ত ও উদ্দেশ্য—এ চার প্রকার কারণ থাকা আবশ্যক। শিল্পজ কিংবা স্বভাবজাত যে কোন দ্রব্যই হোক না কেন, সত্তা লাভ করতে হলেই এ চার প্রকার কারণের সহায়তা লাভ করতে হবে। কারণগুলোর কিন্তু নিজস্ব স্বাধীন স্বকীয় সত্তা নেই—কারণগুলো বস্তুগত। বস্তু বা দ্রব্যই কারণে আশ্রয়। বস্তুমাত্রই কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। দর্শনে সৃষ্টির চারটি কারণ নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু আবার তাদের তিনটি ধারণা রূপ বা অবয়ব নিমিত্ত ও উদ্দেশ্য কারণগুলো পরস্পর একমাত্র মিলিত হয়ে একটিমাত্র অবয়ব কারণের সৃষ্টি করে। শিল্প জগতে শিল্পীর কল্পনাজাত কোন মূর্তির ধারণা হতে, তার হাত মাংশপেশীগুলো সঞ্চালিত হয়ে মূর্তিগঠনরূপ উদ্দেশ্যটি উপাদান সহযোগে কার্যে পরিণত হয়। এখানে নিমিত্ত এবং উদ্দেশ্য সাধক কারণদ্বয় ধারণা হতে সঞ্জীত বলে (১) ধারণা, (২) উপাদানমাত্র, এ দুটি কারণেই পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবজ-দ্রব্য এবং মানব সম্বন্ধে একই নিয়ম। মানব সৃষ্টি কল্পে প্রথমে মানবের ধারণার প্রয়োজন। এ ধারণা মানবমনেই সঞ্জীত হয়, এবং মানবই তা কার্যে পরিণত করে। উভয়ক্ষেত্রেই ধারণা, নিমিত্ত, ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তে প্রযুক্ত হচ্ছে।

সৃষ্টিসাধনের নিমিত্ত এবারে চারটি স্থলে মাত্র দুটি কারণ দাঁড়াল ; প্রথমটি একটি ধারণা বা রূপ, যা দিয়ে সৃষ্টি সাধিত হয় এবং যা সৃষ্টির লক্ষ্য। অপরটি উপাদান, সৃষ্টিমাত্রই যার অবস্থা ভেদ। মূল কারণ,

এবং দ্বিতীয়টি গঠন কারণ।

উপাদান ও রূপ এরিস্টোটল দর্শনের মূলমন্ত্র। এ উপাদান ও রূপ দিয়ে এরিস্টোটল সমগ্র জগৎকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পান। এখন দেখা যাক, তার রূপ ও উপাদানের কি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী। প্রথমে জড় ও রূপ অভিন্ন। আমরা বুঝার সুবিধার্থে অনেক সময় জড় ও রূপকে পৃথক করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তা নয়, জড় ও রূপকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তারা অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন। জগতে রূপবর্জিত কোন জড় নেই আবার জড়বিবর্জিত কোন রূপও নেই। জগতের সমস্ত বস্তুই রূপ ও জড়ের যৌগিক ফল। জড়বিবর্জিত করে রূপকে স্বাধীন স্বকীয়সত্তা দিতে গেলেই সেই দোষে দোষী হয়ে পড়ে, যে ত্রুটিতে তিনি প্লেটোকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কারণ, এরিস্টোটলের রূপ হল প্লেটোর আদর্শ। প্লেটো কল্পনায় তাঁর আদর্শকে স্বাধীন স্বকীয় সত্তা নিয়ে বিরাজ করতে দেখেন, কিন্তু এরিস্টোটলের রূপ কিন্তু তেমনিভাবে স্বাধীন স্বকীয় সত্তা দিয়ে বিরাজ করে না। বস্তুতঃ এরিস্টো-টলের জড় ও রূপ অবিচ্ছিন্ন ও অভিন্ন। এককে ছেড়ে অপরের নিরপেক্ষ সত্তা কল্পনাতীত।

লক্ষণীয় যে, এরিস্টোটলের রূপ, প্লেটোর আদর্শ। প্লেটোর আদর্শ সার্বিক, এরিস্টোটলের রূপও সার্বিক। এরিস্টোটলের রূপ সার্বিক, জড় হল বিশেষ (Particular)। জড় ও রূপকে অভিন্ন বলার অর্থ হল যে, রূপ সার্বিক হিসেবে জড় ও বিশেষেরমাঝেই অন্তর্নিহিত। সার্বিক যে, বিশেষেই অবস্থান করে, এটাই হল এরিস্টোটলের মূল বক্তব্য। জড়কে 'বিশেষ' (Particular) বলার সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 'বিশেষ'কে আমরা যাতে 'ব্যক্তি'র (Individual) সাথে ঘুলিয়ে না ফেলি। প্রত্যেক ব্যক্তি বলতে এরিস্টোটলের জড়-রূপ, সার্বিক বিশেষ যৌগিককে বুঝান। কিন্তু যখন আমরা জড়কে 'বিশেষ' বলে অভিহিত করি, তখন এরূপ কোন যৌগিককে না বুঝিয়ে সার্বিকবিহীন এক চরম 'বিশেষ'কেই বুঝান। এ চরম 'বিশেষে'র মাঝে সার্বিকের কোন চিহ্ন লেশমাত্রও নেই। কিন্তু এ রকম চরম বিশেষের কোন পৃথক

ও বিচ্ছিন্ন সত্তা নেই। অর্থাৎ পূর্ব-কথাকেই অন্য সুরে বলতে হয় যে, রূপ বর্জিত জড় বা উপাদানের কোন বিচ্ছিন্ন ও পৃথক সত্তা নেই।

জড় ও উপাদান বলতে আমরা এখন যা বুঝি, প্লেটো কিন্তু তখন তা মনে করতেন না। উপাদান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক (Relative)। তাঁর মতে, জড় ও রূপ জলীয় পদার্থ (Fluid)। তারা একে অন্যতে প্রবাহিত। একই জিনিস এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জড়, আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রূপ। পরিবর্তনে যা সৃষ্টি হয় (Becoming) কিংবা যার উপর পরিবর্তন সাধিত হয়, তা-ই জড় যাকে লক্ষ্য করে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে, তা-ই রূপ। যা সৃষ্টি হয়, তা-ই জড়। কাষ্ঠনির্মিত চেয়ারের একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। চেয়ার হিসেবে কাষ্ঠখণ্ডটি জড়, আবার বাড়ন্ত উদ্ভিদ হিসেবে সেই কাষ্ঠখণ্ডটিই আবার রূপ। কারণ কাষ্ঠখণ্ডটি উদ্ভিদেরই পরিণত অবস্থা। উদ্ভিদ হিসেবে 'ওক' (Oak) রূপ ; কিন্তু আসবাবপত্র হিসেবে সেই 'ওক'ই আবার জড়।

রূপ কেবল আকৃতিই নয়। কারণ, এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যা রূপ, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তা ই আবার জড়। কিন্তু আকৃতি কেবল আকৃতি ব্যতিরেকে কখনও অন্যকিছু হওয়া সম্ভব নয়। বস্তু গুণকে অন্তর্ভুক্ত করার দরুন আকৃতিকে রূপের অংশ বলা যেতে পারে। কিন্তু আকৃতি (Shape) রূপের সম্পূর্ণ এক অপ্রয়োজনীয় অংশ। কারণ, রূপ (Form) সংগঠনকে (Organisation) অন্তর্ভুক্ত করে। সংগঠন-ক্রিয়া খণ্ডাংশকে খণ্ডাংশের সাথে এবং সমগ্র খণ্ডাংশগুলোকে পূর্ণাঙ্গের (Whole) অধীনে আনয়ন করে, তাদেরকে সম্বন্ধযুক্ত করে। রূপ অন্তর-বাহির (Internal & External) সম্বন্ধের সমষ্টি বিশেষ। রূপ 'আদর্শ-ছাঁচ' (Ideal frame work) যার মধ্য দিয়ে ঢালাই হয়ে বস্তু গড়ে উঠে। রূপ আবার কার্যাবলীকেও (Function) তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, কার্যাবলী উদ্দেশ্যসাধক কারণ (Final)। তা'হলে স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, রূপ কেবল আকৃতিই নয়।

রূপ বস্তুর সবগুণকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। যার গুণ আছে, তা-ই জড়। গুণবিহীন কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। অন্য দিকে, বস্তু

ব্যতিরেকে কোন গুণেরও অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ রূপ এবং জড় এদের কোন পৃথক সত্তা নেই। রূপ ও জড় পৃথক হয়ে আলাদারূপে বিরাজ করে না।

জড় সম্পূর্ণরূপে রূপ-বিবর্জিত। এটা বস্তুর এক আশ্রয় (Substratum) বা আধারবিশেষ। এর নিজের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। এ নির্গুণ, বৈশিষ্ট্যহীন। এ অনির্দিষ্ট (Indefinite)। কোন বস্তুর গুণ, বৈশিষ্ট্য ও নির্দিষ্টতা, সেই বস্তুকে একটা আকার দান করে। জড় নির্গুণ, বৈশিষ্ট্যহীন ও অনির্দিষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন জড়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরিস্টোটলের মতে, লৌহ ও পিতলের মধ্যে জড়গত কোন পার্থক্য নেই, এদের পার্থক্য কেবল রূপের। এরিস্টোটলের এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ছাঁচ অনুযায়ী জড় যে-কোন বস্তুতে পরিণত হতে পারে। জড় সবকিছুরই সম্ভাব্য (Possibility), যদিও এ নিজে প্রকৃতপক্ষে, সম্ভাব্যতা ব্যতীত কিছুই নয়। রূপ-অর্জনেই জড় কিছু (Something) একটা হয়। এখানে, এরিস্টোটল যথার্থতা (Actuality) ও সম্ভাব্যতার (Possibility) মধ্যে একটা বিরোধ দেখতে পান। সম্ভাব্যতা হল জড়ের অনুরূপ, যথার্থতা রূপের অনুরূপ। কারণ, জড় সবকিছুর সম্ভাব্যতা—জড় সবকিছু হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জড় সম্ভাবনা বৈ আর কিছু নয়। জড়কে যে নির্দিষ্ট বস্তুরূপ দান করে, সে হল যথার্থতা। যথার্থতা অর্থাৎ রূপই জড়কে বস্তুরূপ দান করে। যথার্থতাই হল বস্তুর রূপ। জড়কে সম্ভাব্য বলায় মনে হয়, এরিস্টোটল যেন তাঁর রূপ ও যথার্থতাকে জড়ের উচ্চস্তরে স্থান দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আসলে যা রূপ, তা-ই জড়। সময়ের গতিতে জড়কে আগে ও রূপকে পরে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, চিন্তনে ও সত্যতায় আগে, জড় পরে। আসলে, উদ্দেশ্য (the end) প্রারম্ভে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা রূপের মূল চিন্তনে ও সত্যতায় সর্বপ্রথম, যদিও সময়ের গতিতে ইহার আগমন শেষে বা পরে হয়। এরিস্টোটলকে যদি প্রশ্ন করা হয়, পরমসত্তা বা জগতে আদি মূল কি? তবে তাঁর উত্তর হবে,

রূপের উদ্দেশ্য বা মূলই হল পরমসত্তা। রূপ থেকেই জগতের সৃষ্টি। বস্তুতঃ এরিস্টোটলের রূপ, প্লেটোর ভাব। রূপ ও ভাবে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু প্লেটো যেখানে ভাবকে পৃথক সত্তা দান করে গেছেন, এরিস্টোটল সেখানে তাঁর রূপকে জড়বর্জিত করে কোন আলাদা সত্তা দান করেন না।

প্রশ্ন জাগে ঃ এরিস্টোটলের পরমসত্তা বা ভগবানের সাথে জগতের কি সম্পর্ক? আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী পরমসত্তা, আদিসত্তা হিসেবে জগত প্রারম্ভের বহু পূর্বে বিরাজ করছিলেন। তারপর কাল-প্রবাহে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে পরিণামে জগতের সৃষ্টি হয়। এভাবে আমরা পরম-সত্তাকে কারণ ধরে জগত-সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রদান করি। 'কারণ' যেহেতু পরিণামের পূর্বাবস্থা; সুতরাং, পরমসত্তার অবস্থিতি আগে। অথবা কথাটাকে অন্যসুর দিয়ে বলা যায় যে, জগতের কোন প্রারম্ভই ছিল না। জগতের যদি কোন প্রারম্ভই না থাকে, তবে বলতে হবে যে, এখানে আদিসত্তার ধারণারও কোন প্রয়োজন নেই। এ সমস্ত সবই তর্কমূলক কথা। আসল কথা, জগতের সাথে ভগবানের সম্পর্ক কোন কার্য-কারণ পরিণাম সম্পর্কিত ব্যাপার নয়। জগতের সাথে ভগবানের সম্পর্ক আবার সময় কাল-সম্পর্কিতও নয়। জগতের সাথে ভগবানের সম্বন্ধ এক যৌক্তিক-সম্বন্ধ (Logical relation)। ভগবান এক যৌক্তিকবাক্যবিশেষ (Logical proposition) যা থেকে উপসংহার ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহজ স্বাভাবিকভাবে এ জগতের উৎপত্তি। এখানেও যৌক্তিকবাক্য আগে এবং উপসংহার পরে আসে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, আগ পর কথাটা কোন কাল-সম্পর্কিত নয়। ইহাও যুক্তিসম্পর্কিত। অর্থাৎ কাল-সম্পর্কিত হলে, বাক্য আগে ও উপসংহার পরে আসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিন্তন ও সত্যতায় উপসংহার আগে, বাক্য পরে—ঠিক এরিস্টোটলের রূপের ন্যায়। এরিস্টোটলের রূপ চিন্তনে আগে, কিন্তু সময়ের গতিতে পরে। আসল-কথা উদ্দেশ্য প্রারম্ভেই অন্তর্নিহিত। জগত প্রক্রিয়ায় জড়রূপের উচ্চস্তর থেকে উচ্চস্তরে ক্রমোন্নত হওয়ার দরুন জগতসত্তার এক

ক্রমমান পরিদর্শন করে। সত্তার এ-ক্রমমানে সর্বস্তরে রূপ অত্যন্ত প্রবল ও সর্বনিম্নে জড়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সর্বোচ্চে জড় বিবর্জিতরূপ ও সর্বনিম্নে রূপবিবর্জিত জড়। এ উভয় প্রান্তবস্ত নিরপেক্ষতা বিশেষ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, তাদের কারোরই অস্তিত্ব নেই। কারণ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথককরণ সম্ভব নয় এ দু'য়ের মাঝেই সবকিছুর অস্তিত্ব।

জগত প্রক্রিয়া অনবরত স্তর লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন যখন উদ্দেশ্যশক্তির আকর্ষণে উচ্চস্তরের দিকে প্রবেশের চেষ্টা করে, তখনই গতি ও পরিবর্তনের স্থষ্টি হয়। সত্তার মানে—সর্বোচ্চ চূড়ায় চরম রূপের এরিস্টোটল ভগবান বলেন। চরম রূপের যা বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী, ভগবানেরও ঠিক তাই। রূপ যেমন যথার্থ, ভগবানও তেমনি সত্য ও যথার্থ। অন্যান্য সব বস্তুর অস্তিত্ব কমবেশী অসত্য বা মিথ্যে। রূপে যেমন উদ্দেশ্য, নিমিত্ত ও আবয়িক কারণগুলো অন্তর্নিহিত, ভগবানের মধ্যেও এ সমস্ত গুণাবলী অন্তর্নিহিত। অবয়িক-কারণ হিসাবে ভগবান হলেন ভাব। ভগবান প্রকৃতই চিন্তন ও প্রজ্ঞা। উদ্দেশ্য-সার্থক-কারণ হিসাবে, ভগবান চরম উদ্দেশ্যই তিনি সেই পূর্ণাঙ্গ যার দিকে সবাই ধাবিত। প্রত্যেক বস্তুই নিজে নিজের উদ্দেশ্য এবং ভগবান চরম উদ্দেশ্য হিসেবে এ সমস্ত গতি বস্তুগুলোকে নিজের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন। নিমিত্তকারণ হিসেবে ভগবান সমস্ত গতি ও স্থষ্টির আদি কারণ। তিনি প্রথম সঞ্চালক; কিন্তু নিজে গতিহীন, অনড় ও অচঞ্চল। প্রথম সঞ্চালকের গতিহীনতা এরিস্টোটলের উদ্দেশ্য ও রূপেরই চরম পরিণতি। নিজ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে চরম উদ্দেশ্যের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। স্থতরাং চরম উদ্দেশ্য অনড়। আবার নিজ রূপ ব্যতীত চরমরূপ অন্য কোন উচ্চতর রূপে প্রবেশ করতে পারে না। অতএত চরম রূপ গতিহীন; কিন্তু, ভগবানের গতিশীলতা প্রমাণে এরিস্টোটল নিজে যে-যুক্তি দেন, তা নিতান্তই অর্থহীন। তিনি বলেন, ভগবানকে অনড় হিসেবে গ্রহন না করলে আমরা গতির কোন স্থস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারি না। স্থতরাং গতির ব্যাখ্যার জন্যে ভগবানকে

গতিহীন বলে ধরে নিতে হবে। কারণ একগতিশীল বস্তু অন্য কোন গতিশীল বস্তুর দ্বারা সঞ্চালিত। সেই গতি আবার অন্য গতির দ্বারা সঞ্চালিত এবং এ ক্রিয়া অনন্ত কাল চলতে থাকবে। কিন্তু, অনন্তকাল ধরে চললেও গতির কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গতির ব্যাখ্যার জন্যে প্রকৃত ও চরম কারণকে অবশ্যই গতি-হীন ও অনড় হবে। অতএব, ভগবান প্রকৃত ও চরম কারণ হিসেবে অনড় ও গতিহীন।

ভগবানকে প্রথম সঞ্চালক বলায় মনে হয়, এরিস্টোটল যেন তাঁর মতবাদকে ঠিক যান্ত্রিক উপায়ে ব্যাখ্যা করছেন। মনে হয়, এরিস্টোটলের ভগবান কালের প্রারম্ভে বস্তুতে এক সঞ্চালন সৃষ্টি করে দূরে সরে পড়েন, কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ, প্রকৃত নিমিত্ত কারণ হিসেবে এটাকে উদ্দেশ্য সাধক কারণ। ঠিক তেমনি চরম উদ্দেশ্য হিসেবে ভগবান প্রথম সঞ্চালক। যান্ত্রিক উপায়ে আমরা জগত, গতি ও তাঁর সৃষ্টিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করি, সেই হিসেবে ভগবান সৃষ্টির প্রথম কারণ নন। ভগবান উদ্দেশ্য সাধক ও পরিণতিমূলক কারণ। এই হিসেবে ভগবান সত্যতায় ও চিন্তনে প্রথম। ফলে, তিনিই প্রথম সঞ্চালক। কালের গতিতে জগতের কোন প্রারম্ভ সেই এবং এটার কোন শেষও নেই এবং অনন্তকাল ধরে চলবে। এর উদ্দেশ্য হল চরম রূপ এবং চরম রূপে কখনও পৌঁছতে পারবে না। কারণ জড়বিবর্জিত কোন রূপের স্বাধীন-স্বকীয়সত্তা নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে, ভগবান হলেন চিন্তন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে : ভগবান কিসের চিন্তন? চরম রূপ হিসেবে ভগবান কোন জড়ের রূপ হতে পারেন না। সুতরাং চরম রূপ হিসেবে ভগবান হলেন রূপের রূপ (Form of form)। বলতে গেলে, ভগবানের জড় হল রূপ। কিন্তু রূপ আবার সার্বিক হওয়ার দরুণ চিন্তন। এখন এরিস্টোটল ভগবান সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ভগবান হলেন চিন্তনের চিন্তন (Thought of thought) তিনি নিজেই নিজের চিন্তা করেন। তাঁর চিন্তনের উদ্দেশ্য বিধেয় তিনি নিজেই। ভগবান আত্মসচেতন। স্বীয় পূর্ণাঙ্গ

তাঁর ধ্যান। চিরানন্দে তাঁর বাস। স্বীয় পূর্ণাঙ্গে অনন্ত ধ্যানেই তাঁর আনন্দ।

প্রশ্ন হতে পারে, এরিস্টোটলের ভগবান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন (Personal) কিনা। ব্যক্তিত্ব প্রশ্নটা সম্পূর্ণ আধুনিক। এরিস্টোটল কিংবা প্লেটো কেউই 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে এরূপ কোন আলোচনা করেননি। এমনকি কোন গ্রীক চিন্তানায়করা এরূপ প্রশ্নের কোন আলোচনা করেননি। তবে এরিস্টোটলের সমস্ত দর্শন আলোচনা থেকে এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা যায়। বস্তুতঃ, এরিস্টোটলের দর্শনে দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ, 'ভগবান' শব্দ ব্যবহার করাটাই মনে হয়, এরিস্টোটলের ভগবান একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। অপর পক্ষে, জড়বিবর্জিত রূপ বা ভগবান যথার্থ ও সত্য হলেও, তাঁর কোন প্রকৃতসত্তা নেই। সুতরাং এরিস্টোটলের ভগবান এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বহীন বলেই মনে হয়। আসল কথা, এরিস্টোটলের রূপের ন্যায় এরিস্টোটলের 'চরমচিন্তন' বা 'ভগবান' পরমসত্য ; কিন্তু এর কোন অস্তিত্ব নেই। ভগবানের এরূপ ধারণা দিয়েই এরিস্টোটলের 'আধ্যাত্মদর্শনের' সমাপ্তি।

জড় বিজ্ঞান বা প্রকৃতি দর্শন (Philosophy of Nature)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সত্তার মানে (Scale of being) দুই প্রান্তে রূপ বিবর্জিত জড় এবং জড় বিবর্জিত রূপ রয়েছে। আমাদের বর্তমান জগতের অবস্থিতি এ দু'প্রান্তের মধ্যবর্তী। এ দু' চরম প্রান্তের মাঝামাঝি আমাদের এ পৃথিবী। প্রকৃতি জড় থেকে রূপে পরিবর্তনে বিভিন্নস্তর পরিদর্শন করে। এরিস্টোটলের দর্শন মূলতঃ উদ্দেশ্য ও পরিণত মূলক। জগত প্রক্রিয়া রূপ সর্বদাই জড়কে উত্তেজিত করে। আর জড় তাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে জগত পরিচালনারূপ সর্বদা জড়কে তার নিজস্ব ছাঁচে ফেলে বস্তু গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করে। কিন্তু জড়ের প্রতিরোধশক্তি থাকার জন্যে রূপের প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠে না। রূপ

যে জড়কে ছাড়া থাকতে পারে না, বস্তুতঃ এটাই হল তার প্রধান কারণ। রূপ কোন সময়েই জড়ের প্রতিরোধকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করতে পারে না। জড় আবার রূপকে ছেড়ে থাকতেও পারে না। কারণ, জড় কোন সময়ই রূপের পরিচালনশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না। রূপ ও জড়ের এ ব্যাখ্যা জগতের অস্বাভাবিক ঘটনাগুলোকেও বিশ্লেষণ করতে পারে। রূপ যখন জড়কে পরিচালন ও শাসনে ব্যর্থ, তখনই জগতে নানা অঘটন ঘটে। এরিস্টোটল প্রায়ই 'স্বাভাবিক' কথা দুটি ব্যবহার করেন (Natural and the natural)। রূপ যখন তার উদ্দেশ্যসাধন-কার্যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য, তখনই তিনি তাকে স্বাভাবিক বলেন। উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য হলে তিনি তাকে অস্বাভাবিক বলেন।

গতি, স্থান-কালকে বাদ দিয়ে কোন জড়বিজ্ঞান সম্ভব নয়। এরিস্টোটলের জড়বিজ্ঞানেও এদের আলোচনা করা হয়েছে। জড়-বিজ্ঞান গতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। রূপেতে জড়ের প্রবেশ পথই হল গতি। গতি চার প্রকারের (১) যে গতিবশতঃ উৎপত্তি ও লয় হচ্ছে, (২) যে গতিবশতঃ গুণের তারতম্য হয়, (৩) যা পরিমাণ বিভেদের কারণ, (৪) যা দিয়ে স্থান বিচ্যুতি ঘটে। চার শ্রেণীর মধ্যে প্রথমটা অর্থাৎ উৎপত্তি ও লয়ের কারণকে গতি না বললেও চলে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত বা স্থান বিচ্যুতিই প্রকৃতপক্ষে গতিস্থানীয়। বৈজ্ঞানিক মাত্রই এই শ্রেনীর গতিকে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সর্বব্যাপী ও মৌলিক বলে স্বীকার করেছেন। যে কোন গতি লীন শক্তির ব্যক্তাবস্থা।

স্থানের প্রকৃতি অনেকটা সত্তার অনুরূপ। প্লেটো টিমিয়াস গ্রন্থে স্থানকে ভুলবশতঃ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। স্থান উপাদান নয়, বস্তুর রূপ বা ব্যবধানও নয়। স্থান দিয়ে কেবল পরিবেষ্টিত ও পরিবেষ্টকের সীমানিরূপিত হয়। স্থান আধার ও আধেয়ের সীমারূপেই বিদ্যমান। দ্রব্যের অভ্যন্তরের বা পরস্পরের মধ্যে কোন অবকাশ নেই। অন্তর বা অবকাশকে অস্বীকার করতে গিয়েই

এরিস্টোটল স্থানের একটা নতুন সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। তাঁর মতে শূন্যগর্ভ বা আকাশের ধারণা ভ্রম মূলক। অপর পক্ষে গতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেই যে অবকাশকে স্বীকার করে নিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। কারণ গতি দিয়ে কেবল দ্রব্যের স্থান বিচ্যুতিই সূচিত হয়। কোন এক বস্তুর আত্মসঙ্কোচন বা ঘনীভবন হতে তার পার্শ্ববর্তী অপর কোন বস্তুর বিপ্রকর্ষণ বা সম্প্রসারণ ঘটেছে, একথাই প্রমাণ হয়। কোন বস্তুর সম্প্রসারণক্রিয়া হতে বস্তুবিশেষের ঘনীভবনেরই সম্ভাবনা। সুতরাং প্রমাণ হয় যে-দ্রব্য সমূহের অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে কোন শূন্য বা অবকাশ থাকতে পারে না। গতির অভাবে যখন স্থানের ধারণা জন্মে না, তখন স্থান (মহাসত্তা) যে স্থান জুড়ে আছেন, এমন কল্পনা করা ভুল। আধার ও আধেয়ের সীমা নিয়েই যখন স্থানের কল্পনা, তখন স্থান বলতে সীমাবিশিষ্ট বস্তুরই ধারণা হয়। সুতরাং নিখিল বিশ্ব, বস্তুমাত্রই যার অন্তর্ভুক্ত এবং যার বাইরে আর কিছুরই ধারণা হয় না, তা স্থানের অধীন নয়। অতএব, নিখিল বিশ্ব স্বয়ং গতিশীল নয়। কেবল মাত্র তার অংশসমূহের স্থান বিচ্যুতি ঘটে বলে অংশগুলোকেই সচল বলা চলে। কেবলমাত্র স্বীয় কক্ষেই আবর্তন করতে সমর্থ। স্থানের ন্যায় কাল ও গতির ধর্মরূপে গণ্য। কাল দিয়ে গতির সংখ্যা বা পরিমাণ নিরূপিত হয়। প্লেটো যা-ই বলুন না কেন, কাল অসীম হলে তার অসীমত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। এখানেই স্থানের সাথে কালের পার্থক্য। স্থান সীমা বিশিষ্ট। অসীম মাত্রই অব্যক্ত; ব্যক্ত স্বরূপ সগুণ ও শান্ত। কাল অব্যক্ত বলেই অসীম। উদ্দেশ্যভাবে দেখলেও লক্ষ্য করা যায় যে, অসীমত্ব বা অনন্তত্ব, সংখ্যার অনন্তগুণ বৃদ্ধি এবং পরিমাণ বা আয়তনের অনন্ত বিভাজ্যতার উপরই নির্ভর করে। পক্ষান্তরে কাল গতির পরিমাণ নির্দেশ করে বলে স্বয়ং সংখ্যা রূপে গণ্য।

গতি স্থানও কালের মোটামুটি আলোচনার পর এরিস্টোটল এবার জড়-বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়বস্তু, সত্তার ক্রমোচ্চমানের বিস্তৃত

আলোচনা করেন। সত্তার ক্রম-মানকে আবার মূল্যমান ও (Scale of value) বলা যেতে পারে। সত্তার মানে যে বস্তু যত উচ্চস্তরে, তার মান ও মূল্য ততই অধিক। কারণ, এ রূপের দিকে অধিক অগ্রগামী রূপের আকর্ষণ তাতে বেশী। এরিস্টোটলের ক্রমচ্চোমান অভিব্যক্তি বা বিবর্তনবাদের অনুরূপ। কারণ, ক্রমোচ্চমানে নিম্নস্তরে উধ্বস্তরে ক্রমবিকাশ লাভ করে যে-পদ্ধতিতে, এ ক্রমবিকাশ সাধিত হয়, তা কোন কালসম্পর্কিত ব্যাপার নয়। এ যৌক্তিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই সাধিত হয়। বস্তুতঃ এ বিবর্তন এক যৌক্তিক বিবর্তন। উচ্চস্তর সর্বদা সম্ভাব্য হিসেবে নিম্নস্তরে বিরাজিত। সম্ভাব্য হিসেবে মানুষ মানবের মধ্যেই বিদ্যমান; অপরপক্ষে, যথার্থ হিসেবে উচ্চ স্তর নিম্ন স্তরকে তার নিজের মাঝে অন্তর্ভূক্ত করে। অর্থাৎ মানুষ প্রথমে বানর তারপর অন্যকিছু একটা গুণ গ্রহণ করেই মানবত্ব লাভ করে। আসল কথা, নিম্নস্তরে যা অন্তর্নিহিত, উচ্চস্তরে তারই প্রকাশ। আবার উচ্চস্তর নিম্নস্তরকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়ে তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমসত্তা ভগবান বা প্রজ্ঞা বা চরমরূপ এ বিবর্তনের প্রতিস্তরে নিজেকে অনন্তরূপে প্রকাশ করছেন। এখন বস্তুররূপ মানে হল, বস্তুর সংগঠন (Organization) যে-বস্তু মানের (Scale) যত উচ্চস্তরে, তা তত অধিকভাবে সংঘটিত। সত্তার সর্বনিম্নস্তরে অজৈব বা অচেতন (Inorganic) জড়। অচেতন জড় (Inotganic matter) চরম রূপে বিবর্জিত জড়ের (Absolutely formless matter) সন্নিকটবর্তী জড়। কিন্তু, এমন চরম রূপহীন জড়ের কোন অস্তিত্ব নেই। এই অজৈব জড় জগতে জড়ের আধিক্য অত্যন্ত প্রবল। রূপ বা সার্বিক অত্যন্ত ক্ষীণরূপে এখানে নিজেকে প্রকাশ করে। অজৈব জড়ের উদ্দেশ্য তার বহির্ভাগে। অজৈব জড় তার উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত শূন্যে (Space) আবর্তন করে বহির্দিকে ধাবিত হয় এরিস্টোটলের এ বিশ্লেষণ আমাদেরকে বর্তমান 'মাধ্যাকর্ষণ' শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু প্রত্যেক উপাদানেরই যে তার একটা নিজস্ব ও স্বাভাবিক গতি আছে, এরিস্টোটল তা বিশ্বাস করেন। স্বাভাবিক গতির উদ্দেশ্য

দৈশিক (Spatial) হলেও, তার কার্যতৎপরতা (activity) যথাস্থানের (proper place) দিকে আবর্তন করা। উদ্দেশ্য সাধন সমাপ্তিতেই এর কার্য-তৎপরতার বিরাম ঘটে । অগ্নির স্বাভাবিক গতি উর্ধ্বে। এরিস্টোটলের এ মতবাদকে আমরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিবর্তে 'লঘু-কারণ শক্তি' (Levitation) নামে আখ্যায়িত করতে পারি। এরিস্টোটল স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এ দুই শব্দ দিয়ে জগত প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে চান। বস্তু নিম্নে পতিত হওয়ার কারণ কি ? এরিস্টোটলের উত্তর হবে, 'বস্তু স্বাভাবিকভাবেই নিম্নগামী।' স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কথা দু'টো যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্যে এরিস্টোটলকে দোষারোপ করা হয়। কথাটা আংশিক সত্য হলেও 'প্রকৃতপক্ষে' কিন্তু তা নয়। 'লঘুকরণ শক্তি বলতে জগতে কিছু নেই, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ মতবাদ জগতে বিদ্যমান। জগতের গতি 'স্বাভাবিকভাবেই' নিম্নগামী, একথার দ্বারা এরিস্টোটল এই বোঝাতে চান যে, রূপের মূল (Principle of form) বা জগতপ্রজ্ঞার (World-reason) প্রকাশ এখানে অস্পষ্ট ও ক্ষীণ। এত ক্ষীণ যে, এটাকে উদ্দেশ্যহীন বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যহীন নয় ; কারণ, জগতে কিছুই উদ্দেশ্যহীন নয়। এখানে উদ্দেশ্য হ'ল উদ্দেশ্য সাধনে জড়ের গতি মাধ্যাকর্ষণের এ রূপ ব্যাখ্যা সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে ; কিন্তু কেউ এরিস্টোটলের পূর্বে মাধ্যাকর্ষণের এইরূপ উন্নতমানের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

এরিস্টোটলের এ যুক্তি থেকে জৈব ও অজৈব জড়ের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আমরা নির্ধারণ করতে পারি। অজৈব জড়ের উদ্দেশ্য তার বহির্ভাগে। জৈব জড়ের উদ্দেশ্য তার অন্তর্দিকে। চেতনশীল জড়ের উদ্দেশ্য তার নিজের মধ্যেই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। আত্ম-বিকাশ সাধন চেতনশীল জড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করাই হ'ল চেতনশীল জড়ের প্রধান কর্ম। অন্তরে যা সুপ্ত, বাইরে তারই অভিব্যক্তি। সম্ভাব্য হিসেবে যা অব্যক্ত ও অপ্রকট, যথার্থরূপে (actually) তা-ই ব্যক্ত ও প্রকটিত।

সত্তার মানে সর্বনিম্নস্তরে অচেতন জড়। ঠিক তার উপরই চেতনশীল জড়বস্তু। চেতনশীল জড়ে রূপ ক্রমে যথার্থ ও সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। আভ্যন্তরীণ সংগঠনের (In word organization) জন্যেই তা সম্ভব হয়। এ আভ্যন্তরীণ সংগঠনই হল জীবের জীবন বা প্রাণ (life or soul)। এই জীবন-প্রাণকেই আমরা দেহের আত্মা বলে থাকি। মানব-আত্মা দেহের সংগঠন ছাড়া অন্য কিছু নয়। রূপ যেমন জড়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, মানবাত্মাও তেমনি মানব দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জীব কথার সাথে সাথে সজীব বা জীবন্ত এক আত্মার ধারণাও আমরা করতে পারি। কিন্তু এ সজীব আত্মাও আবার নিজে সত্তার উচ্চ এবং নিম্নস্তরমান বহন করে। উচ্চতর আত্মা, রূপের উচ্চতর বিকাশ। আত্ম-বিকাশ সাধনই জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ায়, আত্ম-সংরক্ষণের (Selfpreservation) মাধ্যমেই সে প্রথমে নিজেকে প্রকাশ করবে। আত্ম-সংরক্ষণের অর্থই হল, ব্যক্তি প্রথমে নিজেকে রক্ষা করবে। এ আত্ম-সংরক্ষণই পুষ্টিসাধনের কার্য ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ, এটা প্রজাতির (Species) সংরক্ষণকেও বুঝায়। প্রজাতি সংরক্ষণ আবার জনন-ক্রিয়ার কার্যের উৎপত্তি ঘটায়। জীবরাজ্যের সর্বনিম্নস্তরে হচ্ছে উদ্ভিদ (Plant)। উদ্ভিদ নিজদের পুষ্টি সাধনে বর্ধিত হয় এবং পরে বংশবৃদ্ধি করে। সত্তার মানে উদ্ভিদের পরেই জীবের (animal) স্থান। উচ্চতর যেহেতু সবসময় নিম্নস্তরকে বহন করে, অতএব জীব ও উদ্ভিদ মূলতঃ একই। কিন্তু প্রভেদ শুধু এই যে, জীবের 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি শক্তি' (Sensibility) আছে, কিন্তু উদ্ভিদের তা নেই। জীব ও উদ্ভিদ উভয়েই পুষ্টিসাধন, বর্ধন ও বংশবিস্তার এ-সকল গুণগুলো বহন করে। জীব ও উদ্ভিদ মূলতঃ এক। কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি বৈশিষ্ট্যটুকুর জন্যে জীব উদ্ভিদের চেয়ে এক ধাপ উচ্চস্তরে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রশ্নের সাথে 'সুখ-দুঃখ' (pleasure) কথাগুলোও অনিবার্য হিসেবে এসে পড়ে। দুঃখকে এড়িয়ে সুখ পেতে গেলে চলৎ শক্তির (Power of movement) প্রয়োজন। প্রায় সব জীবেরই এ গতিশক্তি (Locomotion)

আছে। কিন্তু উদ্ভিদের তা মোটেও নেই। উদ্ভিদের চলাফেরা করার কোন শক্তি নেই; কারণ, তারা ইন্দ্রীয় সুখ-দুঃখের পর্যায়ভুক্ত নয়। সত্তার মান এবার জীব থেকে মানবস্তরে অগ্রসর হয়। উচ্চস্তর যেহেতু নিম্নস্তরকে সবসময় বহন করে চলে, সেজন্য এখানেও মানব জীব-উদ্ভিদ উভয়ের পুষ্টিসাধন, বর্ধন, বংশবিস্তার ও গতিশক্তি গুণগুলো গ্রহণ করে। কিন্তু তার উপরও মানবের বিচার-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা গুণটুকু বিদ্যমান, যা জীব বা উদ্ভিদে নেই। এ প্রজ্ঞাশক্তিই মানবকে জীব ও উদ্ভিদ থেকে পৃথক করে রাখে। এ প্রজ্ঞা বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানব অন্যান্য জীব থেকে আরেক ধাপ উচ্চস্তরের। প্রজ্ঞা মানবের যথাযথ উদ্দেশ্য। জগত-প্রজ্ঞা মানবের মাঝেই তার চরম উদ্দেশ্য ও অস্তিত্ব-টুকু খুঁজে পায়। মানবাত্মা পুষ্টিকর, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন।

মানব চেতনায় (within human Consciousness) আবার উচ্চ ও নিম্নস্তর আছে। চেতনের এ স্তরগুলোকে আমরা ধী-শক্তি বলে (faculty) সাধারণতঃ অভিহিত করে থাকি। এ ধী-শক্তির সর্বনিম্নস্তরে হল ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Senseprception)। ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঠিক উচ্চস্তরে হল সাধারণ জ্ঞান (Common sense) এবং তার উপর কল্পনাশক্তি (Imagination) কল্পনার উর্ধ্বে স্মৃতি, স্মৃতির (memory) উর্ধ্বে স্মরণশক্তি (Recollection) এ স্মরণশক্তি থেকে আমরা মানবের বিচার-বুদ্ধিশক্তিতে চলে যাই। কিন্তু প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধির আবার নিজস্ব দু'টু স্তর আছে—উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর। ক্রিয়াত্মকবুদ্ধি হল উচ্চতর (Active) ও নিষ্ক্রিয়াত্মকবুদ্ধি হল নিম্নতর।

আমরা সাধারণতঃ এ সব মনোবৃত্তি ও ধী-শক্তির সমষ্টিগুলোকে 'আত্মা' বলে অভিহিত করে থাকি। পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আত্মা হল দেহের রূপ বা সংগঠন। রূপ জড় থেকে অভিন্ন হেতু, দেহ ভিন্ন আত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। আত্মা দেহের ক্রিয়া (function) বিশেষ। দেহ ব্যতীত আত্মার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। উপকরণ ব্যতীত যেমন মূর্তি গড়া সম্ভব হয় না, চরণ ব্যতীত যেমন

গমন করা যায় না, ইন্দ্রিয় বা দেহ ব্যতীতও সেইরূপ ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি আত্মার ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না বলে এরিস্টোটল মনে করেন। কুঠারের ধারের সাথে কুঠারের যে সম্বন্ধ, আত্মার সাথে দেহেরও সে সম্বন্ধ। কুঠার সজীব হলে তার কর্তন ক্রীয়াকে আত্মা বলা যেত। জীবনীশক্তি বা আত্মা সম্বন্ধে এরিস্টোটলের যে মত, তাতে মনে হয় আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি সম্ভব নয়। অর্থাৎ, মৃত্যুর পর আত্মার আবার জীবদেহ ধারণ অসম্ভব। (metemp sychosis) নেহাইয়ের আঘাতে বংশীধ্বনি বা বংশীধ্বনি দিয়ে নেহাইয়ের ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। অশ্বদেহে মানবাত্মা বা মানবদেহে অশ্বাত্মা সংযুক্ত করে দিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। দেহ আত্মার অনুভূত বা অব্যক্তাবস্থা। আত্মা দেহেরই শক্তি। আত্মার অনুভূতি, উপলব্ধি, সংকল্প এ তিন মানসিক ক্রিয়ার সামর্থরূপে অবস্থিত। মানবের যাবতীয় জ্ঞান ও কর্ম, এ-তিন ক্রিয়ার ব্যক্তভাব। আত্মা প্রথমে দেহের শক্তি কেন্দ্ররূপেই বিদ্যমান এবং পরে দেহের অনুষ্ঠানসমূহে প্রকাশ পায়।

বিষয়ানুভূতি, কল্পনা, স্মৃতি ও সংকল্পরূপে আত্মা পার্থিব সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করে। এ হিসেবে আত্মা নশ্বর। বুদ্ধিও নশ্বর। দৈহিক উত্তেজনাই আত্মার নশ্বরত্বের কারণ। বুদ্ধি বহির্জগত থেকে যে-কোন ভাব সঞ্চয় করে, তাই তার নশ্বর ভাগ। একমাত্র সারভাগ, বিশুদ্ধ চৈতন্য যা থেকে সার্বজনীন সত্তার ধারণা হয়; সেই অংশেরই কেবল বিনাশ নেই। কেবলমাত্র যে সার্বজনীন সত্তা দিয়ে পরমার্থলাভ সম্ভব, তারই বিনাশ নেই। এ অংশ শারীরিক পরিবর্তন ও সুখ-দুঃখাদির অতীত। কোন পরিবর্তনাদি দিয়ে এর অস্তিত্ব নিরূপণ করা যায় না। দেহ থেকে এ মূলতঃ পৃথক ও ভিন্ন প্রকৃতি। এ অংশের অপর নাম ক্রিয়াত্মিকা-বুদ্ধি (Active intellect) ক্রিয়াত্মিকা-বুদ্ধি কেবলমাত্র সামর্থ্য নয়, এ বাস্তব সত্তা। এ বুদ্ধি সৃষ্টিরূপে গণ্য নয়, এ সাক্ষাৎ নিরপেক্ষ শক্তি যা জীবাত্মা ও দেহ সৃষ্টির পূর্বেও বর্তমান ছিল এবং দৈবক্রমে দেহের সাথে সংযুক্ত

হয়েছে। দৈহিক পরিবর্তনাদি হতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন থাকায় এ বুদ্ধি জড়-বর্জিত। এ অজরামর অনন্ত। এর সাহায্য ব্যতিরেকে অসাড় ও সগুণা বুদ্ধি কোন বিষয়ে ধারণা করতে পারে না।

এরিস্টোটলের আত্মার মতবাদ প্লেটো আত্মা-মতবাদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞানসম্মত। প্লেটো আত্মাকে এক অপার্থিব ও অতীন্দ্রিয় বস্তু বলেই অভিহিত করে গেছেন। প্লেটোর আত্মা তার স্বাধীন স্ব-ইচ্ছানুযায়ী দেহে প্রবেশ করতেও পারে, আবার চলেও যেতে পারে। এখানে দেহের সাথে আত্মার সম্পর্কটুকু সম্পূর্ণ যান্ত্রিক। দেহ-আত্মার সম্বন্ধ এখানে কোন অনিবার্য বাঁধনে (necessary) আবদ্ধ নয়। দেহ ও আত্মা উভয়ই পৃথক পৃথক হয়ে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করছে। আত্মা যে কিভাবে দেহে প্রবেশ করে, প্লেটো এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, এরিস্টোটল আত্মাকে দেহের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন। এরিস্টোটলের মতে, আত্মা রূপ হিসেবে কখনও দেহ থেকে ভিন্ন হতে পারে না। দেহকে ছেড়ে আমরা কোন আত্মা পেতে পারি না। এখানে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক আঙ্গিক (organic), যান্ত্রিক নয়। আত্মা এমন এক আলাদা বস্তু নয়, যা ইচ্ছে হলেই দেহে প্রবেশ করতে পারে এবং ইচ্ছে হলেই দেহকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। আত্মা কোন বস্তুবিশেষ নয়। আত্মা হল মানসিক প্রক্রিয়া (function) আত্মার এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞান-সম্মত। এরিস্টো-টলের এ বিজ্ঞান-সম্মত আত্মা-মতবাদ সত্যই প্রশংসনীয়। এ-ব্যাপারে ক্রিয়াত্মিকার বুদ্ধির ভূমিকা আরো অধিক প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, এরিস্টোটল ক্রিয়াত্মিকা আত্মাকে অমর বললেও তার নিজের মতানুসারেই আত্মার অমরত্ব লোপ পেয়েছে। কারণ, যাকে তিনি অমর বলছেন, সেই বিশুদ্ধ আত্মা বা ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধি হতে কোন ব্যক্তি বিশেষের (Individual thing) উদ্ভব হয় না, তা ব্যক্তির অংশরূপেও প্রকাশ পায় না। এ যেন বহির্জগতের কোন বস্তু; আমার 'আমিত্বে'র সাথে কোন দুশ্চেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ নয়। বলতে

গেলে ক্রিয়াত্মিকা-বুদ্ধি বা বিশুদ্ধ আত্মার অস্তিত্বই নেই। এরিস্টোটল বিশুদ্ধ আত্মা বলতে যে কি বুঝেছিলেন, তা বুঝা অত্যন্ত জটিল। তবে ধারণা করা হয় যে, তিনি এ বুদ্ধি বা বিশুদ্ধ আত্মাকে প্রকারান্তরে ঈশ্বর বা ভগবানই বলেছেন। যে দিক দিয়েই হোক, ক্রিয়াত্মিকা-বুদ্ধি আর নিরপেক্ষ চৈতন্য অথবা ঈশ্বরে, কোন প্রভেদ নেই; কারণ, এরিস্টোটল বুদ্ধির বহুত্ব স্বীকার করেন না। ক্রিয়াত্মিকা-বুদ্ধি সম্পূর্ণ জড়-বর্জিত বলে এককভাবেই অবস্থিত। এ অদ্বিতীয় ও কূটস্থ চৈতন্য। এরিস্টোটল ভগবানকে বিশ্বাতীত বললেও তাতে ভগবানের সার্বভৌমত্ব লোপ পায় নি; কারণ, অধ্যাত্মদর্শনে তিনি পরম দেবতার বিশ্বাতীতভাব (Transcendence) এবং প্রাকৃতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার কারণরূপ অন্তর্লীনত্ব (menancy) উভয়ই রক্ষা করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, যখনই তিনি ক্রিয়াত্মিকা বুদ্ধিকে বস্তু-গতভাবে বর্ণনা করেছেন, তখনই আর এ সামঞ্জস্য রক্ষা পায় নি এবং তখন ভগবানের লোকাতীত ভাবের প্রতিষ্ঠায় বলার কিছু থাকে না।

অচেতন জড় থেকে আরম্ভ করে আমরা এখন মানবস্তর পর্যন্ত পোঁছলাম। সত্তার মানকে এখন আমরা প্রথমতঃ অচেতন জড়, তারপর ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদ-জীব এবং মানবস্তর লক্ষ্য করেছি। কিন্তু প্রশ্ন ঃ মানবস্তরের পর কোন স্তর? আদৌ কোন স্তর আছে কি না? নাকি এখানেই তার শেষ? এরিস্টোটল যদিও এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, তবু সত্তার মানক যে মানবস্তরেই থেমে নেই, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অবিরাম সত্তার মানকে কোন ফাঁক বা শূন্যতা নেই—মানব থেকে গ্রহ-উপগ্রহে ও নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে ধাবিত হয়ে স্বয়ং ভগবানের দিকে চলে যায়। রূপ-বর্জিত যেমন কোন জড়বস্তুর অস্তিত্ব নেই কিংবা জড়-বিবর্জিত যেমন কোন রূপেরও অস্তিত্ব নেই, ভগবান বা ঈশ্বরও তেমনি। ভগবান জগতের কোন স্থান-কালের ভেতরে নেই। কিন্তু এরিস্টোটল নিজের কৌতুহলকে দমিয়ে না রাখতে পেরে ভগবানকে একটা বিশিষ্টস্থান দেন। তিনি বলেন, ভগবান গোলকের সর্ব-

বহিঃস্থে অবস্থিত। লক্ষ্য করার বিষয় যে, গোলকের বহির্ভাগ কিন্তু স্থান-কালের পর্যায়ভুক্ত নয়। স্থান-কাল কেবলমাত্র জগত-গোলকের মধ্যেই অবস্থিত। ভগবান জগত গোলকের অদূরস্থ বহিঃস্থে; কারণ, তিনি হলেন সর্বোচ্চ বা পরমসত্তা। "এরিস্টোটলের জগত বা সৃষ্টি-কল্পনা কিছু জটিল ও দুর্বোধ্য। তিনি যাকে প্রথম সঞ্চালক বলেছেন, তাই শ্রেষ্ঠস্বর্গ, শক্তির আদি কারণ। প্রথম সঞ্চালকই ঈশ্বর। সৃষ্টি মাত্রই তাঁর অন্তর্ভুক্ত। তিনি স্বয়ং না চলে অপর সকলকে চালান। এ স্বর্গের পরই আরেকটি স্বর্গ কল্পিত হয়েছে, যাকে প্রথম সঞ্চালিত সঞ্চালক বলা যায় (The first moved mover)। প্রথম সঞ্চালিত সঞ্চালকের অর্থ এই যে, এই স্বর্গ স্বয়ং প্রথম সঞ্চালক (The first mover or prime mover) কর্তৃক সঞ্চালিত হয়ে অপরাপর সৃষ্টিবস্তু সমূহের উপর স্বীয় শক্তি সঞ্চারিত করছেন। নক্ষত্র এ স্বর্গের অধিবাসী। এরপর গ্রহ-উপগ্রহ সমন্বিত সৌরজগত। এ দু'টু বিরুদ্ধ শক্তির অধীন, একটি স্বাভাবিক শক্তি যা প্রথম সঞ্চালিত সঞ্চালক হতে আস্‌ছে, অপরটি দেবতা প্রদত্ত। স্বাভাবিক শক্তিবশতঃ গ্রহগুলো যে দিকে যেতে চায়, দেবতাগণ তাদেরকে তার বিপরীত দিকে নিতে চেষ্টা করেন। সর্বান্তরস্থ বৃত্তটি আমাদের পৃথিবী এবং জগত কেন্দ্র। পৃথিবীকে বেষ্টন করে উপর্যুপরি তিনটি স্তর বিদ্যমান। তারা যথক্রামে জল, বায়ু এবং অগ্নি। নিম্নস্থ চিত্র থেকে এরিস্টোটল কল্পিত জগতের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাতে পারে।"

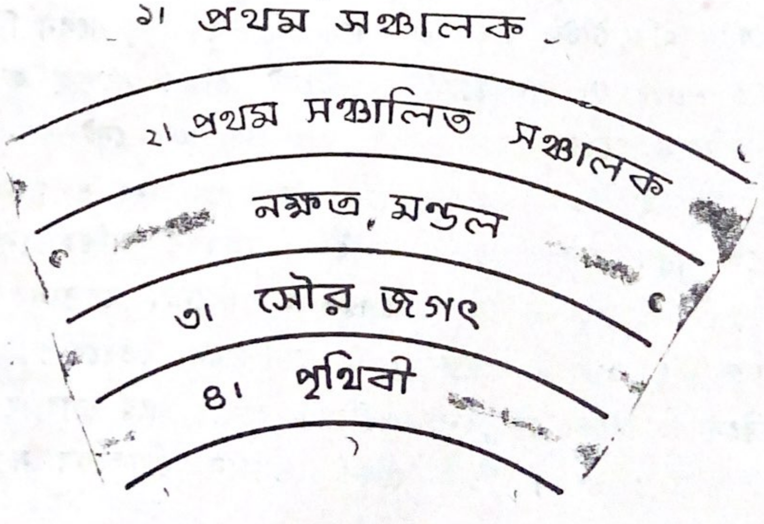

নীতি-বিজ্ঞান

নৈতিকতার প্রধান উদ্দেশ্যই হল 'পরম মঙ্গলের' স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। এক বস্তুর পরিবর্তে সাধারণতঃ আমাদের অন্য এক বস্তু কাম্য হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন, এভাবে যদি উদ্দেশ্য ও পন্থা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে, তবে সমস্ত ইচ্ছা-কামনা ও কার্যই নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। নৈতিকতা বা পরম মঙ্গলের কোন মানদণ্ডই থাকে না। কিন্তু নৈতিক ও পরম মঙ্গলের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। এখন সে পরম মঙ্গলের আসল স্বরূপ কি, যা সব মানুষেরই একান্ত কাম্য। এরিস্টোটল বলেন, সুখই সে চরম উদ্দেশ্য। সুখই মানুষের একান্ত কাম্য। সুখকে কেন্দ্র করেই মানুষের সবকার্য পরিচালিত। কেবলমাত্র সুখই মানবের কাম্য এবং সুখ বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সুখের প্রকৃতস্বরূপ নির্ধারণে বিভিন্ন দার্শনিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন, আনন্দ-পূর্ণ জীবনই সুখ; আবার কেউ বলেন, আনন্দ পরিহারের মাঝেই প্রকৃত সুখ। বর্তমানে, অবশ্য সুখ বলতে আনন্দানুভূতিকে বুঝায়। কিন্তু গ্রীকদের নিকট সুখ তখন নৈতিককার্য বলেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। সুখ বলতে তখন তারা নৈতিককার্যকেই বুঝতো। একটা কর্ম আনন্দ দান করে বলেই কর্মটিকে ভাল বলা চলে না বলে এরিস্টোটল মনে করেন। বরং কর্মটি ভাল বলে তা আনন্দ দান করতে সমর্থ। আনন্দই নৈতিক মূল্যের ভিত্তি। অন্ততঃ সুখবাদীরা তাই মনে করেন। কিন্তু আনন্দ প্রকৃতপক্ষে নৈতিক মূল্যের পরিণাম বলেই এরিস্টোটল বিশ্বাস করেন। সুখই হল সর্বোচ্চ ও পরম মঙ্গল।

এরিস্টোটলের নৈতিক সমস্যার সমাধান তাঁর দর্শনের মূল নীতিকে অনুসরণ করেই চলে। মানব শুধু প্রজ্ঞার দ্বারা প্রশাসিত বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবই নয়, উচ্চতর সত্তা হিসেবে সে স্বভাবতঃই নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলোও নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ গাছ-পালার মতই সে ক্ষুধার্ত, আবার অন্য দিকে জীবের মতই সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ সংবেদনশ পুণ্য বা সৎ দু'প্রকারের। মানবের প্রজ্ঞা, দর্শন ও

বুদ্ধি-বৃত্তির মধ্যেই রয়েছে সর্বোচ্চ পূণ্য বা সৎ। এ প্রজ্ঞের গুণ-গুলোকেই এরিস্টোটল (dianoetic) স্ববিচার-পুণ্য বলে অভিহিত করেন। নীচ-হীন প্রবৃত্তিগুলোকে প্রজ্ঞার শাসনে নিয়ন্ত্রণ করাকেই যথার্থ নৈতিকপুণ্য বলা যেতে পারে। Dianoetic গুণ উচ্চস্তরের কারণ, এর মধ্যেই মানবের বিশেষগুণপ্রজ্ঞা কার্যরত থাকে। প্রজ্ঞা ও চিন্তাশীল মানব ভগবানের সাদৃশ্যস্বরূপ; কারণ, ভগবান বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বা বিশুদ্ধ চিরন্তন বৈ আর কিছু নয়। ঈশ্বরত্ব ও পশুত্ব, এ দ্বৈতভাব আছে বলেই মানব নীতিজ্ঞানের অধিকারী। 'বুদ্ধি বৃত্তি ও পশুত্ব' উভয়ের একত্র সমাবেশ ভিন্ন নৈতিক জ্ঞানের উদয় হয়-না। প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধি শক্তি নেই বলে পশুর নীতিজ্ঞান নেই। আবার নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরেও নীতিজ্ঞানের অভাব : ভাল এবং মন্দ এ দু'য়ের পার্থক্য বিচারেই প্রকৃত নীতিজ্ঞান। যেখানে কেবল ভাল কিংবা কেবল মন্দ সেখানে নীতিজ্ঞান আসতে পারে-না। নীতিজ্ঞানই মানব-প্রকৃতির বিশেষত্ব। বস্তুমাত্রের চরম উদ্দেশ্য যদি স্ব স্ব প্রকৃতির পূর্ণাভিব্যক্তি হয়, তবে মানবজীবনের উদ্দেশ্য শুধু পশুবৃত্তির আনন্দ বা কেবলমাত্র দেবত্বলাভ নয়, বরং তা উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। পশুত্ব এবং দেবত্ব এ দ্বিবিধভাবের পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য সাধনই এ জীবনের উদ্দেশ্য। বুদ্ধিবৃত্তি ও পাশবিক বৃত্তির সামঞ্জস্য হতে যে সুখের উদয় হয়, তাই মানবের চরম লক্ষ্য এবং তাদের সমতারক্ষাই মানবের ধর্ম। এ সমতা রক্ষার ফলে, কল্পনা—রাজ্যে জ্ঞান ও কর্মজগতে বিজ্ঞতা জন্মে। বুদ্ধি ও সংকল্পের সামঞ্জস্য হতে নীতিধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। সাহস, মিতাচার দানশীলতা, মহানুভবতা, মহত্ব, শিষ্টতা, আন্তরিকতা এবং সামাজিকতা প্রভৃতি গুণ নীতিধর্মের অন্তর্গত। ভীরুতা ও দুঃসাহসিকতার মধ্যবর্তী অবস্থাই সাহস। গৃধ্নুতা ও অমিতব্যয়িতার মধ্যবর্তী অবস্থার নাম বদান্যতা। এখন প্রশ্ন : সঠিক মধ্যপন্থা জানার উপায় কি? এরিস্টোটল এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, 'অন্তর্দৃষ্টি' (Insight) দিয়ে মধ্যপন্থা নির্ণয় করা সম্ভব। মানুষ প্রতি সময়েই

অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহারে মধ্যপন্থা ঠিক করে নেয়। একবার এ পন্থা বের করে নিতে পারলে অবশ্য পরবর্তী সময়ের জন্তে কোন অসুবিধা হয় না। এরিস্টোটল নীতিবিজ্ঞানে 'অভ্যাসের' খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। ভাল অভ্যাসের উৎকর্ষ সাধনেই মানুষ মহৎ হয়ে উঠে। এরিস্টোটল মনন-স্বাধীনতার খুবই পক্ষপাতী। মানুষের নিজেরই ভাল-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা আছে। মনন-স্বাধীনতার প্রশ্নে এরিস্টোটলের ধারণা খুব একটা সুস্পষ্ট বলে মনে হয় না। দু'অন্ত্যের মধ্যবর্তী স্থানকেই 'মধ্যপন্থা' (mean) বলে এরিস্টোটল মনে করেন। নিম্নে এরিস্টোটলের মধ্যবর্তী অবস্থা নির্ণয়ের একটা তালিকা প্রদত্ত হল:

অত্যল্প	নাল্লাধিক ব মধ্য	অত্যধিক
(১) ভীরুতা	সাহস	দুঃসাহস।
(২) অনুভূতিশূণ্যতা	সংযম	বিলাসিতা।
(৩) ব্যয়কুণ্টা	দানশীলতা	ব্যয়বিলাসিতা।
(৪) ক্ষুদ্রতা	উদারতা	ব্যয়-ব্যভিচার।
(৫) নীচতা	মহানুভবতা	দম্ভ।
(৬) উচ্চাভিলাষশূণ্যতা	সদুচ্চাভিলাষ	অত্যুচ্চ আকাঙ্ক্ষা।
(৭) নিরীহতা	সৌজন্য	ক্রোধপ্রবণতা।
(৮) হীনতা	সত্যপ্রিয়তা	দর্প।
(৯) কলহপ্রিয়তা	সদ্ভাবশীলতা	তোষামদপ্রিয়তা।
(১০) বর্বরতা	রসিকতা	ভাঁড়ামী।
(১১) বিদ্বেষ	ন্যায্যবিরাগ	হিংসা।
(১২) নির্লজ্জতা	বিস্ময়	লাজুকতা।

এরিস্টোটলের তালিকায় ন্যায়ের স্থান নেই। সাধারণ অর্থানুযায়ী ন্যায় কোন ধর্মবিশেষ নয়, এ ধর্মের পূর্ণতা। ন্যায়কে একটা বিশেষ ধর্ম বললে বলতে হয় যে, অপরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা ও অপরের অন্যায় ব্যবহার সহ্য করা এ দু'ধর্মের মধ্যাবস্থা, কিন্তু অন্যধর্ম যে-অর্থে মধ্যাবস্থা, ন্যায় ঠিক সেরূপ মধ্যাবস্থা নয়। এ দু'অজান্ত্য অন্যায় অবস্থার দিকে এ মধ্যাবস্থা ন্যায়ের লক্ষ্য থাকে।

রাষ্ট্র

নাগরিকের সুখ-সুবিধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত বলে এরিস্টোটল বিশ্বাস করেন। মানুষ স্বভাবতঃই রাজনৈতিক জীব। রাষ্ট্র ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্য (end)। রাষ্ট্রের কার্যাবলী মানব কার্যাবলীর প্রধান অংশ। আসল কথা হচ্ছে, রাষ্ট্র রূপবিশেষ, (form) আর ব্যক্তি জড়বিশেষ (matter)।

রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক উৎপত্তি এরিস্টোটল পরিবারের মধ্যে খুঁজে পান। প্রথমতঃ, ব্যক্তি অস্তিত্ব, তারপর ব্যক্তি তার সাথী খুঁজে এবং এ সাথীর ভিতর দিয়েই গড়ে উঠে ক্ষুদ্র একটি পরিবার। তারপর ক্রমান্বয়ে কতকগুলো পরিবার একত্র মিলে গড়ে তুলে একটি গ্রাম। কয়েকটা গ্রাম মিলে একটা জাতি—কয়েকটা জাতি মিলে গড়ে তুলে একটা দেশ বা রাষ্ট্র (City state) বা শহর। রাষ্ট্র সম্বন্ধে গ্রীকদের ধারণা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—এর বেশী তাদের চিন্তা আর এগোয় নি। রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক উৎপত্তি আমাদের এখন আলোচ্যের বিষয় নয়।

সময়ের গতিতে পরিবার রাষ্ট্রের অনেক পূর্বে হলেও চিন্তনে ও বাস্তবে (thought & reality) রাষ্ট্র পরিবারের পূর্বে বলতে হবে। কারণ, রাষ্ট্র উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সর্বদাই বস্তুর পূর্বে হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নিজস্ব একটা জীবন বা প্রাণ আছে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের অংশগুলোরও একটা স্বাধীন স্বকীয় প্রাণ আছে যা রাষ্ট্রের উচ্চতর প্রাণের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ব্যাখ্যাতেও এরিস্টোটলের রূপ ও জড়ের প্রাধান্য অবলোকন করা যায়। উচ্চস্তর সবসময়েই নিম্নস্তরকে গ্রহণ করে। নিম্নস্তর হল উচ্চস্তরের অব্যক্তরূপ। রাষ্ট্র উদ্দেশ্য, ব্যক্তি তার দিকে ধাবিত। রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ই সত্য। রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গ হিসাবে সত্য, ব্যক্তি তার অংশ হিসাবে সত্য। রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক আঙ্গিক, যান্ত্রিক নয়। এরিস্টোটলের মতে, রাষ্ট্র হল স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের মধ্য থেকেই মানুষ তার জীবনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে পারে।

সরকার অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন রূপের হতে পারে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা কতজন লোকের উপর ন্যস্ত আছে, তার ভিত্তিতে এরিস্টোটল সরকারকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রত্যেকটি বিভাগের আবার দু'টি করে রূপ থাকতে পারে। একটি স্বাভাবিক বা যথার্থরূপ (Normal), অপরটি এর বিকৃতরূপ (Perverted)। সরকারের উদ্দেশ্য যদি জনকল্যাণমূলক হয়, তবে সে সরকার স্বাভাবিক ; আর সরকারের উদ্দেশ্য যদি জনকল্যাণমূলক না হয়ে স্বার্থমূলক হয়, তবে সে সরকার হল বিকৃত। যদি একজন লোকের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তা হল রাজতন্ত্র (monarchy) ; যদি কয়েকজনের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তবে তা হল অভিজাততন্ত্র (Arnstocracy) এবং যদি বহুজনের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তবে তা হল গণতন্ত্র (Polity)। এরা হল স্বাভাবিকরূপ। এদের বিকৃতরূপ হচ্ছে যথাক্রমে (১) স্বৈরাচার তন্ত্র (Tyrany & despotion), (২) ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) ও (৩) জনতাতন্ত্র (Democracy, 'Democracy' শব্দটি বর্তমানে সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এরিস্টোটল সে অর্থে ব্যবহার করেন নি।

এরিস্টোটল প্লেটোর মত কোন আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করে যান নি। কোন রাষ্ট্রই নিজে নিজে সর্বোত্তম নয়। প্রত্যেক জিনিসই অবস্থার উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক সরকারগুলোর মধ্যে তিনি রাজতন্ত্রকেই কাল্পনিকভাবে (theoreticaly) সার্বোত্তম মনে করেন। একজন নিপুণ, বিশুদ্ধচরিত্র, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ নায়কের একাকী রাজত্ব অন্য যে-কোন সরকার থেকে উত্তম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এমন পূর্ণাঙ্গ লোকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। রাজতন্ত্রের পর অভিজাততন্ত্র পরবর্তী উত্তমরাষ্ট্র এবং সর্বশেষে গণতন্ত্র যা তখনকার দিনে গ্রীক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের যথোপযোগী।

সৌন্দর্য-বিজ্ঞান বা শিল্প মতবাদ

এরিস্টোটলের সৌন্দর্য-বিজ্ঞানকে মোটামুটি দু'ভাবে বিভক্ত করা চলে। প্রথমতঃ, প্রকৃতির উপর গভীর পর্যবেক্ষণ এবং শিল্পের প্রকৃত তাৎপর্য : দ্বিতীয়তঃ, কার্যকলায় এই নীতির প্রকৃত প্রয়োগ।

শিল্পকে জানতে গেলে কি শিল্প নয়, তাই প্রথমে জানতে হবে। শিল্পকে এর সমজাতীয় কার্যাবলী থেকে আলাদা করতে হবে। প্রথমে ইহাকে শিল্প-নীতি-বিজ্ঞান থেকে পৃথক। নীতি-বিজ্ঞান কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট-শিল্প উৎপাদন-ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট। কর্মের মধ্যেই নীতি-বিজ্ঞান। কিন্তু কর্ম যা উৎপাদন করে, তাই শিল্প। কর্মকে নিয়ে নীতি-বিজ্ঞান, আর উৎপাদনকে নিয়ে শিল্প-বিজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প প্রকৃতির কার্য থেকে পৃথক। জীবের উৎপাদন ক্ষমতা আছে। জীব স্বজাতীয় জীবের উৎপাদন করে। মনে হতে পারে, এ এক শিল্প। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। জীব স্বজাতীয় জীবের সৃষ্টি করে; কিন্তু শিল্পী নিজকে ভিন্ন সম্পূর্ণ এক নতুন জিনিস গড়ে তুলে। শিল্প কাব্য ছবি-মূর্তিতে শিল্পায়িত করে তোলে স্বীয় প্রতিভাকে।

প্রকৃতির কার্যের সমাপ্তি লক্ষ্য বা নতুন কিছু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হিসেবে শিল্পকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, আমরা চিকিৎসাবিদ্যাকে একটা শিল্প হিসেবে ধরে নিতে পারি। প্রকৃতি যেখানে সুষ্ঠু সুন্দর দেহ উৎপাদনে ব্যর্থ, চিকিৎসাবিদ তার কার্যের পারদর্শিতা দিয়ে প্রকৃতির কাজকে সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করে তুলে।

দ্বিতীয়তঃ, ললিত শিল্প। ললিতকলাকে এরিস্টোটল অনুকরণ-কলা (imitative) বলে অভিহিত করেন। প্লেটো সব শিল্পকে বস্তুর অনুকরণ বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, তাঁর এ মত খুব একটা সন্তোষজনক নয়। এরিস্টোটল যদিও কলাবিদ্যাকে বস্তুর অনুকরণ বলে অভিহিত করেন, তবু তাঁর অনুকরণ প্লেটোর অনুকণের চাইতে ভিন্ন ধরনের। এরিস্টোটলের মতে, শিল্পী অনুকরন করেন সত্যি, কিন্তু সে অনুকরণ নকলের নকল প্রতিলিপি নয়। শিল্প যথার্থই মূল বস্তুর অনুকরণ। এক্ষেত্রে অনুকরণের লক্ষ্য কোন বিশেষবস্তু নয় (Particular thing) বরং এর লক্ষ্য সার্বিকের দিকে। তবে একথা সত্যি যে, বিশেষের মাঝেই সার্বিকের প্রকাশ। শিল্প প্রকৃতিকে আদর্শরূপে রূপায়িত করে। অর্থাৎ শিল্প প্রকৃতিতে আদর্শকে দেখে। চিত্রকর

যখন ব্যক্তি-মানুষের চিত্র অঙ্কন করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তি-মানুষের চিত্র অঙ্কন করেন না, করেন তার আদর্শকে। ব্যক্তি-মানুষের চিত্র তখন মানব-আদর্শ চিত্ররূপে রূপায়িত হয়। শিল্পী বিশেষের মাঝেই সার্বিককে দেখেন। প্রত্যেকটা বস্তুই রূপ ও জড়ের সংযোগে গঠিত। তার মানে, প্রতিটি বস্তুবিশেষ ও সার্বিক নিয়ে গঠিত। বিশেষের মাঝে সার্বিককে প্রদর্শন করানো হল শিল্পীর নৈপুণ্য। চারুকলা বা কাব্যশিল্পে এসে এরিস্টোটল নাটকে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। নাটকের পটভূমি ঐতিহাসিক না কাল্পনিক, এ নিয়ে তিনি খুব বেশী একটা চিন্তা করেন নি। কারণ, সার্বিককে প্রকাশ করা হল শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। এরিস্টোটল মনে করেন, সার্বিককে প্রদর্শন করাই হল শিল্পের প্রধান কাজ। এবার সে কল্পনা বা বাস্তব যাই হোক না কেন। শিল্পের উদ্দেশ্য হল সত্য ও আদর্শের দিকে। নাটক দু'প্রকারের—মিলনাত্মক ও বিয়োগান্ত নাটক। বিয়োগান্ত নাটক মানবের মহৎ দিকটাই রূপায়িত করে, মিলনাত্মক-নাটক মন্দ দিকটাকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক স্বভাবতঃ একজন ভাল মানুষ—তিনি মন্দও হতে পারেন। ভাল বা মন্দ, যাই হোন না কেন, তাঁকে এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে। মিলটনের 'শয়তান' ভাল নয় ; কিন্তু বিরাট ব্যক্তিত্বশালী এবং বিয়োগান্ত নাটকে নায়কের উপযোগী। এক্ষেত্রে, এরিস্টোটলের সূক্ষ্ম চিন্তাধারার প্রশংসা করতে হয়। অনুরূপভাবে মিলনাত্মক নাটকের নায়ক স্বভাবতঃ একজন মন্দ লোক এ কথা যেন আমরা মনে না করি। তিনি আর যাই হোন, নায়ক হিসেবে এক নীচ-হীন সত্তা। বিয়োগান্ত নাটক দুঃখ ও ভয় জাগিয়ে দর্শকের আত্মাকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করে তুলে।

সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এরিস্টোটলের ও প্লেটোর দর্শন মূলতঃ এক। প্লেটোর 'আদর্শ' এরিস্টোটলের 'রূপ'। প্লেটো ও এরিস্টোটল উভয়ের মতেই চিন্তন, সার্বিক, আদর্শ বা রূপ যাই হোক না কেন, এরাই হল পরমসত্তা ; জগত ও বস্তু উৎপত্তির

আদিকারণ। কিন্তু প্লেটো যেখানে সার্বিকের এক নিজস্ব কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন, এরিস্টোটল তা পান নি। সার্বিককে একটা স্বাধীন স্বকীয় সত্তা দান করে প্লেটো সার্বিককে পুনরায় বিশেষের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন বলেই এরিস্টোটলের দৃঢ়বিশ্বাস। সার্বিক বাস্তব, কিন্তু বিশেষকে বাদ দিয়ে তার কোন স্বাধীন স্বকীয় সত্তা নেই বলে এরিস্টোটল মনে করেন। এরিস্টোটল বিশ্বাস করেন, সার্বিকের অস্তিত্ব এই জগতেই বিদ্যমান; বিশেষের মাঝেই সার্বিকের অবস্থান বিশেষ বস্তুর মাঝে 'রূপ' হিসেবেই সার্বিক বিদ্যমান। বিশেষের মাঝে সার্বিকে প্রদর্শন করানো হল এরিস্টোটলের দর্শনের মূল উদ্দেশ্য এবং তাঁর সমগ্র দর্শনের সারবস্তু। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এক্ষেত্রে এরিস্টোটলের চিন্তাধারা খুবই সুস্পষ্ট। এরিস্টোটলের পদ্ধতি সমগ্র গ্রীক ভাববাদের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ রূপ। সমগ্র গ্রীক দর্শন এরিস্টোটলে এসে অগ্রগতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে।

অধ্যাত্মশাস্ত্রের ন্যায়, এরিস্টোটলের নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতিও প্লেটোর লোকাতীত দুর্লভ স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরিস্টোটল প্রত্যক্ষবাদী। তাঁর সমগ্র দর্শন মধ্যপন্থী। স্থূল প্রত্যক্ষবাদ ও সূক্ষ্ম আদর্শবাদ যাদের সাথে বস্তুর সম্পর্ক নেই, তাদের সাথে তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না। বিজ্ঞানের উৎকর্ষহেতু বিজ্ঞান চর্চা প্রতিভার সর্বগ্রাহিতা ও কোমলতা, আদর্শ ও প্রত্যক্ষের সাম্যরক্ষা এ সব গুণে এরিস্টোটল চিন্তাশীল গ্রীকদের শীর্ষস্থানীয়। মানব জাতির স্বাভাবিক বিবর্তন সম্বন্ধেও তিনি এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছেন। স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে, দোষে-গুণে মানুষ। এরিস্টোটলের পদ্ধতিতে যে কেবল গুণই আছে, দোষ নেই, একথা আমরা দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি না। এ হতে যে পরক্ষোভাবে গ্রীকচিন্তার অবনতিও না হয়েছে এমন নয়। এরিস্টোটল শত চেষ্টা করেও প্লেটোর ইন্দ্রিয় ও ভাবজগতের মাঝে কোন সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। এরিস্টোটলের জড় ও রূপ প্লেটোর ইন্দ্রিয় ও ভাবজগতের অনুরূপ। প্লেটোর এ দ্বৈতভাবকে এরিস্টোটল কোনক্রমেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

এরিস্টোটলের জড় ও রূপ অভিন্ন হলেও, একে অপর থেকে উদ্ভূত নয়। জড় ও রূপ পৃথক পৃথক সত্তা হিসেবে অনন্তকাল ধরে পাশাপাশি চলে আসছে। জড় ও রূপের এ দ্বৈতভাব এরিস্টোটল কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এরিস্টোটলের দর্শনমতে রূপের অপেক্ষা জড়ের ধারণায়ই অধিক সত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। যাই হোক, এরিস্টোটলের মূল আধ্যাত্মিক মত যাতে উপাদান বস্তুমাত্রেরই অবস্থিতির কারণ, মানব জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, (নিষ্কলঙ্ক স্ফটিকের সাথে মনের সাদৃশ্য) তার একেশ্বর বাদিত্ব যা প্লেটোর অপেক্ষা অধিকতর নির্বিরোধ, সর্ববিষয়ে মিতাচার পদ্ধতি, সর্ববিষয়ে স্বাধীনতার ভাব তাঁর চিন্তা প্রণালীর এসব বিশেষত্ব হতে যে নূতন যুগের সৃষ্টি হয়, পেলা, রোম, আলেকজান্দ্রিয়া ও জেরুজালেমের অধিবাসীগণ পূর্ব হতেই যেন তার জন্য অপেক্ষা করছিল বলে মনে হয়।

অষ্টম অধ্যায়

এপিকিউরিয়ান (Epicureans)

খৃঃ পূর্ব ৩৪০ অব্দে এথেন্সের নিকট পার্গেটেস নামক স্থানে এপিকিউরাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতামাতা উভয়ই এথেনীয় ছিলেন। নসিকেনিসের কাছ থেকে তিনি ডেমক্রিটাসের পরমাণু দর্শন মত অবগত হন। তিনি প্লেটোর অনুচর প্যাম্ফিলাসের নিকট তাঁর শিক্ষা সমাপন করেন। পরে তিনি যথাক্রমে কলোফন, মিটিলন ও এথেন্স নগরে শিক্ষকতা করেন। তিনি লোকজনের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর মতাবলী বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তবে এসব পুস্তকের রচনা প্রণালীর প্রতি তার কোন বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর হরমার্কাস তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বরণ করেন। এপিকিউরাসের দু'জন প্রিয় শিষ্য মিট্রডোরাস ও পলীনাসের মৃত্যুর পর, তাঁর পার্শ্বচরগণের মধ্যে কলোটিস ও আইডোমিনিউরাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে জেনো

কর্তৃক এপিকিউরাসের ধর্মমত সার্থক রূপে প্রচারিত হয়েছিল বলে জানা যায়। বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের নিমিত্তই বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যক বলে এরিস্টোটল মনে করতেন। এপিকিউরিয়াস কিন্তু এরূপ মনে করেন নি। এপিকিউরাসের মতে বিজ্ঞান জীবন সাফল্যের উপায়মাত্র। বিজ্ঞানের যে টুকুর সাথে দৈনিক জীবনের সম্পর্ক, তিনি ততটুকু আলোচনা করতেই আনন্দবোধ করতেন। এপিকিউরিয়াস দর্শনকে ন্যায়, জড়বিজ্ঞান, ও নীতিবিজ্ঞান এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। প্লেটো জড়কে অসত্তা (non being) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এপিকিউরিয়াসের মতে জড় অসত্তা নয়। ইহা বস্তুজগতের অবস্থিতি হেতু। ইহা জগতের সাধারণ মূলভিত্তি। আত্মা, মন ও ধারণা দৈবক্রমে জড়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জড়ের বহির্দেশে শূন্যছাড়া আর কিছুই নেই এবং এ শূন্য থেকেই গতি উৎপত্তি। জড়ের উপদান অসংখ্য পরামাণুকোষ। পরমাণুকোষের সৃষ্টি-লয় কোনটাই নেই। তারা নিত্য স্পন্দনশীল। ডেমক্রিটাসের মতে পরমাণুকোষগুলো স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখী। এপিকিউরিয়াসের মতে কোষগুলো স্বভাবতঃ নিম্নগামী সত্ত্য, তবে, তারা যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্রব্যসমূহের সৃষ্টি করে তারা স্ব স্ব রেখাপথ অতিক্রম করে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। দৈবই পরমাণুগুলোর স্থান বিচ্যুতির কারণ। দেবতা প্রশ্নে এপিকিউরিয়াস নিয়তির চিরবিদ্যমানতায় বিশ্বাস করতেন না বলেই মনে হয়। নিয়তি যে সৃষ্টির পূর্বে থেকে ঐশ্বরিক বিধানরূপে বিদ্যমান তিনি এরূপ মতের সমর্থক ছিলেন না।

এপিকিউরাস অনন্ত বিশ্বের বিশ্বমানতা বিশ্বাসকরেন। জগতের এককালেসৃষ্টি বা লয় নেই 'শূন্য' থেকে জগতের উদ্ভব এরূপ মত যুক্তি বিরুদ্ধ। আবার অন্যদিকে জগত দেবতাদের দ্বারাও সৃষ্টি হয়নি। দেবতাদের প্রকৃতিও সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা হতেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। তবু তর্কের খাতিরে ধরা যাক, জগৎ দেবতাদের দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে এ সৃষ্টি দু'প্রকারে সম্ভব। প্রথমতঃ অনাদি ও অনন্তভাবে, দ্বিতীয়তঃ আদি, ও অনন্ত বিশিষ্টভাবে। জগৎ যদি অনাদি অনন্তই

হয়, তবে তার সৃষ্টি হয়নি বলতে হবে। কারণ সৃষ্ট বস্তুমাত্রেরই আদি ও অন্ত অবশ্য স্বীকার্য। আর যদি আদ্যন্তবিশিষ্ট হয়, তবে কালেরই কোন না কোন সময়ে জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন, এ সৃষ্টির কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে, এপিকিউরাস বিশ্বের অনন্ত বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করেন।

এপিকিউরাসের মতে, সুখই পরম মঙ্গল। সুখই জীবনের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে কথা হ'ল যে, এ সুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিজনিত সুখ নয়। যে সুখ জীবনের চরম উদ্দেশ্যরূপে গণ্য, তা কখনও আপাতমধুর ইন্দ্রিয়সুখ হতে পারে না। এ সুখ স্থায়ী। এ সুখ মনের সুখ বা মনের সন্তোষ। এ সুখে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের আবেগ স্পন্দন নেই। ইন্দ্রিয় বা কামজ সুখ মুহূর্তে উৎপন্ন হয়ে মুহূর্তেই বিলোপ হয়ে যায়। কিন্তু মনের সুখ স্থায়ী, চিরন্তন ও শাশ্বত। মনের সুখ ইন্দ্রিয়সুখ থেকে বহু শ্রেয়ঃ। কোন বিষয়ে আতিশয্য ভাল নয়। আতিশয্যের কারণে দুঃখ উপস্থিত হয়। কতকগুলো অনুষ্ঠান আছে যা আপাততঃ কষ্টকর বোধ হলেও পরিণামে সুখকর। অস্ত্রোপচারে বেদনা অনুভূত হলেও তাতে পরিণামে স্বাস্থ্যসুখের উদয় হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এরূপ কার্য সুখকর। জ্ঞানিগণ যে গুণবশতঃ অনিষ্টজনক আচরণের পরিহার করে ইষ্ট বা মঙ্গল সাধনে সমর্থ হন, তাকেই ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়। ধর্ম স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ নয়, বরং ইষ্ট বা মঙ্গল লাভের উপায় মাত্র। এপিকিউরাসের মতে, পরম মঙ্গল হিসেবে স্থায়ী সুখ বা মনের সন্তোষই আমাদের একমাত্র কাম্য।

কিন্তু প্রশ্ন, মৃত্যুর ভয়ে আমরা জীবনের চরম উদ্দেশ্যরূপ সুখ ভোগে বঞ্চিত হই কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে এপিকিউরাস মৃত্যুর এক সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পান। মৃত্যুর পর নরক-যন্ত্রণা ভোগের কোন আশঙ্কা নেই বলে এপিকিউরাস মনে করেন। আত্মা জড়সম্ভূত। মৃত্যুর পর দেহের যে অবস্থা হয়, আত্মারও সেই অবস্থা। মৃত্যুর পর যদি আত্মার মহত্তর জীবন লাভের সম্ভাবনা

থাকত, তবে আমরা মৃত্যুকে এত ভয় করতাম না। বরং মৃত্যুর সম্ভাবনায় আমরা আনন্দবোধই করতাম। মৃত্যুর পর আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে, এরূপ চিন্তা করে আমরা আসলে ভীত নই। মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা জীবন ও মরণের ধারণায় এত অভ্যস্ত যে, জীবনের কথা ভাবতেই মৃত্যুর কথা আপনিই এসে পড়ে। ঠিক তারপরই আমরা এক প্রকার শূন্যতা অনুভব করতে থাকি। মনে হয় মৃতব্যক্তি যেন বুঝতে পারে তার দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হচ্ছে, কীট ভক্ষণ করছে। আত্মার যেন ধ্বংস নেই, দেহ নষ্ট হলেও আত্মা যেন নষ্ট হয় না এবং আত্মা যেন দেহের এ ধ্বংস প্রত্যক্ষ করে। আসলে এসকল যে সংস্কারমাত্র তা আমরা চিন্তাও করি না। কোন উপায়ে যদি এসকল সংস্কারগুলো পরিহার করা যায়, যদি জীবনের ধারণা থেকে জীবনের অভাব-জ্ঞানকে পৃথক করা যায়, নির্ভয়ে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে সব ধারণা বিসর্জন দেওয়া যায়, তবে মৃত্যুর কোন বিভীষিকা থাকত না। সংস্কারমুক্ত হলে আমরা সদর্পে বলতে পারতাম, মৃত্যু অমঙ্গলজনক কিছু নয়। মৃত্যু অহিতকর নয়। যে মৃত্যুর শীতল স্পর্শে আমরা এত বিচলিত হয়ে উঠি, আসলে সে মৃত্যুতে ভয়ের কোন কারণ নেই। সংস্কারের উপস্থিতিই আমাদের মনে ভয়ের উদ্রেক করে। কোন-ক্রমে যদি এ সংস্কার থেকে বিমুক্ত হওয়া যায়, তবেই ভয়ের কোন কারণ থাকে না। নিজেকে সংস্কারমুক্ত করে পরম মঙ্গলে স্থায়ী ও শাশ্বত সুখ ভোগ করাই এপিকিউরাস দর্শনের মূলতত্ত্ব।

নবম অধ্যায়

ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য

বৈরাগ্য দর্শন (Stoicism) ঃ জেনো (Zeno)

জেনো বৈরাগ্য-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীস্টপূর্ব ৩৪২ অব্দে কোন এক ভিনিসীয় পরিবারে তাঁর জন্ম। সাইপ্রাস দ্বীপের সিটিয়াস্ শহর তাঁর জন্মস্থান। জীবিকা উপার্জনের একমাত্র উপায়স্বরূপ তিনি ব্যবসা বাণিজ্য গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, জাহাজডুবি হয়ে তাঁর ধন-সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়। এ ঘটনার পর থেকে তিনি দর্শন শাস্ত্রে গভীর আত্মনিবেশ করেন। সুবিখ্যাত ক্রেটিস, স্টিল্পো এবং অধ্যাপক জেনোক্রেটিস তাঁর শিক্ষক ছিলেন। স্বীয় অধ্যয়ন শেষ করে জেনো এথেন্সে শিক্ষকতা শুরু করেন। জেনোর চরিত্রবল অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আনুমানিক ২৭০ অব্দে আত্মহত্যা করে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জেনোর পর তাঁর শিষ্য ক্লিয়াস্থিস্ বহুদিন পর্যন্ত বৈরাগ্য ধর্ম প্রচারকার্যে লিপ্ত ছিলেন। স্বীয় শিক্ষকের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন না হলেও অত্যন্ত মহৎ চরিত্রবান ও দৃঢ়চিত্ত বলে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ৩৩১ অব্দে তাঁর জন্ম। ২৫১ অব্দে অশীতি বৎসর বয়সে অনশনব্রত পালন করে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

গ্রীক বৈরাগ্য-দর্শন সম্বন্ধে পুরোপুরি জানতে গেলে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এই মত কেবল দর্শন ও নীতিশাস্ত্র নয়। দর্শনের চাইতে এখানে ধর্মতত্ত্বই অধিক আলোচিত হয়েছে। এ ধর্মতত্ত্ব আবার লৌকিক বহু দেবত্ববাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ, এ মতের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে প্রাচীন শেমীয় জাতি ও ইটালীয়দের বংশগত সম্বন্ধ ছিল। তৃতীয়তঃ, এ ধর্ম-দর্শন কেবলমাত্র একজন লোকের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। এ তত্ত্বগুলো বিভিন্ন দেশ হতে নদীস্রোতের মত এসে মিলিত হয়েছিল। এ দর্শনের আরেক বিশেষত্ব এই যে, এই মতে কল্পনার অপেক্ষা সাধনাই অধিক স্থান পেয়েছে।

জেনো ও স্টোয়িকগণ জীবনের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজন মনে করতেন। সত্য মঙ্গলকর ও প্রয়োজন সঠিক বলেই সত্যানুসন্ধান আবশ্যক। সৃষ্টির আদি কারণ অনুসন্ধান এইজন্য প্রয়োজন যে, তা থেকে চরম উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। জ্ঞানই মানবের লক্ষ্য। জ্ঞান কল্পনা ও সাধনাভেদে দ্বিবিধ। কল্পনা-মূলক জ্ঞান ও সাধনামূলক জ্ঞান। কল্পনামূলক জ্ঞান থেকে চিন্তা-শক্তি পরিমার্জিত হয় এবং এ থেকে দ্রব্যসমূহের যথাযথ ধারণা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সাধনামূলক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কারণ এর সাহায্যে মানব বিচারানুমোদিত ন্যায়পথে চলতে পারে। ন্যায়, দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় যে পরিমাণে জীবনের উন্নতি সম্ভব, সেই পরিমাণেই সেসব শাস্ত্র প্রয়োজন-সাধক। ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি আলোচনা থেকে নীতি-বিজ্ঞানের অধিকার জন্মে এবং নীতি-জ্ঞানই চরিত্র উৎকর্ষের উপায়।

বৈরাগ্য-দর্শন দ্বৈতভাবের বিরোধী। প্লেটো ভাব-জগতকে স্থূল জগৎ থেকে পৃথক করায় জেনো মতাবলম্বীগত উক্ত মতের পোষকতা করেননি। ধারণাসমূহের (আদর্শ) অথবা সাধারণ সংজ্ঞাগুলোর বাস্তব সত্তা নেই। তাঁরা বস্তুসমূহের বহির্দেশে (প্লেটো) অবস্থিতি করেন না. আবার তারা বস্তুসমূহের অন্তর্নিবিষ্টও নন (এরিস্টোটল)। অভিজ্ঞতার ফলে দ্রব্যাদির সম্বন্ধে যে মানসিক সংস্কার জন্মে তা-ই ধারণা। অর্থাৎ চিন্তার সারভাগই ধারণা। ধারণার সাথে বাস্তবের সম্পর্ক নেই, ধারণার অর্থে কোন সনাতন সত্য প্রকাশ পায় না। অপরদিকে, আত্মারও স্বকীয় বা স্বভাবজাত সংস্কার নেই। আত্মা নিষ্কলঙ্ক স্ফটিক সদৃশ (Tabula rasa) বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। বহির্জগত কর্তৃক ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনাই সর্ব সংস্কার বা ধারণার মূল। ধারণা মাত্রেরই লক্ষণ এই যে, এর দ্বারা (১) স্থায়িত্ব বা সারবত্তা (Substantiality), (২) গুণ (Quality), (৩) বিকার (Mode of being) এবং (৪) সম্বন্ধ (Relation) প্রকাশ পায়। কোন ধারণার সত্যতা নিরূপণ করতে হলে তাকে

এসব লক্ষণ কি পরিমাণে বিগুমান, তারই বিচার আবশ্যক। অর্থাৎ ধারণাটি কতটুকু স্পষ্ট ও স্বপ্রকাশ, তাই দেখতে হবে। নামমাত্রই যদি কোন দ্রব্যের আসল প্রতিরূপ না হয়, তবে তাকে সত্য ধারণা বলে অভিহিত করা যায় না। পর্বত বা নদী বলতে যদি তাদের প্রতিরূপ মানসপটে পরিস্ফুট হয়, তবেই তাদের সম্বন্ধে ধারণা সঠিক হয়েছে বলতে হবে। বিষয়ানুভূতি থেকে স্মৃতির উদয়। বিষয়ানুভূতি ও স্মৃতির ফলই অভিজ্ঞতা। বিষয়ানুভূতি আলোচনা হতে আমরা যেসব মন্তব্যে উপনীত হই, তা দিয়ে দ্রব্যসমূহের প্রতিরূপ সৃষ্টি হয়। প্রতিরূপ হতে আমরা যে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করি, সেই জ্ঞানের সত্যতা নিরূপণ করতে হলে প্রতিরূপের সাথে বিষয়ানুভূতির কত দূর ঐক্য ছিল, তারই নির্ণয় আবশ্যক। প্রতিরূপ ও সংস্কারের উপকরণ একই। তবে সংস্কারের সাথে সত্যের জ্ঞান বিদ্যমান। জ্ঞানের চারটে পর্যায় বা স্তর আছে : (১) প্রতিরূপ (Sense Presentation), (২) সম্মতি (Assent), (৩) ব্যাপ্তিবোধ (Comprehension) ও (৪) উপলব্ধি (Understanding)। প্রথমতঃ, বিষয়ানুভূতি হতে স্মৃতির উদ্রেক হওয়ার দরুন বিষয়টির একটি মানসিক প্রতিকৃতি বা প্রতিরূপ জন্মে। প্রতিরূপ সত্য হলে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়। তারপর প্রতিরূপ হতে যে সংস্কার জন্মে, তার সম্যক অবধারণকে ব্যাপ্তিবোধ বলা চলে। ব্যাপ্তিবোধের পরবর্তী স্তর উপলব্ধি বা হৃদয়ঙ্গম। যে-কোন বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করি, তার মূলে এই চারিটি মানসিক ক্রিয়া কাজ করেছে।

স্টোয়িক অধ্যাত্মদর্শন প্রত্যক্ষমূলক। মনে হয়, এটা এক প্রকার সাকার শক্তিবাদ। দেহ ও মন একই সত্তার ভিন্নরূপ। সমগ্র বিশ্ব জগৎ সত্যস্বরূপ। ঈশ্বর প্রাণময়, সর্বদর্শী, সর্বভূতে বিগুমান এবং মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। ঈশ্বর প্রেমময় ও লোকহিতৈষী কিন্তু মানব সুখ-দুঃখাদিতে অনাসক্ত। স্টোয়িকগণ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্ব-প্রীতিরও আরোপ করেছেন। তাদের সর্বদেবত্ববাদে (Pantheism) ঈশ্বরের

পরিণামদর্শিতারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মূর্তি-পূজায় স্টোয়িকদের বিশ্বাস ছিল। মোটের উপর, তাদের মত ধর্মভাবোদ্দীপক। স্টোয়িকদের জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে হিরাক্লিটাসের যথেষ্ট মিল রয়েছে। অগ্নিই যে শক্তির মূল কারণ হিরাক্লিটাসের এ মতের সাথে স্টোয়িকগণ একমত। এ জগৎ সর্বব্যাপী অগ্নির লীলাভূমি। এ অগ্নির জলন ও প্রশমন থেকেই যাবতীয় সৃষ্টি-ব্যাপার ও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। জীবন-সংগ্রামের ফলে প্রকৃতির যে অশেষ প্রয়োজন সাধিত হচ্ছে, স্টোয়িকগণ তারও আলোচনা করেছিলেন। ঈশ্বরের রূপ বলে জগৎ পূর্ণতার প্রতিমূর্তি ও অনিন্দ্যসুন্দর। স্টোয়িকদের কল্পিত ঈশ্বর জগতের অণু-পরমাণুগত, সর্বত্র বিদ্যমান, অর্থাৎ জগৎ ও ঈশ্বরের প্রভেদ নেই।

[স্টোয়িকগণ ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল। জরা-মরণ-শোক-দুঃখ-ক্লেশে তারা ভগবানের প্রতি আস্থা হারাতো না। কারণ তারা মনে করতো অনিষ্ট বা অমঙ্গল ব্যক্তিগত, তা দিয়ে সার্বজনীন সুখের ক্ষতি না হয়ে বরং বৃদ্ধিই হয়। ছায়াসম্পাতে চিত্রে ঔজ্জ্বল্য যেমন হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়ে বৃদ্ধি পায়, অনুরূপ দুঃখের সমাবেশে সুখের মাধুর্যও বৃদ্ধি পায়। অন্যায়, ভীরুতা ও অমিতাচারের পাশে ন্যায়, সাহস, মিতাচার অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়। ব্যক্তিগত হিসেবে দুঃখ-কষ্টও অসম্পূর্ণতা, কিন্তু সমষ্টি হিসেবে এদের কোন অস্তিত্ব নেই। সার্বজনীন হিসেবে সবই পূর্ণ, পবিত্র ও উজ্জ্বল; কারণ ভগবান স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম।]

স্টোয়িকগণ ভগবানে চরম বিশ্বাসী। শোক - দুঃখ - কষ্ট - ক্লেশ বেদনা প্রভৃতিতে ভগবানের প্রতি তাদের বিশ্বাস বিন্দুমাত্র নড়বড়ে হতো না বরং এ দিয়ে তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও অটল হতো। কারণ তাদের ধারণা, বাদ্যযন্ত্রের একটা তার নষ্ট হয়ে গেলে যেমন সমগ্র ঐক্যতানটি নষ্ট হয় না বরং সময়ে সময়ে মিষ্ট ও সুরেলা হয়ে উঠে; ছায়ার সান্নিধ্যে আলো যেমন বিচিত্র ও অপরূপ হয়ে প্রকাশ পায়, সুখ-দুঃখ-ক্লেশের সমাবেশেও সুখ মাধুর্যও অপূর্ব হয়ে উঠে। মঙ্গল-অমঙ্গল, সুখ-দুঃখ, হিত-অহিত সবই ব্যক্তিগত। কিন্তু সমষ্টি হিসেবে দুঃখ-কষ্ট বা সম্পূর্ণ এসবের অস্তিত্ব নেই। যা কিছু সার্বজনীন হিতকর,

বা সুখকর, যা কিছু পূর্ণ পবিত্র ও উজ্জ্বল, তারই অস্তিত্ব আছে; কারণ, ভগবান পরম মঙ্গল।

অগ্নিশিখার সাথে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, সমুদ্রের সাথে বারিবিন্দুর যে সম্বন্ধ, অনন্ত বিশ্বের সাথে মানবেরও সে সম্বন্ধ। দেহ বিশ্বোপাদানের অংশ, মানবাত্মা জগতাত্মার তপ্তশ্বাস। স্টোয়িকদের মতে, বাস্তব ও দেহে তফাৎ নেই। আত্মা জড়ধর্মী। কিন্তু পুণ্যবানের আত্মায় শারীরধর্ম কম। সাধারণ লোকের আত্মা জড়ধর্মী বলে দেহের অবসানেই লোপ পায়। কিন্তু সাধু-সজ্জনের আত্মা দেহান্তেও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু প্রশ্ন, তবে কি পুণ্যবানের আত্মা অমর? না, তা নয়। দেহ অবসানের পর আত্মা শত শত বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকলেও আত্মার লয় আছে। এমনকি পরমার্থ ও দার্শনিকের আত্মাও অমর নয়। প্রলয়কালে যাবতীয় দ্রব্যের সাথে আত্মাও সেই সর্বগ্রাসী অনল-প্রবাহে প্রবিষ্ট হয়। একমাত্র ঈশ্বরই অমর। আত্মার লয় আছে, কিন্তু আত্মোপাদানের বিনাশ নেই। যে অনন্ত জীবন প্রবাহ থেকে আত্মার উদ্ভব, পুনরায় তাতেই তার মিলন অবশ্যম্ভাবী।

স্টোয়িকদের মতে, ধর্মার্থ, ও ধর্মচর্চা মানব জীবনের লক্ষ্য। তাদের মতে, যা কিছু কর্তব্য, তাই ধর্ম। ধর্মচর্চা ও কর্তব্য ব্যতীত জগতে মানবের অন্য কোন লক্ষ্য নেই। ধর্মই একমাত্র সুখ লাভের উপায়। ধর্ম নিষ্কাম হওয়া আবশ্যক। তবে, শুধুমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান নিয়েও ধর্মসাধন সম্ভব নয়। ধর্ম-কর্তব্য পালনে আত্মার ঐকান্তিক আগ্রহ না থাকলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। ধর্ম সর্বসদানুষ্ঠানের মূল। জ্ঞান, সাহস, মিতাচার ও ন্যায়-পরায়ণতা এ চারটে গুণ ধর্মচর্চার ফলস্বরূপ আয়ত্ত হয়। এ কয়েকটি গুণের একটিমাত্র আয়ত্ত হলে, অপর গুণগুলো আপনা থেকেই আয়ত্ত হয়। একটির অভাবহেতু অপর সকলেরও অভাব অনিবার্য। ব্যক্তিমাত্রই সর্ববিষয়ে সৎ, না হয় সর্ববিষয়ে অসৎ। কারণ, ধর্ম ও অধর্ম, পুণ্য ও পাপ এদের মাঝে তৃতীয় অবস্থাভেদ নেই। যে-ব্যক্তি স্বীয় আত্মা ও জগতের গূঢ়রহস্য অবলোকন করতে পেরেছেন, তিনিই ধার্মিক ও সিদ্ধকাম। তাঁর বিশ্বাস ঘটনামাত্রই নিয়তির অধীন।

স্বভাব বা নিয়তির মূলে অনন্ত প্রজ্ঞা এবং ঐশ্বরিক বিধান। বিশ্বব্যাপী একমাত্র বিধি নিত্য বিরাজমান। সৃষ্টিমাত্রই এ-বিধির অনুবর্তন করতে বাধ্য। এ-বিধিরই বিধানে মানবের বিবেক-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত। বিবেক-বুদ্ধি এবং জাগতিক নিয়মে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। স্টোয়িকদের দর্শন ও ধর্মমত যতই প্রসিদ্ধি লাভ করুক না কেন, এটার প্রধান ত্রুটি এই যে, এটা একমাত্র শিক্ষিত সমাজেরই উপযুক্ত বলে সাধারণ লোকের মধ্যে তেমন প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করার মত স্টোয়িকদের ধর্মে এমন বিশেষ কিছু লক্ষ্য করা যায় না। এ ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত ও চিন্তাসাপেক্ষ।

সংশয়বাদ বা সন্দেহবাদ (Scepticism) : পিরো (Pyrrho)

গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে সন্দেহবাদের প্রথম বীজ প্রবর্তক হলেন পিরো (Pyrrho)। পিরো খ্রীস্টপূর্ব ৩৬০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলতঃ একজন চিত্রকর। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখা কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায়নি। তাঁর জ্ঞান ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁর প্রধান শিষ্য ফ্লিয়াসের টাইমনের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি। তাঁর দর্শন প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক। দর্শনের ভারসাম্য রক্ষার্থেই পিরো জ্ঞানকে অস্বীকার করে তাঁর সন্দেহবাদের পটভূমি সৃষ্টি করেন নাই; বরং, সন্দেহবাদের মধ্যেই পিরো এ বিপদ-সংকুল পৃথিবীকে এড়িয়ে এক মুক্ত আনন্দের সন্ধান পান।

মুণি-ঋষিদের ব্যবহার-বিধিতে প্রধানতঃ তিনটি প্রশ্ন জড়িত। প্রথমতঃ, বস্তু বা দ্রব্য কি এবং কিভাবে তারা উৎপন্ন। দ্বিতীয়তঃ, এ-দ্রব্যগুলোর সাথে আমরা কিভাবে সম্পর্কিত। তৃতীয়তঃ, তাদের প্রতি আমাদের কি মনোভাব হওয়া উচিত। প্রথম প্রশ্ন : দ্রব্য কি, এর উত্তরে আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে, আমরা কিছু জানি না। দ্রব্য কিভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, আমরা কেবল তাই

জানি। কিন্তু বস্তু বা দ্রব্যের অন্তর্নিহিত রূপ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। একই বস্তু বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। কার মত ও কোন্ জ্ঞান যে সঠিক, তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আমাদের ধারণা আছে সত্যি, কিন্তু কোন্ ও কার ধারণা যে সঠিক, তা নিশ্চয় করে বলা অসম্ভব। সুতরাং বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব সম্পূর্ণ সংশয়পূর্ণ হওয়া উচিত। পিহ্‌রো বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করতেন। বাস্তব সত্তা বলে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সুনিশ্চিত যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা হতে তা জানা যায় না। কোন দুটো দর্শন মতের মূল তথ্যের মধ্যে মিল নেই। অতএব এমন দর্শন চর্চার ফলে, প্রকৃত শান্তি-সুখের পরিবর্তে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহজালেরই সৃষ্টি হয়। আসল কথা, অধ্যাত্মশাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্র বলে কোন শাস্ত্র থাকাও অসম্ভব। কারণ, যে যুক্তি-তর্কের উপর অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই যুক্তি-তর্কের বলেই একই বিষয় সত্য ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে পারে। বস্তুতত্ত্ব অনধিগম্য। অধ্যাত্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ করে সর্বোতভাবে স্বভাবের অনুকরণ করাই মানবের কর্তব্য।

দশম অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক সংশয়বাদ

নব একাডেমী

(New Academy)

আর্কিসিলিয়াস (Arcesilaus)

সক্রেটিস্ হতে যে সংশয়ের উদয় হয়, সাম্প্রদায়িকদের মধ্যেও নব যুগের অধিনায়ক আর্কিসিলিয়াস ও কার্নিয়াডিজ যথাক্রমে তাঁরই পোষকতা করেছিলেন। আর্কিসিলিয়াস নিজে কোন নতুন মতের সৃষ্টি করেননি। শ্রোতৃবর্গ যাতে একাগ্রচিত্ত ও ভাবগ্রাহী হতে সক্ষম হয়, সেদিকেও তাঁর সতর্ক ও প্রখর দৃষ্টি ছিল। শ্রোতৃগন কি প্রকারে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তা করতে পারে, কিভাবে তত্ত্বানুসন্ধান ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, তিনি তাই শিক্ষা দিতেন। তাঁর উপদেশের সারধর্মই ছিল, "কোন বিষয়ই নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করিও না''। জেনোর মতে, "ধারণার স্পষ্টতাই সত্যের মাপকাঠি''। আর্কিসিলিয়াসের মতে, "ইন্দ্রিয়গণ প্রতারক, তারা সময়ে সময়ে এমন ভ্রম জন্মায় যে, তার ফলে অনেক অলীক ধারণারও উৎপত্তি হয়''। সক্রেটিসের উক্তি, "আমি যা জানি তা এই যে, আমি কিছুই জানি না।'' আর্কিসিলিয়াস বলেন, ''আমি যে কিছুই জানি না, তাও বলতে পারি না।'' আর্কিসিলিয়াস তাঁর বিশ্বাস-অনুরূপ কোন নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। তাঁর মতে, অধ্যাত্মবিদ্যায় সত্যের সন্ধান মিলে না। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় সত্যের সন্ধান কিছু পরিমাণে সম্ভবপর। অবশ্য আর্কিসিলিয়াসের পরবর্তী সংশয়বাদী দার্শনিকগণ অধ্যাত্মবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র উভয়ের কোনটিতেই সত্যের সন্ধান পাননি।

কার্নিয়াডিজ (Carneades)

সংশয়বাদের মধ্যে কার্নিয়াডিজ সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খ্রীস্টপূর্ব ২১৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাথে খ্রীস্টপূর্ব

পঞ্চম শতাব্দীর তার্কিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। নীতি, ধর্ম ও তর্কশাস্ত্রে তিনি স্টোয়িকদিগের বিপক্ষতা করেন। আশ্চর্য যুক্তি বলে তিনি স্টোয়িক ধর্মের অসংলগ্নতা দেখিয়েছেন। কার্নিয়াডিজ ন্যায়, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও একই যুক্তি অবলম্বন করেছেন। কথিত হয়, রোম নগরে তিনি একবার ন্যায়পরায়ণতার সপক্ষে ও আরেকবার ন্যায়পরায়ণতার বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, অধ্যাত্ম বা নীতিশাস্ত্রে কোথাও অটুট নির্বিকার ও সনাতন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রমাণের অভাবহেতু কল্পনা ও কার্যক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্যে আমাদেরকে সম্ভাবনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

পরবর্তী সংশয়বাদ ঃ ইনিসিডিমাস ও এগ্রিপা

আর্কিসিলিয়াস ও কার্নিয়াডিজ কেবল ভাষার মারপেঁচের সাহায্যেই তাঁদের স্ব স্ব যুক্তির অবতারণা করে গেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ সন্দেহবাদ বা নাস্তিকতার সাথে যে শরীরবিদ্য-সংক্রান্ত ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যসমূহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, এ কথা তাঁরা উল্লেখ করেন নাই। ঠিক এই শ্রেণীর সংশয়বাদীদের মধ্যে ইনিসিডিমাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনিসিডিমাস ক্রীটের অন্তর্গত নোসাস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিহ্‌রোনিজমের উপর আটখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে কথিত হয়। পিহ্‌রো যে-সমস্ত কারণে অভ্রান্ত সত্য মানবজ্ঞানের অতীত বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন, ইনিসিডিমাসের গ্রন্থে তাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি কারণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হল ঃ

(১) জ্ঞাতার শারীরিক অবস্থা-বৈষম্য ও তার ফলে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সম্বন্ধে একরূপ এবং একই জাতীয় দ্রব্য সম্বন্ধে বিরোধাত্মক জ্ঞানের সৃষ্টি হয়।

(২) জ্ঞাতার দৈহিক গঠন-বৈষম্য। সকল দ্রব্য যদি আমরা একইভাবে অনুভব করতাম, তবে সকলের একই প্রকার প্রতিরূপ (Impression) হত। কিন্তু কার্যতঃ তা হয় না। শারীরিক গঠনানুসারে একজাতীয় দ্রব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান জন্মে।

(৩) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের পার্থক্য। দু'টি পৃথক ইন্দ্রিয়ের উপর পরস্পর বিরোধাত্মক সংজ্ঞার সঞ্চার করে। যেমন, প্রতিমূর্তি দেখতে সুন্দর হলে, স্পর্শে কঠিন।

(৪) জ্ঞাতার অবস্থানুসারে দ্রব্যজাতের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সংস্কার। একই জিনিস বাল্যাবস্থায় যেমন, অধিক বয়সে তেমন বোধ হয় না।

(৫) অবস্থিতি, দূরত্ব ও স্থানীয় সম্বন্ধ কারণে দ্রব্য নিচয়ের বিভিন্ন জ্ঞান গমনশীল জাহাজ দূর হতে নিশ্চল মনে হয়। অভিজ্ঞতার ফলে আপেক্ষিক জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানই লাভ হয় না।

(৬) বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতি দুর্লভ। প্রত্যেক অনুভূতির সাথে হয় বহির্জগতের, না হয় দেহ বা মনের কিছু না কিছু ভিন্নজাতীয় উপকরণ বিদ্যমান থাকে। শব্দসমূহ বায়ুস্তরের গুরুত্বভেদে বিভিন্ন।

(৭) পরিমাণের সাথেও গুণের সম্পর্ক। খাঁটি বিষপানে মৃত্যু ঘটে, আবার অপর দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে পান করলে পীড়ার উপশম হয়।

(৮) দ্রব্যসমূহের পরিবর্তন ও সম্বন্ধই বোধগম্য। দ্রব্যগুলো যে প্রকৃতপক্ষে কি, তা আমরা বুঝতে পারি না।

(৯) অভ্যাস, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সমাজ ও ধর্মবিষয়ক সংস্কার থেকেও সংশয় জন্মে। প্রত্যহ সূর্যোদয় হয় বলে সূর্যোদয়ে বিস্ময়ের কারণ নেই। আমরা সাধারণতঃ দুর্লভ বা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যেরই আদর করি, অনায়াসলভ্য হলে তার বেশী কদর থাকে না।

(১০) ভিন্ন দেশে ভিন্ন ধারণা রীতি-নীতি প্রচলিত। দ্রব্যগুলো যে আসলে কি, তা আমরা জানতে পারি না এবং সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ইনিসিডিমাসের মৃত্যুর পর আগ্রিপা নামে আর এক সংশয়বাদীও ধারণাসমূহের ব্যক্তিগত ভাব ও পরস্পরের সাপেক্ষত্ব বিশদভাবে আলোচনা করে তর্কশাস্ত্রের অসারতা দেখিয়েছেন। সেক্সটাস এম্পিরিকাস সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা গোঁড়া সংশয়বাদী।

একাদশ অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক আন্দোলন

(Scientific Movement)

অবনতির চরম শিখরে পৌঁছে গ্রীকদর্শন যে-সময়ে নীরস ঠোকর সংশয়বাদে পরিণত হয়, ঠিক সেই সময়ে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহে ও মিসরদেশে বিজ্ঞানের অদ্ভূত চর্চা হচ্ছিল। গ্রীস যখন অজ্ঞানতার গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন, সেই সময়ই মিসরে প্রথমবারের মত গণিতশাস্ত্রের আবির্ভাব হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ঐ সময়ে জড়বিজ্ঞান তেমন একটা উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করতে পারেনি। তার একমাত্র কারণ এই যে, ইন্দ্রিয় প্রতারণাপরায়ণ এবং বিচার-বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়জের সংশোধন হয় না; দর্শনের ন্যায় জড়বিজ্ঞানেও এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল। জড়বিজ্ঞান সমধিক বিস্তার লাভ না করার আরো কারণ এই যে, গ্রীকগণ স্বভাবতঃ চঞ্চলমতি-সম্পন্ন ছিল বলে বৈজ্ঞানিক সত্য নিরূপণের একমাত্র অবলম্বন পর্যবেক্ষণ (Observation) পরীক্ষণ (Experiment) সম্বন্ধে যে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তা তাদের মোটেই ছিল না। অপরপক্ষে কুসংস্কার ও গোঁড়ামী নিয়ে তারা সর্বদাই ব্যস্ত থাকত। জড়বিজ্ঞানের পথে শত বাধা থাকা সত্ত্বেও সংখ্যা-গণিত ও গণিত-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই দু' বিষয় প্রধানতঃ বিচার ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র এই দু' বিষয়ই সংশয়বাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। প্রত্যক্ষবাদের প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও দু' আর দু'য়ে মিলে যে চার হয় এবং ত্রিভুজের তিনটে কোণ যে দুই সমকোণের সমান, এ নিয়ে কোন মতভেদ থাকে না। এসব গাণিতিক সত্য স্বতঃসিদ্ধরূপেই গৃহীত হচ্ছিল।

সিসিলী দ্বীপে পীথাগোরীয় সিদ্ধান্তগুলো তখনও বিলুপ্ত হয়নি। খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক তৃতীয় শতাব্দীতে সিরাকিউজবাসী হিকটাস

(Hicetas) এবং আর্কিমিডিজ (Archimedes) এক প্রকার জ্যোতিঃ-শাস্ত্র প্রচার করেন। তাঁদের মতবাদের সঙ্গে কোপারনিকাস (Copernicus) মতের মিল ছিল। জড়বিজ্ঞানের আপেক্ষিক গুরুত্ব আর্কিমিডিস কর্তৃক উদ্ভাবিত হয় (Archimedes Principle)। এ ব্যতিরেকে আর্কিমিডিস 'আতসী-কাচ' (Sun glass) এবং 'লেভার' যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই সময়েই আরিস্টার্কাস (Aristarchas) নামক এক বৈজ্ঞানিক পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র নয় বলে প্রচার করে বেড়ান। তিনি প্রচার করেন যে, পৃথিবীই সূর্যমণ্ডলের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে। সিলিউকস (Selucus) আরিস্টার্কাসের এই নূতন মত গ্রহণ করে তার পুষ্টি সাধন করেছিলেন। কিন্তু স্টোয়িকগণ এই মতবাদকে ধর্মগর্হিত বলে উল্লেখ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টলেমী (Ptolemy) কর্তৃকও এ মতবাদ পরিত্যক্ত হয়। বর্তমান যুগের প্রারম্ভে কোপার্নিকাস, কেপলার এবং গ্যালিলিও আরিস্টার্কাসের মতের সমর্থন না করা পর্যন্ত এরিস্টোটলের মত 'পৃথিবীই জগতের কেন্দ্র' বা (Geocentric) পদ্ধতিকেই চরমরূপে গ্রহণ করা হতো।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে বিশ্ববিখ্যাত আলেকজাণ্ডার কর্তৃক আলেকজেন্দ্রিয়া নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। আলেকজেন্দ্রিয়া টলেমিদের অদম্য আনন্দ-উৎসাহ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষার মূলকেন্দ্র ছিল। প্লেটো এবং এরিস্টোটলের ভৌতিক আত্মা যেন এথেন্সের প্রতি বিরক্ত হয়ে আলেকজেন্দ্রিয়াতে নবজন্ম লাভ করে। এথেন্স-বাসীগণ বিজ্ঞানকে নির্বাসিত করার ফলে এথেন্সের সৌভাগ্য-রবি যেন চিরকালের জন্যে শেষ হয়ে যায়। এরিস্টোটলের প্রতিভা তাঁর শিষ্য আলেকজাণ্ডারে, পরে টলেমী এবং শেষে টলেমী বংশধরদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। মিসরের নতুন রাজধানী আলেকজেন্দ্রিয়ায় তাঁরা যে যাদুঘর নির্মাণ করেন, তা জগতের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিজ্ঞান উন্নতি সাধনে এই জায়গায় যে বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল, তার সাথে কোন বিষয়েরই তুলনা হয় না।

নানান জায়গা হতে বিভিন্ন জাতীয় হাজার হাজার শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্যে এইস্থানে একত্রিত হত। রাজ-সরকারই তাদের এ ব্যয়ভার বহন করতেন। এখানে উদ্ভিদবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে উদ্ভিদ উদ্যান (Botanical garden) বিদ্যমান ছিল। প্রাণী বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য অসংখ্য পশু-পাখী সংগৃহীত হত। তাদের সংরক্ষণের জন্যে ব্যবচ্ছেদ-গৃহ বা খামার (Poultry farm) ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনার নিমিত্ত বিরাট হলঘর বা মানমন্দির ছিল। ভাষা শিক্ষার জন্যে গ্রন্থাগার ছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই গ্রন্থাগারে প্রায় সাত লক্ষ গ্রন্থ বা পুস্তক ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই আলেকজেন্দ্রিয়া নগরেই জ্যামিতি শাস্ত্র ও বিখ্যাত ইউক্লিড ২৯০ অব্দে তাঁর ভুবন বিখ্যাত জ্যামিতি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ যেমন, সঙ্গীত বিষয়ক 'হারমনি' (Harmony), আলোক বিষয়ক 'অপটিকস' (Optics) এবং প্রতিবিম্ব বিষয়ক 'ক্যাটপট্রিক্স'-ও (Catoptrics) এই স্থানে রচিত হয়। রাজকীয় পুস্তকাধ্যক্ষ ইরেটোস্থিনিস (Eratosthenes) আলেকজেন্দ্রিয়া নগরের ঐতিহাসিক, ভৌগলিক এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি নিরূপণ করে গেছেন। পারগার এপোলিনিয়াস এই জায়গাতেই তাঁর 'কনিক সেকসন' সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী রচনা করেন। এরিস্টিলাস (Aristilus) এবং টাইমোকেরাস ও (Timocharus) এই স্থানে অবধারণ-যোগে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তারই বলে জ্যোতিঃশাস্ত্রে হিপ্পার্কাস (Hipparchus) প্রাগয়ন বা মেষ-রাশিতে রবির সামান্য অগ্র-আগমন সম্বন্ধে গণনা করেছিলেন। টলেমীর আলমাগেস্ট (Almagest) নামক গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ভূগোল বিজ্ঞানের রচনাও এই নগরেই রচিত হয়েছিল। কোপার্নিকাস আর্বিভাব-পূর্ব পর্যন্ত আলমাগেস্ট গ্রন্থের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁর ভূগোল চৌদ্দশত বৎসর পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। পৃথিবীর গোলত্ব, সুমেরু কুমেরু বৃত্ত, মেরুদণ্ড, বিষুব রেখা, উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত প্রদেশ, দিবারাত্রের সমতাসূচক বিন্দু, অয়নান্ত বিন্দুদ্বয়, দেশভেদে আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব ধারণা অদ্যাপি বৈজ্ঞা-

নিকদের মধ্যে প্রচলিত, এ সময় হতেই তাদের সূত্রপাত হয়েছিল। রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময়ে ভাষাতত্ত্ব ও কলাবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়। সাহিত্য, ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা এরা প্রত্যেকেই এক একটা বিজ্ঞান বলে পরিচিতি লাভ করে। বাইবেল গ্রন্থ এবং প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। এ ছাড়া, বৌদ্ধ, ইহুদী, গ্রীক, মিসরী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের আদান প্রদান শুরু হয়। এসব কারণে, একদিকে আপেক্ষিক ধর্ম-শাস্ত্রের (Comparative theology) যেমন পুষ্টিসাধন ঘটে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের অনুরাগ বা মিলন হতে এক নতুন মতের প্রচার হয়। এই নতুন মতকেই মিশ্রদর্শন বা (Eclecticism বলা হয়।

ধর্মীয় আন্দোলন
(Religious Movement)

মিশ্রদর্শন (Eclecticism)

আলেকজেন্দ্রিয়ায় বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল তাও বেশীদিন টিকে থাকল না। প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত পর পর নিত্য-নতুন আবিষ্কারের ফলে গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ যে এক জ্ঞানালোকের সৃষ্টি করেছিলেন, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমের প্রবল প্রভাবে সে আলোকও প্রায় নির্বাপিত হয়ে যায়। এসময়ে গ্রীক জ্ঞানালোক, সভ্যতা ও প্রতিভায় সত্য সত্য ভাটা পড়ে। সাহিত্য ও কলাবিদ্যা প্রায় নির্জীব হয়ে পড়ে। এসময় দর্শন সংশয়বাদের হাতে পড়ে অবহেলিত হচ্ছিল। বিখ্যাত চিকিৎসক গেলেন এবং জ্যোতির্বিদ টলেমীর পর জড়-বিজ্ঞানের আর কোন উন্নতি হয়নি। ধর্মীয় ব্যাপারেও প্রাচীন খ্রীস্টীয় সমাজের গোঁড়ামীতে মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারল না। এমন কি এ সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হতে লাগল। নীতি বিজ্ঞান যদি ধর্মের

স্থান অধিকার করত, তবুও, উপকারের কিছু সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাও হল না। একদিকে এপিকিউরীয়দের অবিরাম সুখ-বিলাস, অপরদিকে স্টোয়িকদের কঠোর আত্মসংযম ও আত্মশাসন, এ দুই চরম নীতির ঘাত-প্রতিঘাতে নীতি-বিজ্ঞান তখন হাবুডুবু খাচ্ছিল। কেবল মাত্র নীতি চর্চায় পরমার্থ লাভ হল না। নীতি-জ্ঞানের আলোকে মানুষ যতই আদর্শকে পেতে চেষ্টা করল, আদর্শ যেন ততই দূরে সরে যেতে লাগল। গ্রীকগণ এ ঘোর ঘনঘটা অবস্থায় পুনঃ শক্তিলাভের আশায় আর একবার অতীতের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। এ সময়ে গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ সংশয়বাদের প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাঁরা নিজেরা নতুন কিছু আবিষ্কারে সমর্থ হল না। ফলে, তাদের এমন অবস্থা হল যে, তাঁরা যে কোন মত যুক্তিপূর্ণ বা গ্রহণযোগ্য মনে করল, তাই অনুকরণ করতে শুরু করল। একাডেমী, লিসিয়ম এবং স্টেয়ো প্রভৃতি আদি ও প্রাচীন সম্প্রদায়গুলোর প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিন শতাব্দী পর্যন্ত বিবাদের ফলে তারাও ঐক্যভাবাপন্ন হয়। অবশেষে তাদের মতসমূহ পরস্পরের সাথে এমনভাবে মিলিত হয় যে, তাদের কারো কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না।

গ্রীক প্রতিভার অবনতিই যে এ ঐক্যের একমাত্র কারণ, তা নয়। ইহুদীদের ধর্ম-প্রভাব যতদিন পর্যন্ত তাদের জাতীয় গণ্ডীর ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন পর্যন্ত এর কোন প্রভাব বহির্জগতে পরিলক্ষিত হয় নি। আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো (Philo) কালক্রমে মুসার মতের সঙ্গে প্লেটোর উপদেশাবলীর এক ঐক্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হলেন। যিশু তাঁর প্রিয় শিষ্য টরসাসের পল (St. Paul of Tarsus) যখন ইহুদী ধর্মের জাতীয় আবরণ উন্মোচন করে দেন, সে সময় আর সম্মিলিত গ্রীস্-রোম রাজ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রসারের আর কোন বাধা রইলো না। সাধারণ মানুষের মন পূর্ব থেকেই একেশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে ছিল। পেরিপেটেটিক দর্শনে এবং রোমে স্টোয়িক মতে একেশ্বরবাদের

প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও তাদের মত সাধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে নি। কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকই তাঁদের মতবাদের প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করতে পেরেছিল। খ্রীস্টধর্ম প্রকৃতই এই সার্বজনীন একেশ্বরবাদের অভাব মিটিয়ে দেয়। ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, যুবা-বৃদ্ধ-শিশু সবাইকেই সাদরে গ্রহণ করলেন এবং সবাই তাঁর মতের উদারতায় যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। খ্রীস্টধর্ম এ অসাধারণ উদারতার জন্য প্রাচীন মতসমূহের সংকীর্ণতা কাটিয়ে নতুন এক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল।

এ সময় মানুষ বাইবেল প্রচারিত প্রেরিতপুরুষ বা দেবদূতকে বাদ দিয়ে পীথাগোরাস এবং প্লেটোকে উপাসনা করতে লাগল। ইহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মের ঈশ্বর বা ভগবানের জায়গায় এরিস্টোটল, সক্রেটিস ও জেনো ফিনিসের প্রচারিত ভগবান স্থান পেল। সর্বদেবত্ববাদের এক ধারণা এ সময়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এ সর্বদেবত্ববাদের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এটা কেবল দেবতা-সংস্কার ছিল না। এতে এক সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি বিরাজ করছিল। দেবদূতগণ এ মহাশক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ বা তাঁরই অন্তর্ভূত বলে মনে করা হত। সর্বদেবত্ববাদের এরূপ বিশ্বাস অবশেষে খ্রীস্ট্রীয় 'নস্টিক' সম্প্রদায়ের 'ঈয়ন' (Eons) ইহুদী 'কেবালিস্ট' পণ্ডিত সমাজের 'সেফিরথ' এবং ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্রের 'হাইপোস্টাসিস' এ তিন তত্ত্বের স্থান অধিকার করে। 'ঈয়নের' মতে এক অনন্ত মহাসত্তা সর্বভূতে বিদ্যমান থেকে স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি ও শাসন করছেন। 'কাবালা' ধর্মগ্রন্থে দশ সংখ্যায় ঈশ্বরের নাম ও অস্তিত্ব সূচিত হয়। হাইপোস্টাসিসে ঈশ্বরের ত্রিমূর্তির (Cristian Trinity) প্রত্যেক মূর্তির বাস্তব ও ভিন্ন অস্তিত্বে বিশ্বাস। গ্রীক কথায় ও চিন্তায় সত্য ও সুন্দর, কুৎসিত ও কদর্য, আত্মিক ও নৈতিক অবনতির যে বিভেদ বিদ্যমান ছিল, খ্রীস্টধর্মের প্রভাবে সে পার্থক্য ক্রমান্বয়ে চলে যেতে লাগল। সৎ মানেই শক্তি বা রূপ ও আদর্শের ক্রিয়া বলে পরিগণিত এবং অসৎ মাত্রই রূপ বা আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী বা জড়ের ক্রিয়ারূপে গণ্য হতে লাগল। কোন

কোন চিন্তাবিদ মনে করলেন, ভগবান জড় ও চৈতন্য উভয়েরই কারণ। কিন্তু সে কারণের সাথে জড় ও চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। ভগবান নির্বিকার। জগতের কোন কিছুতেই তাঁর সংশ্রব নেই। ভগবান জগতের স্রষ্টিকর্তা। তিনি নির্লিপ্তভাবে জগতের বহির্ভাগে অবস্থান করছেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত ভগবানকে শক্তিস্বরূপ বলে গণ্য করলেন। কিন্তু ভগবান বা ঈশ্বর জড় ও চৈতন্যের মিলনগ্রন্থি বা সন্ধিস্থল বলে স্বীকার করতে পারলেন না। তাঁদের ধারণা, জড় চৈতন্যের বিরোধী। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। জড় ভগবানের কৃত নয়। জড় ঈশ্বরের সমসাময়িক এবং শক্তিতে তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এখানেই দ্বৈতবাদ (Dualism) দৃঢ়ভাবে বিরোধী সম্প্রদায়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 'নস্টিক' দলের ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর যদি কেবল নিষ্পাপ হন, তবে তিনি জড় বিবর্জিত। জড় যদি সব কিছুর অনিষ্টের কারণ হয়, তবে দেহী জীবমাত্রই পাপকলুষিত। জগতে দেহ বা শরীরই যদি পাপের মূল কারণ হয়, তবে জ্ঞানী ও সাধকগণ জীবনের ভোগ-লালসা থেকে বিরত থেকে সংযমপূর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য থাকবেন। ফলে দেহের নির্যাতন ঘটবে। খ্রীস্টানদের সঙ্গে প্লেটোনিকদের এ স্থলেই মতভেদ বা অনৈক্য দেখা দেয়। কারণ, প্লেটোনিক সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী দেহ না থাকলেও আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু খ্রীস্টানগণের ধারণা, মৃত্যুর পর জীব নবজীবন লাভ করবে, তবে দেহ ব্যতীত আত্মার অবস্থিতি সম্ভব নয়। প্লেটোনিক গোষ্ঠী দেহহীন আত্মার অবিনাশিত্বে বিশ্বাসী; অপরদিকে দেহ ব্যতিরেকে আত্মার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে খ্রীস্টানগণ মনে করেন না।

প্রাচীন ও নব মতবাদের মধ্যে মূলতঃ যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, প্রাচীনপন্থিগণ এ সময় থেকে তাদের গোঁড়ামীকে কিছুটা শিথিল করে দিয়ে নব মতবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হল। নব-মতবাদের সঙ্গে এখন তাদের মতের সামান্য মিল বা সঙ্গতি থাকলেই তারা ঐ মতবাদকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে লাগল। খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মূসা, ঈসা এবং সেন্টপলকে অরফিউস, পীথাগোরাস

ও প্লেটোর সঙ্গে একাসনে স্থান দিলে উভয় দলের প্রভেদ ঘুচে যেতে লাগল। প্রাচীন গ্রীসের মনস্বীদেরকে বাগদেবীর প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করলে উভয় দলের বিবাদ ভঞ্জন হত। এ সময় হতে সব ধর্মই এক বলে মনে হতে লাগল। সব ধর্মেরই মূলে অবতার স্বীকৃত হল। ঈশ্বর-বাক্যই সব ধর্মের মূল। তবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা জাতিগত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির জন্য হয়ে থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। মডারেটাস (Moderataus) নাইকোমেকাস (Nicomachus) এবং নিউমিনিয়াস (Numenius) প্রমুখ উদার প্রকৃতির ভাবুকগণ মূসাকে ইহুদীদের প্লেটো ও প্লেটোকে গ্রীসীয় মূসা বলতে অধিক পছন্দ করতেন। উভয় দলের মধ্যে এ সাম্যভাব কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হল না। কয়েকজন গ্রীস্টান চিন্তাবিদ ভিন্ন বিরোধী দলের অনেক লোকই মিশ্র-দর্শন রীতির বিরোধিতা করতে লাগল। তারা প্লেটোর মতের কোন কোন অংশ সত্য বলে গ্রহণ করলেও সে মতের মৌলিকতায় সন্দিহান হয়ে উঠল। তাদের ধারণা, প্লেটোর মত বাইবেল থেকেই গৃহীত হয়েছে।

গ্রীক দার্শনিকগণ গ্রীস্টধর্ম ব্যাপারে কোন মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে এখন আর তাদের প্রাচীন প্রথানুসারে তর্ক বা বাক্‌বিতণ্ডা করেন না। সর্বক্ষেত্রেই একটা সমঝোতা রক্ষা করে চলতে থাকল। কেউ প্রকাশ্যে প্রাচীন প্রথানুসারে তর্ক বা বাকবিতণ্ডা করলেও তাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হত। কয়েকজন শিক্ষিত, স্বাধীন ও উদারচেতা গ্রীস্টান ব্যতীত অন্যান্য সব লোকই ইহুদীদের মত যে দর্শনের সঙ্গে গ্রীস্টধর্মের মূল তত্ত্বের মিল বা সঙ্গতি না থাকত, সে দর্শনকে দর্শন বলে গ্রহণ করতে আপত্তি জানাল। যে ধর্মীয় বাক্যের সঙ্গে বাইবেল-বর্ণিত ঈশ্বর-বাক্যের গরমিল থাকত, তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারল না। তখন সামাজিক পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, ধর্ম বা দর্শন সম্বন্ধে মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হলেই বাইবেলের প্রসঙ্গ টেনে আনা হত। অথবা নিজ নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে গ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে হত। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ

বিচার-বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাসম্মত যুক্তিতর্কে মানুষের মন গলত না। সব যুক্তি-তর্কের মূলেই খ্রীস্টধর্মের প্রসঙ্গ থাকা চাই। খ্রীস্টধর্ম প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে কোন যুক্তি-তর্ক তর্ক বলে বিবেচিত নয়, অথবা, সে যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে, তৎকালীন দার্শনিকগণকে অত্যন্ত উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে প্লেটো, এরিস্টোটল প্রমুখ প্রাচীন চিন্তাবিদদের গ্রন্থাবলী নতুন করে পাঠ করতে এবং তাদের নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী প্রচার করতে দেখা যায়। মূলগ্রন্থ অধ্যয়নে তাঁদের এ নব-উদ্যমে গোঁড়ামীর প্রভাব থাকলেও গ্রীক দার্শনিকদের নব প্রকাশিত গ্রন্থমালা সৌন্দর্যে, ভাবে ও ভাষায় প্রায় বাইবেলেরই তুল্য হয়। এ গ্রন্থাবলী যেন প্রকৃতই নির্মল ও পুণ্য গ্রন্থবিশেষ। এ পূত-পবিত্র গ্রন্থের প্রতি লোকে এমন আসক্ত হয়ে পড়ে যে, এ গ্রন্থ যে মানুষের সৃষ্টি, এ ধারণাই হয় না। মানব যে এমন গ্রন্থ রচনা করতে পারে, এমন বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন হয়ে পড়ে। পুস্তকের প্রতি ছত্রে ও শব্দে এ ঐশ্বরিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যিক, বৈয়াকরণিক ও সমালোচক সবার মধ্যেই পুস্তকের সংস্কার, সংশোধন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠাকল্পে এক প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হল। তাঁরা যে প্লেটোর চিন্তাপদ্ধতিকেই অনুসরণ করলেন, তা নয়। তাঁরা প্লেটোর লিখন-পদ্ধতিকেও অনুসরণ করতে থাকলেন। গ্রীক-চিন্তাবিদদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা ভাবের সঙ্গে ভাব প্রকাশের রীতিনীতি ও বাগ্‌ধারাকেও সমান আদর করতেন। অলসিনিয়স (Alcinous) এবং এটিকাস (Atticus) প্লেটোর গ্রন্থের টীকা বের করলেন। এফ্রোডিসিয়াসের আলেকজাণ্ডার এরিস্টোটলের গ্রন্থাবলীর বিশ্লেষণের জন্য তাঁর সমগ্র জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়োজিত করেন।

"প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি তৎকালীন লোকদের এমনই আসক্তি জন্মে যে, প্লুটার্ক এবং অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিত মহাত্মা প্লেটোর রূপক কাহিনীর প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করতে না পেরে স্বয়ং প্লেটোকেই সাধারণ লোকের ন্যায় ঈশ্বরের অবতাররূপে প্রচার করতে লাগলেন। তাঁরা প্লেটোকে ঈশ্বরের প্রেরিত দেব-পুরুষ

হিসেবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। অন্যদিকে আলেকজান্দ্রিয়ার নব-প্লেটোবাদের প্রতিষ্ঠাতা এমোনিয়াস সাক্কাস (Ammonius Succus), প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য বিষয়ক পুস্তক প্রণেতা লঙ্গিনাস (Longinus) এমোনিয়াসের শিষ্য ঈরিনিয়াস (Erinnus) এবং সবশেষে লিকোপলিস অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ প্লটিনাস (Plotinus) প্রতিভার অবতার এথেনীয় পণ্ডিত প্লেটোর গভীর ভাবসমুদ্রে প্রবেশ করতে সমর্থ হন। তিনি প্লেটোর ধারণাসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম হন। ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে প্লেটো যে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করেন, প্লটিনাস তা-ই সহজলভ্য করে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ধারণাসমূহ প্রকাশের পক্ষে ভাষার যে অসম্পূর্ণতা ছিল, প্লটিনাস তা দূরীভূত করেছেন। গত দশ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক চিন্তাবিদদের মধ্যে যে ভাবের বন্যা ছুটেছিল, নব-প্লেটোবাদে (Neo-Platonism) এবং প্লটিনাস-দর্শনে সে ভাবেরই যেন পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে। তারা মানবাত্মা, জগত ও ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা সঠিক ও যথার্থ ধারণা দিতে সক্ষম হয়। ফলে নৈরাশ্যবাদ হতে আশাবাদের দিকে মানুষের মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

নব্য-প্লেটোবাদ (Neo Platonism)

অবনতির পথে অবতরণ করতে করতে গ্রীকদর্শন যে সময় নীরস কঠোর সন্দেহবাদে পরিণত হয়ে স্বয়ং প্লেটোকে সাধারণ লোকের মতই ঈশ্বরের অবতাররূপে প্রচার করতে থাকে, ঠিক সেই সময় আলেকজান্দ্রিয়ার নব-প্লেটোনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আমোনিয়াস সাক্কাস, লঙ্গিনাস, ঈরিনিয়াস এবং সর্বোপরি লিকোপলিসবাসী প্লটিনাস প্রতিভার অবতার প্লেটোর পাণ্ডিত্যের গভীর ভাব-সমুদ্রে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। এ মনীষীদের গভীর তাত্ত্বিক আলোচনায় প্লেটোর রূপক ধারণাসমূহ যথাযথরূপে প্রকাশের পক্ষে ভাষার যে অসম্পূর্ণতা ছিল, তা দূর হয়ে যায়। গত দশ শতাব্দী যাবৎ গ্রীক পণ্ডিত সমাজে যে ভাবের বন্যা ছুটেছিল, নব-আদর্শবাদে এবং প্লটিনাসের দর্শনে সেই ভাবের পুনরভিব্যক্তি হয়।

প্লটিনাস (Plotinus)

প্লটিনাস আলেকজান্দ্রিয়াবাসী আমোলিয়াস সাক্কাসের শিষ্য। মিসরের অন্তর্গত লিকোপোলিস নগরে তাঁর বাসস্থান। আনুমানিক ২৪৪ খ্রীস্টাব্দে রোম নগরে গিয়ে প্রায় পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি দর্শন শিক্ষা দেন বলে কথিত হয়। রোমে তিনি যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে বহু দেশের লোক শিক্ষা লাভ করে। চিকিৎসক, বক্তা, কবি ও সিনেটর প্রমুখ উচ্চপদস্থ এমন কি সম্রাট গ্যালিনাস পর্যন্ত সেই বিদ্যামন্দিরে উপনীত হন বলে প্রচলিত আছে। প্রাচীন দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্লটিনাসের বিদ্যামন্দিরে সুরক্ষিত হয়। প্লটিনাস পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। তিনি মোট চুয়ান্নটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। এই পুস্তকগুলো তাঁর শিষ্য পরফিরি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

প্লটিনাসের মতে, এ শিথিল বিশ্ব এক অনন্ত মহাসত্তার প্লাবনধারা এবং ঈশ্বরের পুনর্মিলনই তাঁর চরম উদ্দেশ্য। প্লাবনে তিনটি পর্যায় নিরূপিত হয়েছে : (১) শক্তিমত্তা, (২) সজীবতা, (৩) শারীরত্ব। পুনর্মিলনও যথাক্রমে (১) বিষয়জ্ঞান, (২) বিচার এবং (৩) তত্ত্বদর্শন—এ তিন পর্যায়ে বিভক্ত। এবার তাদের মোটামুটি আলোচনা করা যাক।

ঈশ্বর (God)

বস্তুমাত্রই জড় ও রূপের সমাবেশ। ঈশ্বর (এক বা ঐক্য) এবং জড় নিখিল সৃষ্টির মূলকারণ। ঈশ্বর ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর বস্তুমাত্রেরই উৎপাদক এবং জড় বস্তুমাত্রেরই উপাদান। ঈশ্বর স্বয়ং শক্তি বলে কর্তা, জড় শক্তিসম্পন্ন বলে কর্ম। জড় যদিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা মূর্তিগ্রহণে সমর্থ তথাপি প্লটিনাসের মতে-জড় ও শক্তির মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। বস্তুবিশেষের বিশ্লেষণ করতে করতে যখন চরমসীমায় উপনীত হওয়া যায়, তখন জড় আর শক্তিতে কোন বিরোধ থাকে না। চরম পর্যায়ে এক ভিন্ন দু' নেই এবং সেই 'একই' শক্তি বা ঈশ্বর।

ঈশ্বর বলতে যে ঐক্য বা একের জ্ঞান উদ্ভব হয়, সেই ঐক্য বা এক সংখ্যাবাচক নয়। এই ঐক্য বা এক দিয়ে কোন সংখ্যা প্রকাশ পায় না। সংখ্যাবাচক এক হতে 'বহু'র ধারণা হয়। যে ঐক্য হতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবধারিত হয়, তা সংখ্যামালার আদিসংখ্যা 'একে'র ন্যায় বিভাগশীল নয়। তার পরিমাণ সংখ্যায় প্রকাশ পায় না। সৃষ্টিমাত্রই যা বোঝায় এই একেও তাই সূচিত হয়। এই 'এক' ও অনন্তে কোন ভেদ নাই। অনন্ত বিশ্ব একেরই নামান্তর। এই 'এক' যাবতীয় বস্তুর উৎপাদক অথচ কাহারও উৎপাদ্য নয়। এই 'এক'ই বিশুদ্ধ-চৈতন্য (pure-conscious)।

ঈশ্বর বলতে যে অনন্ত ঐক্য বা সামঞ্জস্য সূচিত হয়, তা সর্বমঙ্গলের মূলীভূত কারণ হলেও ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় কারও শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। বুদ্ধি, সৌন্দর্য ও মঙ্গল ঈশ্বরের গুণ নয়, বরং এ তিন বস্তু নিয়েই ঈশ্বরের অস্তিত্ব। ঈশ্বরের অনুভবশক্তি আছে বললে তাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব স্পর্শে এবং তাঁর অনন্তত্ব ও নিরপেক্ষতার হানি হয়। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে আত্মাবধারণের (self consciousness) মূল্য আছে কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তার মূল্য নেই। মূল্য নেই বলেই যে তিনি অচেতন, তা নয়। তিনি চেতন ও অচেতনের অতীত। চেতন ও অচেতন বলে ঈশ্বরে কোন বিরুদ্ধ ভাব নেই। তিনি স্বয়ং শান্তি, সন্তোষ ও আরাম। তিনি একাধারে সব, অথচ কিছুই নন। পরম ঐক্য, পরম মঙ্গল, শুদ্ধ চৈতন্য ও পূর্ণতা প্রভৃতি যে কয়টি শব্দ প্লটিনাস ঈশ্বরের প্রতি ব্যবহার করেছেন সেটা গুণপ্রকাশক—ঈশ্বরের প্রতি প্রযোজ্য নয়। ভাষায় ঈশ্বরের পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা, চিন্তায়ও তার রূপ কল্পনা অসাধ্য। ঈশ্বর 'আছেন' বলাও অন্যায় কারণ, ঈশ্বর সত্তাভাবেরও অতীত। নব-প্লেটোবাদের মতে ঈশ্বরের স্থান প্লেটোর আদর্শেরও উপরে এবং মানব ধারণারও অতীত। কেবলমাত্র, চিন্তায় তাঁর রূপ কল্পনা অসাধ্য।

কিন্তু প্রশ্ন, এ নিরপেক্ষ 'এক' হতে কি ভাবে বিশ্ব বা জগতের সৃষ্টি হল? এ প্রশ্নের উত্তরে প্লটিনাস কতকগুলো দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেন। সূর্যরশ্মি যে ভাবে সূর্য থেকে নিঃসৃত হয়, অগ্নি

যে ভাবে তাপ বিকীরণ করে, নিরপেক্ষ এক অনন্তশক্তি ঈশ্বর থেকেও সেভাবে বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিত্ব সত্তার চরম রূপ নয়। এ ভাবটি ঈশ্বর হতে উদ্ভূত হয়ে পুনরায় ঈশ্বরেই লীন হওয়ার সেতুবিশেষ। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ঈশ্বর হতে উদ্ভূত হয়ে আবার ঈশ্বরে মিলিত হওয়ার হেতু কি? যে ঈশ্বর হতে বস্তুজাতের উদ্ভব হচ্ছে, সে ঈশ্বর কেবলমাত্র অনন্ত শক্তিরূপে বিরাজিত। আবার যে ঈশ্বর মিলন-গ্রন্থি বা চরম লক্ষ্য তিনি অনন্ত শক্তি নন, তিনি পূর্ণব্রহ্ম। প্লটিনাসের মতে, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম (absolute) একশক্তির এ দু'রূপ। নিরাকার চৈতন্য হতে অনন্ত গুণসম্পন্ন ভগবানের অভিব্যক্তিই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তবে কথা হল, চিন্তা, ধ্যান ও সজ্ঞা (Intuition) ব্যতীত এ প্রত্যাবর্তন বা মিলন অন্য কোন উপায়ে সিদ্ধ হয় না। অনুভূতি, দর্শন ও অনুভাবন ব্যতীত জগতের অন্য কোন ক্রিয়া নেই। এ তিন ক্রিয়া নিয়েই জীবন। সমস্ত কিছুই 'এক' কে অনুসন্ধান করে ফিরছে। জীবনের সঙ্গে চিন্তার পার্থক্য নেই। ধ্যান, চিন্তারই পরিণতি। এ স্তরে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় বলে ধ্যান বা সমাধি এবং ঈশ্বরের স্বরূপেও পার্থক্য নেই। এ দিকে আবার জগত ও ঈশ্বরে প্রভেদ নেই, কারণ জগতই ঈশ্বর। তাই যদি হল, তবে এরিস্টোটলের মতে ঈশ্বরকে কেবল চিন্তা বলতে আপত্তি কি? সত্য যে ঈশ্বর স্বয়ংই তাঁর চিন্তার বিষয়, নিজে নিজেরই ধ্যানে মগ্ন। ঈশ্বর যাবতীয় বিবেক-বুদ্ধির মূল কারণ, কিন্তু আমরা সেই কারণকে দেখতে পাই না।

সত্তারঅবস্থাত্রয়

(১) বুদ্ধি (Intelligence)—ঈশ্বরের আত্ম-বিম্ব ধারার প্রথম ধারা বুদ্ধি। প্রথম ধারা বলে সারবত্তায় বুদ্ধির তুল্য আর কিছুই নেই। সৃষ্টিকে এক হিসেবে চৈতন্য স্বরূপের পতন বলা চলে। এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর বুদ্ধিতেই দ্বিধা বিভক্ত হন। দু'ভাগের এক ভাগ কেবল বুদ্ধি বা চেতস (Wous) রয়ে যায়, অপরভাগ বোধিগত জগতে (Intelligible world)

পরিণত হয়। আধুনিক পরিভাষায় এ দু'পদার্থের একটিকে ব্যক্তি, অপরটিকে বস্তু (জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়) উপাধি দেওয়া হয়েছে। দ্বিধা বিভক্ত হয়েও, এ স্তরে উভয়ে এভাবে বিদ্যমান যে একের অভ্যন্তরেই যেন অপরের অবস্থিতি। বিশ্বের আদর্শ, রূপ বা ধারণাগুলো বীজরূপে বুদ্ধিতে উৎপন্ন হয়ে বুদ্ধিতে লীন রয়েছে। বুদ্ধি এ স্তরে বীজরূপ আদর্শ হতে পৃথক নয়। কেমন করে যে এ স্তরের উদয় হল, কেমন করে যে 'এক' হতে বুদ্ধির প্রথম স্ফূরণে দু'য়ের উৎপত্তি হল, প্লটিনাসের সৃষ্টিতত্ত্বে তার ব্যাখ্যা নেই।

প্লটিনাসের মতে, আদর্শগুলো দু'ভাগে বিভাজ্য। প্রথমতঃ, জাতি সম্বন্ধে আদর্শ, দ্বিতীয়তঃ শ্রেণী সম্বন্ধীয় আদর্শ। জাতিবাচক আদর্শ বলতে কেবল সত্ত্ব, সমত্ব, বিষমত্ব, বিরাম ও গতি পদার্থের এ কয়টি সার্বজনীন ধর্ম প্রকাশিত। শ্রেণীবাচক আদর্শ হতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বস্তুসমূহে স্বতন্ত্র আকার ও অবয়ব প্রতিপন্ন হয়। সাধারণ ও বিশেষের যে সম্বন্ধ, জাতিবাচক ও শ্রেণীবাচক আদর্শেও সেই সম্বন্ধ বিদ্যমান। শ্রেণীবাচক আদর্শসমূহ জাতিবাচকের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ বিশেষ বস্তু থেকে শ্রেণীর জ্ঞান, শ্রেণীর জ্ঞান থেকে জাতির জ্ঞান এবং জাতির জ্ঞান হতে সর্বশেষ আদর্শ বিশ্বের জ্ঞান জন্মে। জাতিবাচক আদর্শ থেকে যেমন শ্রেণীবাচক আদর্শের উৎপত্তি, সক্রেটিস, প্লেটো প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-আদর্শও আবার তেমনি শ্রেণীবাচক আদর্শ হতে উদ্ভূত হচ্ছে। আদর্শ ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন হয় না। যতগুলো জীব, ততগুলো আদর্শ। প্রশ্ন, জীব যেমন অসংখ্য, আদর্শগুলোও কি তেমনি অসংখ্য? প্লটিনাস বলেন, মানবের গণনায় আদর্শগুলো অসংখ্য হলেও ঈশ্বরের গণনায় নিশ্চয়ই তাদের সংখ্যা আছে। জীবের ভেতর দিয়েই প্রত্যেক স্বতন্ত্র আদর্শের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(২) আত্মা—বুদ্ধি হতে যে বিম্ব বা জ্যোতিঃ নিঃসৃত হচ্ছে, তাতেই আত্মার উদ্ভব। আত্মার স্বভাবও বুদ্ধির অনুরূপ। তবে শক্তিতে আত্মা বুদ্ধি থেকে হীন ও নিস্তেজ। কারণ, আদর্শগুলো সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বুদ্ধির

অধিগম্য। বুদ্ধি ও আদর্শের মধ্যে তৃতীয় স্তর ব্যবধান নেই। আত্মার পক্ষে আদর্শ লাভ করতে হলে চেষ্টা ও অনুধাবন প্রয়োজন। সমাধি-বলে আত্মা আদর্শের স্তরে উপনীত হতে পারে, কিন্তু আদর্শকে পায় না। আদর্শের সামান্য ছায়া বা ধারণা নিয়েই আত্মাকে নিবৃত্ত থাকতে হয়। বুদ্ধির ন্যায় প্রত্যক্ষ-দর্শন আত্মার স্বভাবজাত ধর্ম নয়। আত্মা বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধির যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, আত্মাও সেইরূপ বুদ্ধির সাথে মিলন প্রয়াসী। আত্মা ও বুদ্ধিতে পার্থক্য এই যে, বুদ্ধিতে যা স্বভাব, আত্মার তাতেই পরিণত উদ্দেশ্য। আত্মা যোগবলে একদিকে আপনাতে আদর্শসমূহের অস্তিত্ব অনুভব করছে, আবার অন্যদিকে, কর্মের শক্তির কারণে বিভিন্ন জীবদেহে সংক্রমিত হচ্ছে। বুদ্ধি ও আত্মা উভয়েরই দ্বিবিধ স্বভাব; একটি চিন্তা-প্রবণ, অপরটি কর্মপ্রবণ; অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন।

(৩) দেহ—দেহ নিরপেক্ষ 'এক' হতে বহু দূরে হলেও, দেহে নিরপেক্ষ একের সাদৃশ্য বিদ্যমান। বুদ্ধিতে যেমন বুদ্ধির আদর্শ, আত্মায় যেমন আত্মার সংস্কারসমূহ লীন হয়ে থাকে, দেহেও তেমনি দেহের রূপ ব্যপ্ত রয়েছে। রূপই দেহের সঙ্গে নিরপেক্ষ একের সংযোগসূত্র রূপ দিয়েই দেহ উচ্চ হতে উচ্চতর সত্তার ভিতর দিয়ে সর্বশেষ নিরপেক্ষ সত্তার সাথে সংযুক্ত। জীবদেহ একাধারে নিরপেক্ষ সত্তা, অপরদিকে কেবল উপাদান। এ দু'প্রান্তের মধ্যে জীবদেহসমূহ বিবিধ নামে বিবিধ মূর্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে, এ দু'প্রান্তের মধ্যেই পরিবর্তন ও সৃষ্টি।

দেহস্তরের পরবর্তী স্তরই জড়। এ স্তরটি যে প্রকৃতপক্ষে কি, তা জানা অত্যন্ত কঠিন। মনে হয়, এ যেন এক তমোময় অতল গর্ভ। জড় স্বয়ং দেহ নয়; জড় ও রূপের মিলনেই দেহের উৎপত্তি। দেহে যে জড়তার ভাব, সেই ভাবই জড়ের লক্ষণ, জড়ের রূপ বা অবয়ব কিছুই নিজস্ব নয়। অতলগর্ভ একেবারে শূন্য-গর্ভ নয়। এটা এমনই এক বস্তু যার প্রকৃতি কল্পনা-বহির্ভূত হলেও এর অস্তিত্ব আছে। এটার প্রভাব শুধুমাত্র দেহেই নয়, বুদ্ধিতে এবং আত্মাতেও বিদ্যমান। প্রশ্ন, তবে কি জড় প্লটিনাসের দ্বিতীয় সত্তা? প্লটিনাসকে সময়ে সময়ে গোঁড়া দ্বৈতবাদী বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। জড় অর্থে তিনি

যা বুঝেছেন, তা হল জড় দেহ বা দ্রব্য মাত্রেরই আদি কারণ (first-cause) রূপে ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন (Identical)। প্লেটোর ভাববাদে জড় যে কেবল অনন্ত আখ্যা পেয়েছিল, এরিস্টোটলের অনুকরণে প্লটিনাস কর্তৃক তাই এবার অনন্ত সামর্থ্য, অনন্ত উৎপাদনশীলতা এমন কি ঈশ্বরের ক্রিয়াত্মিকা শক্তিতেই পরিণত হল। শক্তির চরমাদর্শই সামর্থ্যের চরমাদর্শ (potentiality)। কিন্তু প্রশ্ন, কেমন করে তা হল? কেমন করেই বা পরম 'এক' হতে 'বহুর' বিকাশ হল। প্লটিনাসের সৃষ্টিতত্ত্বে তারও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

নীতি-বিজ্ঞান
(Ethiecs)

আত্মা, বুদ্ধি ও দেহ উভয়ের মধ্যে অবস্থিত বলে, আত্মাতে বুদ্ধি ও দেহ উভয়ের প্রভাবই বিগুমান। আত্মা বুদ্ধি ও দেহ উভয়ের আকর্ষণেই বিচলিত হয়। উন্নতির পথে গমন করতে থাকলে আত্মা যেমন পরমার্থ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ, অবনতির পথে আত্মা আবার তেমনি দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ হয়। এরূপ উধর্বগতি ও অর্ধোগতির ফলে তিন রকমের আত্মার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমতঃ, দেবাত্মাসমূহ। পবিত্র জ্ঞান ও ঈশ্বরের সাথে মিলনই তাদের লক্ষ্য ও একমাত্র কাম্য। দ্বিতীয়তঃ, প্রেতাত্মাসমূহ। এ আত্মায় সৎ ও অসৎ উভয় গুণই বর্তমান। মন দেহ, স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যেই তাদের গতিবিধি। তৃতীয়তঃ, জীবাত্মাসমূহ তাদের আশ্রয় জড়দেহ। মানবাত্মা যে কেবল দেহপিঞ্জরেই আবদ্ধ, তা নয়। পতন বা অবনতির কারণেই আত্মার দেহ-প্রাপ্তি ঘটে। জীবদেহ ধারণ আত্মার পতনের ফল এবং দুঃখভোগ তার উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু প্রশ্ন, তবে কি জীবের মুক্তি নেই? প্লটিনাস সাধারণ নৈরাশ্য-বাদীদের মত সৃষ্টিকে পরম দুঃখের কারণ বলে মনে করেন না। আত্মার দেহ ধারণ আপেক্ষিক দুঃখের কারণ হলেও চিরদুঃখের কারণ নয়। জড়কে উন্নতির পথে চালিত করাই আত্মার উদ্দেশ্য এবং এ কারণেই আত্মা মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে দেহভাব ধারণ করে। আত্মার বিশুদ্ধি ও ঈশ্বরে বিলীন

হওয়াই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনটি পথ নির্ধারিত হয়েছে ঃ (১) সঙ্গীত (কলাবিদ্যা), (২) প্রেম ও (৩) তত্ত্বজ্ঞান। এ তিন পথকে এক পথেরই বিভিন্ন শাখা বলা যায়। এ তিন আদর্শ এক হলেও, যিনি একবার ধ্যানলব্ধ পরমানন্দের স্বাদ পেয়েছেন, তিনি আর প্রেম, সঙ্গীত বা শিল্পের আদর্শে তৃপ্ত নন। তাঁর নিকট পার্থিব কোন সৌন্দর্যেরই মূল্য নেই। তিনি নিজেও জগতের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যান। যিনি একবার এ অনন্ত সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরেছেন, তিনিই দার্শনিক। এ অপার সৌন্দর্য হতে যে আবেশের উদয় হয়, তাই মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগসূত্র। ইহাই পরমার্থ দর্শন। আত্মবিশুদ্ধি হতে হতে যখন আত্মার ব্যক্তিত্ব কেটে যায়, তখনই আত্মা পার্থিব বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পরমানন্দে বিলীন হয়। আত্মা পরমার্থজ্ঞান লাভ করে। দেহের অবসান হলেই জীবন ও আত্মার উন্নতি হয় না। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় বর্তমান জীবনে আত্মার যে বিশুদ্ধি ঘটে; সেই পবিত্রতা পরজীবনেও সংক্রমিত হয়। প্লটিনাসের দর্শন ও নীতি-বিজ্ঞান চিররহস্যাবৃত বলে মনে হয়। প্রজ্ঞা, যুক্তি বা দর্শনালোচনা দিয়ে প্লটিনাসের ঈশ্বর বা পরমার্থকে পাওয়ার কোন উপায় নেই। কেবলমাত্র সজ্ঞা (Intuition) দ্বারাই তাঁকে জানা সম্ভব। প্লটিনাস তার ব্যক্তিগত জীবনে বহুবার সজ্ঞা-জ্ঞান লাভ করেছেন। মনে হয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর দর্শনকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করেছে। প্লটিনাসের দর্শনকে উচ্চ প্রশংসা করলেও, বস্তুতঃ এখানে এসে আমাদের দর্শনের প্রজ্ঞা ও যুক্তিকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে হয়। প্রজ্ঞাকে জলাঞ্জলি দেওয়ার মানেই হল দর্শনের অপমৃত্যু। কিন্তু তা সম্ভব নয়। প্লটিনাসে এসে গ্রীক দর্শনের অপমৃত্যু ঘটলেও, তা নতুন এক দর্শনের পটভূমি সৃষ্টি করে।

পর্‌ফিরি (Porphyry)

প্লটিনাস রোম নগরে একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। সে সম্প্রদায়ের বহু অনুসারীর মধ্যে জেন্টিলিয়ানাস এমিলিয়াসের (Gentilianus

Amelius) মাত্র কিছু পরিচয় মেলে। তাঁর তত্ত্ব ধারণা সুস্পষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। মোটামুটি তিনি নুমিনিয়াসেরই অনুকরণ করতেন বলে মনে হয়। এ সম্প্রদায়ের অন্য এক ব্যক্তি, টায়ার শহরের পরফিরি এমিলিয়াসের চাইতে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর অপর নাম মালকাস (Malchus) ছিল বলে কথিত হয়। তিনি ২৩২—৩৩ খ্রীস্টাব্দে রোম নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০১ খ্রীস্টাব্দে রোম নগরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি প্রথমে লঙ্গিনাস এবং শেষে প্লটিনাসের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরফিরি প্লেটোর বহু গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি এরিস্টোটলের বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধেরও সমালোচনা করেন। এরিস্টোটলের তর্কশাস্ত্রের উপর তাঁর সমালোচনা বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এরিস্টোটলের গ্রন্থ ও প্রবন্ধে অধ্যয়নে তাঁর চিন্তাশক্তি এবং ভাব-ধারণা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। লঙ্গিনাসের সংস্পর্শে এসেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। পরফিরি 'ইনিড' ছদ্মনামে প্লটিনাস-তত্ত্বের যে সংস্কার সাধন করেন, তাতে সে দর্শনের বিশেষ উন্নতি না হলেও ঐ মত ও দর্শন বুঝাবার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেন।

পরফিরি বুদ্ধি-জগতকে স্থূল-জগত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, বুদ্ধিতে সত্তা, ধারণা ও জীবনের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে। মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তাতে মানবের কর্মপটুতার সঙ্গে মানবাত্মার এক ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। যে সব কর্ম নিয়ে মানব-জীবনের সৃষ্টি, সে কর্ম এবং মানবাত্মাতে কোন প্রভেদ নেই বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানের সমষ্টিই হল আত্মা। কর্মানুষ্ঠানের সমষ্টিকেই পরফিরি আত্মা বলে মনে করেন। দ্রব্যজাতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আত্মায় নিহিত থাকে বলে তিনি মনে করেন। যে বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, আত্মা তখন সে দ্রব্যেরই রূপ গ্রহণ করে। পরফিরির এ ধারণা হতে আত্মার যে ভিন্ন ভিন্ন অংশ সূচিত হচ্ছে, তা যুক্তির ধোপে টিকে না। তিনি যে ব্যক্তিবিশেষ আত্মাসমূহের সমষ্টি বা সার-ভাগকে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা বলে উল্লেখ করেছেন, তা-ও প্রজ্ঞাসম্মত

নয়। তাঁর মতে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ নেই। কারণ, জীবাত্মাসমূহের সারভাগ হয়েও পরমাত্মা স্বয়ং অবিভক্ত। পরফিরি ইতর প্রাণীর উপর বুদ্ধি আরোপ করলেও, ইতর প্রাণীর আত্মা আছে বলে স্বীকার করেন নাই। প্রাণীর যদি আত্মাই না থাকে তবে তার বুদ্ধি কি ভাবে সম্ভব, তা আমরা বুঝতে অক্ষম। মানবাত্মার মুক্তিতে পরফিরির বিশ্বাস ছিল না। আত্মার যতই উন্নতি হোক না কেন, তা বস্তুতঃই মানব প্রকৃতির অধীন বলে তিনি মনে করতেন। প্রকৃতির অধীন হলেও আত্মার যে মুক্তি নেই, তা নয়। কিন্তু এমন অবস্থায় আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। মুক্তির প্রকৃত অর্থ হল যে, আত্মা পূত-পবিত্র হলে স্মৃতি লোপ পেয়ে বাসনা-কামনা বিলুপ্ত হয় এবং তার ফলে মানব মোক্ষ বা ত্রাণ লাভ করে। পরিত্রাণ বা মোক্ষই হল দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং পরিত্রাণ বা মোক্ষ লাভের জন্যেই মানব সাধ্যমত কামনা বাসনা পরিহার করে তত্ত্বচিন্তায় নিমগ্ন থাকবে।

প্লটিনাসের চেয়ে পরফিরি নীতিজ্ঞানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। নীতিশাস্ত্রের অধিক প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। নৈতিক উৎকর্ষ এবং আত্ম-উন্নতির জন্যে মানুষের কতকগুলো বিশেষ নিয়ম মেনে চলা উচিত বলে তিনি মনে করেন। মাংসাহার ও স্ত্রী সংসর্গ থেকে বিরত থাকার উপদেশ তিনি দেন। বিলাসিতা ও অপ্রিয় আমোদ-প্রমোদ বর্জন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। সংসারের বিষয়-বাসনা পরিহার করার জন্য কোন এক ধর্মমত গ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। ধর্ম ও ধর্মীয় রীতি নীতিতে তাঁর অনাস্থা থাকলেও সাধুজীবন, সদালোচনা এবং সচ্চিন্তাকেই উৎকৃষ্ট ধর্মীয় পদ্ধতি বলে মনে করতেন। "মানবাত্মার উন্নতি ক্রমসাধ্য। মানব হতে প্রেতযোনি, প্রেতযোনি হতে দেবতা, দেবতা হতে আত্মা, এভাবে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে অগ্রসর হতে হয়।" প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে পরফিরি পনেরোটি গ্রন্থ লেখেছিলেন বলে কথিত হয়। এ সব গ্রন্থ তৎকালীন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। এ পুস্তকগুলোর সাহায্যে

তিনি স্বজাতীয় ধর্ম রক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রেতাদির ধারণায় প্রকৃত ধর্মজ্ঞান লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ধর্মের সংস্কার হওয়ার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। যাঁরা দর্শন বা সূক্ষ্মতত্ত্বের অধিকারী নন, তাঁদের রূপ-কাহিনী অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেবতাদের কল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। পশু-পাখী ও অন্যান্য ইতর প্রাণী এমনকি গাছ পাথরও দেবতা বলে গণ্য। তারা সব সময়ই দেব সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। পরফিরি ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করতেন। ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা তাঁর লিখিত বহু গ্রন্থের মধ্যে সন্ধান মিলে। ভূতবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, এ দু'বিদ্যায় জড় প্রকৃতি, প্রেতযোনি ও আত্মার উপর কর্তৃত্ব করা চলে। পশু হত্যা এবং এ জাতীয় অনেক অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর অবহেলা এবং ঘৃণা থাকলেও, এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে প্রেত-যোনি ও দেবতাদের সন্তুষ্ট করা চলে, তা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি এ সব পর্ব ও অনুষ্ঠানগুলোকে আবশ্যকীয় বলে মনে করতেন।

মোট কথা, প্লটিনাস যে তত্ত্ব ও দর্শনের সন্ধান দিয়েছিলেন, তারই পুরোপুরি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমরা পরফিরির আলোচনায় দেখতে পাই। পরফিরি যেন প্লটিনাসের একজন যথোপযুক্ত শিষ্য। পরফিরি অধ্যয়নে আমরা প্লটিনাস, এরিস্টোটল ও প্লেটোর দর্শন সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারি। পরফিরি কর্তৃক প্লটিনাস এবং পীথাগোরাসের জীবন-চরিত আজও বিদ্যমান। পরফিরির লিখিত গ্রন্থের খণ্ডাংশ আজও বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

যাম্‌ব্লিকাস ও প্রোক্লাস
(Jamblicus Proclus)

খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে নব-ভাববাদের পরিবর্তন হলেও তার মূল তত্ত্বগুলো ঠিকই ছিল। প্লটিনাস ও পরফিরি সম্রাট কন্‌স্টান্টাইনের (Constantine the Great) পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে সময়েও খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাব পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

জেনোফিনিসের কাল থেকে যেমন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলে আসছিল, প্লটিনাসও এরূপ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানেন। পরফিরি নিজে কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত না হলেও নির্বোধ ও অজ্ঞলোকদের বুঝানোর জন্য ভূত-প্রেত ইত্যাদির কথা কল্পনা করেছিলেন। প্লটিনাস ও পরফিরির শিষ্যদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস প্রবল হওয়ায় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তেমন সাফল্য লাভ করতে পারে নি। ধর্মের সঙ্গে সুদীর্ঘ দশ শতাব্দী যাবৎ বিরোধের পর চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিকগণ দর্শন-শাস্ত্রের সংহার মূর্তি দেখে আশ্চার্যান্বিত হলেন। তত্ত্বকথায় ও দর্শনালোচনায় কোন আগ্রহ না দেখিয়ে লোকেরা ধর্মের জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠল। ধর্ম ব্যতিরেকে মানুষ অন্য কোন সত্যকে সাদরে গ্রহণ করতে পারল না। ধর্মের জন্যে মানুষ অস্থির হয়ে উঠল। কুসংস্কারকে রহিত করার স্থলে দর্শন যেন নিজেই কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়তে লাগল। দার্শনিকগণ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারলেন যে, ধর্ম ও দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেন ধর্মের জয় সূচিত হচ্ছে। কিন্তু সে ধর্ম গ্রীকদের জাতীয় ভাব ও শিক্ষার প্রতিকূল। এরূপ পরিবর্তনের কারণ হল যে, পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। রোম ও গ্রীক ধর্মযাজকগণ যে পরিবর্তনকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন, দার্শনিকগণ সে পরিবর্তনকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। চরম কড়াকড়ি ও কঠোরতার ফলে দর্শনে নতুন করে বহু-দেবত্বভাব জেগে উঠে। শুধু তাই নয়, বহু-দেবত্বের (Polytheism) যাতে প্রসারতা লাভ করে, সেজন্য বহু প্রচেষ্টা চলে। এ সময় হতে দর্শনে বহু কুসংস্কার স্থান পায়। যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, প্রেতসাধন প্রভৃতি বহু ক্রিয়াকলাপ দর্শনে ঢুকে পড়ে। এক কথায়, গ্রীক চিন্তায় যেন পুনরায় অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

"জাতীয় জীবনে যখন এমন চরম দুর্দশা, সে সময় গ্রীক চিন্তায় যে ছিটে-ফোঁটা জ্ঞানশিখা প্রজ্বলিত হয় নাই, এমন নয়। জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দু'একজন চিন্তাবিদের আবির্ভাব এ সময়ে ঘটে। বহু-দেবত্বের প্রতিষ্ঠায়

এ সময় যে কয়জন দার্শনিক আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেবল সিরিয়ার যাম্‌ব্লিকাস (Jamblicus) এবং বৈজান্তিয়ামবাসী প্রোক্লাস (Proclus)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাম্‌ব্লিকাস সিরীয় নব-ভাববাদ বা নব প্লেটোবাদের গোঁড়া ছিলেন। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রোক্লাস ৪১২ হতে ৪৮৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি যাম্‌ব্লিকাস প্রচারিত দর্শনমতের পোষকতা করতেন। রোমীয় দর্শনমতের পৃষ্ঠপোষকও তিনি ছিলেন বলে কথিত হয়।

যাম্‌ব্লিকাস

খ্রীস্টান ধর্মভাব পরিহিত প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনা, পীথাগোরাস ও প্লেটো-দর্শন অধ্যয়নে যাম্‌ব্লিকাসের জ্ঞানানুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মিসর ও প্রাচ্যদেশে ধর্মতত্ত্ব এবং নিজ পূত ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টিতত্ত্ব হতেও তাঁর জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। গণিতশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কল্পনার আশ্রয় অবলম্বনে তিনি পৌরাণিক দর্শন-সমস্যা সমাধানে সফলকাম হন। তাঁর মতে, মূল চিচ্ছক্তি চারপাশ হতে এক প্রকার অনির্বচনীয় ত্রিগুণাত্মিকা জ্যোতিঃ-শিখা নির্গত হয়। এ জ্যোতিঃ-শিখা হতেই দেবগণের সৃষ্টি। যাম্‌ব্লিকাস খ্রীস্টানদের মানব-ঈশ্বর কল্পনাকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন। কিন্তু আবার অন্যদিকে পরম ঈশ্বরকে মানবাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্যুত করে তিনি প্লটিনাসের ধর্মতত্ত্বকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেন। পরমেশ্বরের কোন বুদ্ধি বা গুণ আরোপিত হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মূল একের সঙ্গে জীবের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। জীবমূল এক হতে উদ্ভূত, দ্বিতীয় সত্তাসমূহের অংশ। দ্বিতীয় সত্তাও অতিবর্তীবিশেষ (Transcendental) ; কিন্তু সংখ্যায় বহু। এদের প্রত্যেকেই এক একটা দেবতা। এসব দেবতা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর দেবগণ বিশুদ্ধ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতারা জড়জগতের বহির্ভূত এবং তৃতীয় শ্রেণীর দেবগণ জড়জগতের অন্তর্গত। এই শ্রেণীর দেবতাদের সঙ্গে কেবল জড়-জগতেরই সম্বন্ধ। এ শ্রেণীর দেবতাদের সঙ্গেই মানবের সম্পর্ক থাকতে পারে। এসব দেবতাই

প্লেটোর ভাব (Ideas), পীথাগোরাসের সংখ্যা (The Number) এবং এরিস্টোটলের সত্তামূলক রূপ (The Substantial Form)। নিরপেক্ষ 'একে'র সঙ্গে জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নেই।

প্রোক্লাস

প্রোক্লাস তাঁর দর্শনের তত্ত্ব যামব্লিকাস ও প্লটিনাস হ'তে সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টিতত্ত্বকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা চলে। প্রথমতঃ, নিরপেক্ষ 'একে'র কল্পনা করতে হবে। এ একের সঙ্গে সৃষ্টির কোন প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। এ এক হতে সত্তা, জীবন ও বুদ্ধির উৎপত্তি হয়েছে। সত্তা অনন্ত। এ অনন্ত সত্তা হতে অন্ত বা রূপের সৃষ্টি হয়েছে। অনন্ত ও রূপের মিলনে সান্ত বা সীমা-বিশিষ্টের উৎপত্তি। জীবন—জীবন মানে সম্ভাব্যতা (Potentiality) ও বর্তমানতা বা অস্তিত্ব (Existence) বুঝায়। সম্ভাব্যতা ও অস্তিত্বের মিলনে জীবের উৎপত্তি। বুদ্ধি—স্থির ও অস্থির বা চঞ্চল অনুসারে বুদ্ধি দু'প্রকারের হয় এবং স্থির ও চঞ্চলের সম্মিলনে স্মৃতি (Reflective thought) উৎপত্তি হয়। দর্শনে যাদের প্রকৃত দখল রয়েছে, তাদের কাছে উল্লেখিত ত্রিগুণ প্রত্যেকেই জগতের দুর্জ্ঞেয় মূল কারণে একটা করে রূপ প্রকাশ করে। এবারে দেখা যাক্, এ রূপগুলো কি। প্রথমতঃ, ভগবান বা ঈশ্বরের অনির্বচনীয় ঐক্য বা সামঞ্জস্য। দ্বিতীয়তঃ, ভগবানের অনন্ত উৎপাদন বা সৃষ্টিশক্তি। তৃতীয়তঃ, তাঁর অনন্ত পূর্ণতা। এ রূপগুলো অদ্বিতীয় নিরপেক্ষ একের বিকাশ-ধারা। কোন কার্যের নিয়ম যেমন কার্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তেমনি সত্তা বা চিন্তনের নিকটও নিরপেক্ষ একের মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। নিরপেক্ষ একের স্থান এত উচ্চে বলেই তা দুর্জ্ঞেয়। যা কিছু অলৌকিক বা ঐশ্বরিক, তা অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ভিন্ন জানা যায় না। কেবলমাত্র দার্শনিক বা পণ্ডিত ব্যক্তিগণই এরূপ ঐশীশক্তির প্রভাবে (By influence of Divine Power) জগতের গূঢ়রহস্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন।

জ্ঞান সাধারণতঃ জ্ঞেয় জগতের বস্তু। অর্থাৎ জ্ঞান দিয়ে শুধু জগতের বস্তুকেই জানা সম্ভব। কিন্তু জ্ঞানাতীত বা দুর্জ্ঞেয়কে জানতে হলে জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস এবং ভক্তির যোগসাজস প্রয়োজন। জ্ঞানের সাথে ধর্ম ও ভক্তির যোগসাধনই জ্ঞানাতীত বা দুর্জ্ঞেয় জানা সম্ভব।

নব-প্লেটোবাদে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, প্রোক্লাসেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে। তত্ত্ব হিসাবে নব-প্লেটোবাদ ভাবকে কোন উচ্চতর শক্তির অধীন করে রাখে নাই। ফলে সত্তা ও ধারণার তেমন সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে নাই। যদি ভাবকে উচ্চতর শক্তির অধীনে রেখে সত্তা ও ধারণা উভয়ই সুস্পষ্ট প্রকাশ পেত, তবে নব-প্লেটোবাদের এ মত প্লেটোর ভাববাদের চেয়ে অধিক অদ্বৈতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল বলা যেত। কিন্তু নব-প্লেটোবাদের মূলে এ-উদ্দেশ্য থাকলেও তা কার্যকরী হয়ে উঠে নাই। খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে বিরোধ থাকার জন্য মূল চিচ্ছক্তির সাথে জাগতিক ব্যাপারের সম্বন্ধ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্লেটোর ভাববাদেরও এই একই দোষ। কিন্তু নীতিবিজ্ঞান ও ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্লেটোর মতবাদ নব-প্লেটোবাদের চেয়ে অনেক উন্নত ও মহান বলে মনে হয়। প্লেটোর মতে, নীতি-অনুশীলনই ধর্ম। অপরপক্ষে প্রোক্লাস যাদুবিদ্যার অনুশীলনকে ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। নব-প্লেটোবাদের শেষ অবলম্বন এথেন্সের সে বিদ্যালয়, যেখানে প্রোক্লাস শিক্ষাদান করতেন, খ্রীস্টীয় ৫২৯ অব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের (Justinian) আদেশে তাও শেষ পর্যন্ত উঠে যায়। জনসাধারণ এ ঐতিহাসিক গৌরবের শেষ নিদর্শনের প্রতিও অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল যে, কেউ আর প্রোক্লাসের উপদেশে কর্ণপাত করত না। দু'শত বৎসর পূর্বেই খ্রীস্টান ধর্ম এ সাম্রাজ্যের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ইচ্ছাশক্তির অনুপ্রেরণায় লোকের মনে এক সম্ভাবনাময় ধর্মভাব জেগে উঠে। ফলে, মানুষের আর ধীরস্থির তত্ত্ব জিজ্ঞাসার দিকে তেমন আগ্রহ রইল না।

গ্রন্থপঞ্জী

W.T. Stace	:	A Critical History of Greek Philosophy.
F. Thilly	:	A History of philosophy.
J. Burnet	:	Early Greek Philosophy.
E. Zeller	:	Outlines of the History of Greek Philosophy.
J.E. Erdmann	:	History of Philosophy.
J.B. Bury	:	History of Greece.
R. Adanson	:	Development of Greek Philosophy.
M.E.J. Taylor	:	An Introduction to Greek Philosophy.
Boyd	:	An Introduction to the Republic of Plato.
Nettleship	:	Lectures on the Republic of Plato.
B. Jowett	:	The Dialogue of Plato.
B. Russell	:	History of Western Philosophy.
F. Copleston	:	A History of Philosophy.
A. Rogers	:	A Student History of Philosophy.
A.H. Armstrong	:	An Introduction to Ancient Philosophy.
W. Durant	:	Story of Philosophy.
G.W. Cunningham	:	Problems of Philosophy.
G.T.W. Patrick	:	Introduction to Philosophy.
Joad	:	Guide to Philosophy.
Lewis	:	Introduction to Philosophy.
Marrin	:	An Introduction to Philosophy.

Radhakrishnan	:	History of Eastern & Western Philosophy.
G.C. Deb	:	Idealism & Progress.
Dr. A. Matin	:	Intrcduction to Philosophy.
ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব	ঃ	তত্ত্ববিদ্যাসার।
সরদার ফজলুল করিম	ঃ	প্লেটোর সংলাপ।
প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত	ঃ	দর্শনের মূলতত্ত্ব।
শ্রী বীরচন্দ্র সিংহ	ঃ	নীতিবিজ্ঞান।
সাইয়েদ আবদুল হাই	ঃ	যুক্তিবিদ্যা পরিচিতি।
শ্রী দিগ্বিজয় রায় চৌধুরী	ঃ	গ্রীকদর্শন।

পরিভাষা

Absolute—পরমসত্তা।

ল্যাটিন absolver অর্থাৎ 'মুক্ত করা' থেকে absolute কথাটির উৎপত্তি। কোন কিছু থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারলেই প্রাচীন কালে তা absolute হয়ে দাঁড়াত। দর্শনে এ Absolute শব্দটি, মূলভাবে এক থাকলেও, ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। দর্শনে Absolute বলতে পরমসত্তা বা ভগবানকেই বুঝায়। এ পরমসত্তা বা ভগবান অনন্ত, অসীম ও অনিয়ন্ত্রিত। এ প্রকৃত সত্য ও অনন্ত দ্রব্যবিশেষ। সমগ্র অদ্বৈতবাদের মূল উদ্দেশ্যই হল, এ পরমসত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। এ পরমসত্তা সমস্ত নির্দিষ্ট ও বিশেষ বস্তুর উৎপত্তির কারণ। সমস্ত সসীম সত্তার অস্তিত্ব ও পরিচিতি সম্বন্ধের দ্বারা নিরূপিত হয়। অনন্ত সত্তা বা ভগবান সম্বন্ধের অতীত। এক কথা, পরমসত্তা অবর্ণনীয়, অচিন্তনীয় ও অনির্দেশ্য। স্পিনোজা (Spinoza) এ পরমসত্তাকেই 'দ্রব্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। হেগেল (Hegel) এ পরমসত্তাকে 'পরমাত্মা', ও ব্রেডলীর (Bradley) মতে, পরমসত্তা হল 'পরম অভিজ্ঞতা', যার মধ্যে সর্ব অভিজ্ঞতার সুষম সমন্বয় ও সামঞ্জস্য ঘটেছে।

Abstract Idea—অমূর্ত ধারণা।

অমূর্ত ধারণা সার্বিক বা সামান্য ধারণার অপর নাম। লক্ (Locke) মনে করেন, দ্রব্য ও তার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও মন জড়বস্তুর গুণের আধারস্বরূপ দ্রব্যের অমূর্ত ধারণা গঠন করতে পারে। বার্কলির মতে, মন কোন অমূর্ত ধারণা গঠন করতে পারে না। যেমন আমাদের মনে এমন কোন ত্রিভুজের সামান্য ধারণা দেখতে পাই না, 'যে ত্রিভুজ বিষম-কোণী, আয়তাকার, সমভুজ, বিষমভুজ নয় বা এর কোনটিই নয় বা

একসঙ্গে এর সবগুলিই। তাঁর মতে, সামান্য ধারণা নিছক নাম ছাড়া কিছুই নয়। নাম সব সময় ধারণার প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবহার হয় না। তবে একাধিক বিশেষ ধারণার প্রতীক বা সংকেতরূপে নামকে সামান্য ধারণা হিসাবে স্বীকার করা যেতে পারে। যেমন, বোর্ডে একটা ত্রিভুজ অঙ্কিত করে প্রমাণ করা যায় যে, সব ত্রিভুজের তিনটে কোণই দুই-সমকোণের সমান। প্রত্যেক ত্রিভুজ সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। বোর্ডের অঙ্কিত ত্রিভুজবিশেষ হয়েও অন্য সকল ত্রিভুজের প্রতিনিধি হিসাবে সামান্য বা সার্বিক। অমূর্ত ধারণা জাতি নামের মানসিক প্রতিরূপ।

Air, as First Principle—আদি উপাদান হিসাবে বায়ু।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এনাক্সিমিনিস (Anaxamenes)-এর মতে, বায়ুই হচ্ছে জগতের সব কিছুর মূল উপাদান। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সোনা-রূপা প্রভৃতি সব কিছুরই মূল উপাদান হল বায়ু। বায়ু থেকেই জগতের সব কিছুর উৎপত্তি এবং বায়ুতে পুনরায় সব কিছু বিলীন হয়ে যাবে। এনাক্সিমিনিস্ বায়ুকে জগতের সব কিছুর জড় ব মূল উপাদান বলে মনে করেন।

Antinomy—স্ববিরোধ।

শুধু বিচারের দ্বারা জগতকে সান্তও বলতে পারা যায়, অনন্তও বলতে পারা যায়। সান্ত বলার পক্ষে যে যুক্তি আছে, অনন্ত বলবার পক্ষেও তেমনি যুক্তি আছে। বিশ্ব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচার করতে গিয়ে মানববুদ্ধি এভাবে স্ববিরোধে জড়িত হয়ে পড়ে। কান্ট (Kant) এগুলোকে 'শুদ্ধ প্রজ্ঞার স্ববিরোধ' আখ্যা দিয়েছেন। কান্টের মতে, তাঁর দর্শিত পন্থা ব্যতিরেকে এ স্ববিরোধ হতে মানববুদ্ধির মুক্তি পাবার অন্য কোন উপায় নেই। শুধু বিচারের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে উভয় যুক্তিই অকাট্য বলে মনে হয়।

Appearance—অবভাস।

অবভাস শব্দটি সাধারণতঃ সত্তার (Reality) বিপরীত অর্থে

ব্যবহৃত হয়। অবভাস ও সত্তার এ পার্থক্য প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান। ইলিয়টিক ও হিরাক্লিটাসের দর্শনে সত্তা ও অসত্তার প্রভেদ প্রথমবারের মত লক্ষ্য করা যায়। প্লেটোর দর্শনেও ভাব ও ইন্দ্রিয়বস্তু, অর্থাৎ সত্তা ও অবভাসের আলোচনা রয়েছে। আধুনিক দর্শনে কান্টের মতে, বস্তুর দু'টো দিক আছে। একটা হল তার অবভাসিক দিক অর্থাৎ যেভাবে বস্তুটি আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হয়; অন্যটি হল বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তা বা যথাযথরূপ অর্থাৎ বস্তু আসলে বা প্রকৃতেই যা (Thing in itself)। ব্রেড্লী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অবভাস ও সত্তা' গ্রন্থে অবভাসের একটা সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, দ্রব্য ও গুণের ধারণার মধ্যে অন্তর্বিরোধ আছে। যার মধ্যে বিরোধ আছে, তা সত্তা হতে পারে না—তা হবে অবভাস। তবে সমস্ত অবভাসই চরম তত্ত্ব পরম অভিজ্ঞতার কোলে আশ্রয় পায়। সমস্ত বিরোধের সেখানেই সমাপ্তি। এ পরম তত্ত্বই চরম সত্য। অবভাস মিথ্যে বা অসত্য।

Asceticism—কৃচ্ছ্রতাবাদ। আত্ম নিগ্রহবাদ।

নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত কঠোর আত্মত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের অভ্যাসকেই কৃচ্ছ্রতাবাদ বা আত্মনিগ্রহবাদ বলা হয়। মহত্ত্ব ও পুণ্যময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে পীথাগোরীয়ান এবং স্টোয়িকগণ নিজেদেরকে তাঁদের সহজাত ও স্বাভাবিক ভোগ-বিলাস, কামনা বাসনা ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখেন। তাঁদের ধারণা, মানুষ একমাত্র আত্মসংযম ও আত্মনিগ্রহের মাধ্যমেই মহত্ত্ব জীবন লাভ করতে পারে। সংবেদনশীল পশু-জীবনের বাসনা-কামনার অবলুপ্তি ব্যতিরেকে তার পক্ষে মহৎ জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। সব রকম ভোগ-বিলাস এবং জাগতিক বস্তুর প্রতি লোভ পরিত্যাগ না করলে মানুষ কখনও মহৎ জীবন যাপন করতে পারে না। কামনা-বাসনার অবলুপ্তিই মানব চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য আত্ম-

ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের দীর্ঘ সাধনা প্রয়োজন বলে আত্মনিগ্রহবাদীরা মনে করেন।

Atoms—পরমাণু।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডেল্‌টন (Dalton) তাঁর পরামাণুবাদ প্রচার করে বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তাঁর মতে, যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বস্তুকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করা যায়। জড়বস্তুকে এ ভাবে ক্রমাগত ভাগ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বস্তুকণিকাগুলো এত ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে যে, সেগুলোকে আর ভাগ করা হয় না। ডেল্‌টনের মতে, জড় পদার্থের এসব ক্ষুদ্রতম, অবিভাজ্য অন্তিম বস্তুকণিকার অপর নাম হচ্ছে পরমাণু।

Being—জীবনসত্তা। সত্তা।

জীবনসত্তা পরম সত্য। জীবনসত্তা অনন্ত, অপরিবর্তনীয়, অচল, অবিচ্ছিন্ন, অবিভাজ্য, অসীম ও অদ্বিতীয়। জগন্ময় এ মহাসত্তা সৃষ্টির কারণরূপে বিদ্যমান। জগতের সমস্ত লৌকিক পার্থক্যসমূহ এ মহাসত্তায় বিলীন রয়েছে। এ জীবনসত্তারই লৌকিক নাম ঈশ্বর বা ভগবান।

Becoming—ঘটা।

'ঘটা' হল সত্তা ও অসত্তার একরূপতা। ঘটার মধ্যে দু'টো দিক রয়েছে। একটি হল বস্তুর উৎপত্তির দিক, অপরটি বস্তুর অবলুপ্তির দিক। অর্থাৎ, একটি হল সত্তার দিক, অন্যটি অসত্তার দিক। জীবন-মরণ সমস্যাকে উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক। জন্মগ্রহণের সাথে সাথে মানুষ মৃত্যুর বীজকে বহন করে নিয়ে আসে; অর্থাৎ জীবনটাই হল সম্ভাব্য এক মৃত্যু। সত্তার অসত্তারূপ। এ দু'য়ের স্বরূপত্বই হল 'ঘটা'।

Cause—কারণ।

কর্ম, গতি ও পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে যা কিছু দায়ী, তাকেই কারণ বলা হয়। বিভিন্ন দার্শনিক কারণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এরিস্টোটলের মতে, শিল্পজ বা স্বভাবজ যে দ্রব্যই হোক, সত্তা আখ্যা

লাভ করতে হলে তাকে চার প্রকার কারণের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে: (১) উপাদান কারণ, ২) আবয়বিক কারণ, (৩) নিমিত্ত কারণ, (৪) উদ্দেশ্যসাধক কারণ। মিলের (Mill) মতে, কারণ হল শর্তহীন অপরিবর্তিত পূর্ববর্তী ঘটনা। হিউমের মতে (Hume), কারণ হল নিয়ত অপরিবর্তিত পূর্ববর্তী ঘটনা এবং কার্য হল অপরিবর্তিত পরবর্তী ঘটনা। এভাবে বিভিন্ন দার্শনিক কারণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

Concept—সার্বিক ধারণা, সামান্য ধারণা, প্রত্যয়।

কোন শ্রেণী বা জাতিসকলের মধ্যে যে সাধারণ ও আবশ্যক গুণ বিদ্যমান থাকে, তাদের সমষ্টিকে সার্বিক বা সামান্য ধারণা বলে। সার্বিক ধারণা জাতি নামের মানসিক প্রতিরূপ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সামান্য ধারণা জাতি বা শ্রেণীর বেলায় ব্যবহারযোগ্য; ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের বেলায় নয়। 'মানুষ' ধারণাটি এক টি সার্বিক বা সামান্য ধারণা। কারণ, সমগ্র মানুষ-শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ নিয়েই 'মানুষ' ধারণাটি গঠিত। এখানে মানুষ বলতে কোন ব্যক্তি-মানুষকে না বুঝিয়ে সমস্ত মানুষ শ্রেণীকেই বুঝায়।

Contradictory—বিরুদ্ধ বিরোধ।

"দু'টো পদের সম্বন্ধ যদি এমন হয় যে, এর একটি যে বস্তু বা গুণের অস্তিত্ব বুঝায়, অপরটি সেই বস্তু বা গুণের অভাব বুঝায় এবং এরা যে বিশেষ ক্ষেত্রের বস্তু বা গুণ বুঝায়, সেই ক্ষেত্রের পূর্ণ ব্যক্ত অর্থের সমান হয়; তবে এ পদ দু'টোকে পরস্পরবিরোধী বা বিরুদ্ধবিরোধী পদ বলাহয়।"

কোন সদর্থক পদও এর নঞর্থক রূপকে পরস্পরবিরোধী বলা হয়। যেমন—'মানুষ' ও 'অ-মানুষ'। দু'টো বিরুদ্ধ পদ একই সময়ে সত্য হতে পারে না। এদের একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যে হবে।

Dialectic Method—দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি।

Dialectic-এর বাংলা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি করা হয়েছে। একই বিষয় দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদের উদ্ভব হয় বলেই এ দ্বন্দ্ব বা বিরোধ

দেখা দেয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল এ বিরোধের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির দু'টো দিক আছে। একটি হল এর নঞর্থক দিক, অন্যটি হল এর সদর্থক দিক।

প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক সক্রেটিস এবং আধুনিক যুগের জার্মান দার্শনিক কান্ট নঞর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অনুসারী। এ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রতিপক্ষের মতকে স্ববিরোধী প্রমাণ করে পরোক্ষভাবে খণ্ডিত মতবাদের বিরুদ্ধ-মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে।

জার্মান দার্শনিক হেগেল সদর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, মানুষের চিন্তা বা গুণের গতি ও পরিণতি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়। এটাই হল হেগেলীয় ডায়ালেক্টিকের মূলকথা। বস্তুতঃ, একটি উচ্চতর ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে দু'টো বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয় সাধন করাই হ'ল এ দ্বান্দ্বিকবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন, 'জড়' ও 'অ-জড়' এ দুই বিরুদ্ধ ধারণা একটি উচ্চতর ধারণায় 'দ্রব্য'তে সমন্বয় হয়েছে। পুনরায় 'দ্রব্য' ও 'অ-দ্রব্য' ধারণা দু'টো 'সত্তা' ধারণায় সমন্বিত হয়েছে। এভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলে। শেষ পর্যন্ত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি পরম সমন্বয়ে (Absolute synthesis) বা পরমসত্তায় এসে পৌঁছায়; যেখানে সমস্ত বিরোধ ও অসংগতির অবসান ঘটে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রথম সদর্থক ধারণাকে 'বাদ' (thesis), বিরুদ্ধ নঞর্থক ধারণাকে 'প্রতিবাদ' (anti thesis) এবং উভয়ের মিলনকে 'সমন্বয়' (Synthesis) বলা হয়।

Dianoetic—স্ববিচার বোধিবাদ।

স্ববিচার বোধিবাদের মতে, মানুষের নৈতিক এবং যৌক্তিক ধীশক্তি অভিন্ন বলে শুধুমাত্র বিচারবোধই সার্বজনীন ও চিরন্তন নৈতিক নিয়মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। বিবেকের ভূমিকা এখানে একেবারে নেই। এ ব্যাপারে স্ববিচার বোধিবাদের সঙ্গে নীতিবোধবাদের একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নীতিবোধিবাদের মতে, একমাত্র বিবেকের পক্ষেই মানব আচরণের ভালমন্দ উপলব্ধি করা

সম্ভব। অপর পক্ষে, স্ববিচার বোধিবাদের মতে বিবেক নয়, বিচারবোধেই মানব আচরণের নৈতিক নিয়মের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব।

Dichotomy—দ্বিভাগ।

Dichotomy শব্দের অর্থ হল দু'ভাবে ভাগ করা। কোন জাতিকে (Genus) দু'টো বিরুদ্ধ উপজাতিতে (Contradictory species) ভাগ করাকে দ্বিভাগ বলে। যেমন, মেরুদণ্ডী প্রাণীকে 'স্তন্যপায়ী' ও 'অ-স্তন্যপায়ী' এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

Dualism—দ্বৈতবাদ।

দ্বৈতমতবাদ অনুসারে এ জগতে দু'টো মৌলিক উপাদান আছে ; একটি হল মন, অপরটি হল জড়। মন ও জড় পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র সত্তা। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ট (Descartes) এ মতবাদের প্রবর্তক। দু'টি বিপরীতধর্মী সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসই হল ডেকার্ট প্রবর্তিত দ্বৈতবাদের মূল সূত্র।

Eclecticism—মিশ্রদর্শন।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মিলন হতে এক প্রকার নতুন মতের প্রচার হয়েছিল। একে ধর্মসম্বন্ধীয় 'এক্লেকিটসিজ্ম্' বা মিশ্রদর্শন আখ্যা দেয়া হয়। এ মত প্রচারের ফলে প্রাচীন খ্রীস্টীয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়েছিল।

Ecstasy—উল্লাস, পরমানন্দ।

বহির্জগতের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে মন যখন চরম তত্ত্বের ভাবনায় তন্ময় হয়ে পড়ে, তখন এক বিশেষ মুহূর্তে চরম তত্ত্বের সঙ্গে মনের বা আত্মার এক সাক্ষাৎ সুনিবিড় যোগসাজস ঘটে। এ বিশেষ ক্ষণটিতে আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। আত্মা তখন চরম পুলক বা পরমানন্দ লাভ করে। মন বা আত্মার এ বিশেষ মুহূর্তটিকে উল্লাস বা পরমানন্দের মুহূর্ত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

Elements—উপাদান।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ এক বা একাধিক উপাদান থেকেই যে জগতের উৎপত্তি, এ কথাই প্রচার করে গেছেন। থেলিসের নিকট এ উপাদান হচ্ছে পানি; এনাক্সিমেণ্ডারের মতে, এ উপাদান হচ্ছে এক অসীম ও নিরাকার বস্তু; এনাক্সিমিনিসের মতে, এ উপাদান হচ্ছে বায়ু; হিরাক্লিটাসের মতে, অগ্নি। ডিমক্রিটাস পূর্ব প্রচারিত সমস্ত মতবাদের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে মৃত্তিকা, বায়ু, পানি ও অগ্নি—এ-চার ধরনের মৌলিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

First Mover—প্রথম সঞ্চালক।

এরিস্টোটল এ 'প্রথম সঞ্চালক'কে শ্রেষ্ঠ স্বর্গ ও শক্তির আদি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ প্রথম সঞ্চালকই ঈশ্বর। সৃষ্টি মাত্রই তাঁর অন্তর্ভুক্ত। এ প্রথম সঞ্চালক নিজে অনড়; কিন্তু সকল গতির কারণ। সমস্ত পরিবর্তন ও গতির কারণ হলেও প্রথম সঞ্চালক স্বয়ং অপরিবর্তনীয় ও গতিহীন।

Form—আকার, রূপ।

এরিস্টোটলের মতে, বস্তুর প্রকৃতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে দু'টো দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে তার জড়ের দিক, অন্যটি তার রূপ বা আকারের দিক। এরিস্টোটলের মতে, 'আকার' (Form) হল দ্রব্য, বস্তুর মূলতত্ত্ব। এ আকার নিত্য বা অপরিবর্তনীয়। জগতের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে এ আকারের মূর্ত সম্পর্ক রয়েছে। জগতে যে কোন বস্তুর পরিবর্তন লক্ষ্য করলেই এ সত্য ধরা পড়ে। প্রথমতঃ, প্রতিটি বস্তুতে একটা কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ, এই একটা কিছু কোন একটা নির্দিষ্ট কিছুতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন এই একটা যা কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে, তাকেই এরিস্টোটল নাম দিয়েছেন জড় (Matter) এবং যে অন্তর্নিহিত শক্তি এই একটা কিছুকে (জড়কে) নির্দিষ্ট কোন পথে চালিত করছে, তার নাম হল আকার। বট-বীজ হচ্ছে বটবৃক্ষের জড়। বট-বীজের অন্তর্নিহিত শক্তি যা বট-বীজকে বটবৃক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা হল বটবৃক্ষের আকার।

God, the Idea of—ঈশ্বর-ধারণা।

ঈশ্বরের ধারণা কিভাবে, কোথা থেকে এবং কখন সৃষ্টি হল, এ নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের আলোচনার অন্ত নেই। কোন কোন দার্শনিক 'ভয় থেকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসের' উৎপত্তি বলে মনে করেন। আবার কেউ ঈশ্বর-বিশ্বাসকে একটা বড় কুসংস্কার বৈ আর কিছু নয় বলেই মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন, অযৌক্তিক ও অলৌকিক বিশ্বাস থেকেই আদিম অবৈজ্ঞানিক যুগে ঈশ্বর-ধারণার সূচনা হয়েছিল। দর্শন তত্ত্বের দিক থেকে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, অনন্ত ও পূর্ণ বলেই আখ্যা দেয়া হয়। ধর্মের দিক থেকে এ ঈশ্বর কেবল অনন্ত, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণই নন; তিনি কল্যাণময় ও প্রেমময়। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যপি ঈশ্বরের ধারণা দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিভিন্ন দার্শনিকের ঈশ্বর-ধারণার কতগুলো এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে, মঙ্গলের ধারণা থেকেই ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি। এরিস্টোটলের মতে, ঈশ্বর হলেন জগতের প্রধান নিয়ামক। প্লটিনাসের মতে, ঈশ্বর হলেন অনির্বচনীয়। স্পিনোজা ঈশ্বরকে এক পরমদ্রব্য বলে মনে করেন। লাইবনিজ ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু বলে আখ্যায়িত করেছেন। হেগেলের মতে, ঈশ্বর হলেন পরমাত্মা বা পরম ধীশক্তি। ব্রেডলী মনে করেন, পরমব্রহ্ম এক পরম-অভিজ্ঞতা। ঈশ্বর পরমব্রহ্মের অবভাস ইত্যাদি।

Hylozists—সপ্রাণ জড়বাদী।

আইওনীয় প্রাচীন দার্শনিকদের মতে, 'জড়' এবং 'প্রাণ' পৃথক হলেও উভয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান। যেখানেই আমরা জড় বস্তু দেখি, সেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান দেখতে পাই। জড় পদার্থের প্রাণ আছে মনে করার জন্যেই এসব দার্শনিকদের সপ্রাণ জড়বাদী বলা হয়। তাঁদের মতে, জড়ই হল মূল উপাদান এবং প্রাণ সব সময়েই জড়ের (hyle) সঙ্গে সংযুক্ত।

Idealism—ভাববাদ।

ভাববাদের মূল সূত্র হল যে, জ্ঞেয় বস্তু মন বা চেতনার উপর নির্ভরশীল। মন বা চেতনই পরম সত্য ও সত্তা। জাগতিক বস্তু হল মন-নির্ভর। মনের অতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তা নেই। জাগতিক বস্তুগুলোর মন-নিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই। মন ব্যতিরেকে বিষয় বা বস্তু ভাবাই যায় না। বাহ্য বস্তু সসীম বা অসীম মনের বিষয়বস্তুরূপে বিদ্যমান। এ মতবাদের নাম ভাববাদ।

Intuition—স্বজ্ঞা।

বহুতাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ্‌দের ধারণা এই যে, বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা বা প্রজ্ঞা সম্বন্ধীয় মননশীলতা দ্বারা জানা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ও দর্শনের চুলচেরা বিচার-বুদ্ধি আমাদেরকে বস্তুর বাহ্যিক জ্ঞান দান করতে সক্ষম। বস্তুর স্বরূপ বা পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে হলে এক বিশেষ বোধি বা স্বজ্ঞার প্রয়োজন। স্বজ্ঞার মাধ্যমেই আমরা সত্তার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে তার স্বরূপ জানতে পারি। স্বজ্ঞা হল কোন বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রতীতি। "স্বজ্ঞা হল সেই বুদ্ধি-সঞ্জাত সহানুভূতি, যার সাহায্যে কেউ কোন বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করে এই উদ্দেশ্যে যে, বস্তুর মধ্যে যা কিছু অসাধারণ এবং অনির্বচনীয়, তার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করবে।"

Irony of Socrates—সক্রেটিস-শ্লেষ।

সাধারণতঃ নঞর্থক দ্বান্দিক পদ্ধতিকেই 'সক্রেটিস্-শ্লেষ' বলা হয়। কারণ, সক্রেটিসই এ পদ্ধতির প্রবর্তক। এ পদ্ধতি দিয়ে প্রতিপক্ষ মতকে খণ্ডন করা হয়। সক্রেটিস প্রশ্নবাণে প্রতিপক্ষ মতবাদের মধ্যে যে অসংগতি বা অন্তর্বিরোধ আছে, তা প্রকাশ করে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে পরোক্ষভাবে স্বীয় মতকেই প্রতিষ্ঠিত করতেন। গ্রীসের কূটতার্কিক বা সফিস্টদের মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য সক্রেটিস প্রায়শঃই এ পদ্ধতিকে ব্যবহার করতেন। উত্তরকালে এ পদ্ধতিই 'সক্রেটিসের শ্লেষ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

Justice—ন্যায় ঃ ন্যায়পরায়ণতা।

প্লেটোর মতে—বিজ্ঞতা, সাহস, বদান্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা হ'ল মানব জীবনের মৌলিক মহৎ গুণ। এর মধ্যে এদের তিনটি,—বিজ্ঞতা, সাহস ও বদান্যতা আত্মার তিন অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। আত্মার তিন অংশ যখন সমভাবে সুসংগতরূপে পারস্পরিক সহযোগিতায় সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করে, তখনই সৃষ্টি হয় 'ন্যায়পরায়ণতার'। ন্যায়পরায়ণতা হ'ল এ ত্রিগুণের সমষ্টি বা ঐক্যতান। ত্রিগুণের ঐক্যতানেই উৎপত্তি হয় নতুন আরেক গুণ এবং সেটাই হল 'ন্যায়পরায়ণতা।'

Knowledge, Theory of—জ্ঞান-মতবাদ।

জ্ঞান বলতে সাধারণতঃ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনা সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় বা স্পষ্ট ধারণা বুঝায়। বিশেষ অর্থে, জ্ঞান আবার পাণ্ডিত্যকেও বুঝায়। 'জ্ঞান-মতবাদ' দর্শন শাস্ত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দার্শনিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। জ্ঞান-মতবাদের চারটি স্তর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ (১) বুদ্ধিবাদ, (২) অভিজ্ঞতাবাদ, (৩) বিচারবাদ এবং (৪) স্বজ্ঞাবাদ।

Love, Platonic—প্লেটোনিক-প্রেম।

প্লেটো তাঁর প্রেম বা প্রণয় (Eros) মতবাদে আত্মার সমস্ত ক্রিয়াবলীকে দর্শনের অধীন করে রেখেছেন। প্রেম সৌন্দর্য সম্বন্ধীয়। প্লেটোর ধারণা, জন্মের পূর্বে আত্মা বিদেহী অবস্থায় ভাবজগতের চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন ছিল। ইন্দ্রিয়জগতে প্রবেশ করার সাথে সাথে আত্মার ভাবজগতের স্মৃতির বিস্মৃতি ঘটে। কিন্তু সুন্দর বস্তুর অবলোকনে আত্মা তার সেই ভাবজগতের স্মৃতিকে স্মরণ করতে পারে। কারণ, সুন্দর বস্তু ভাবজগতের সৌন্দর্যভাবেরই প্রতিলিপি। এক সুন্দর বস্তুর প্রতি অনুরাগের ফলে আত্মা অন্যান্য বস্তুকেও ভালবাসতে শিখে। এভাবে

ভালবাসা ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে 'সৌন্দর্যভাব' এবং 'ভাবজগতের' প্রতি আত্মা অনুরক্ত হয়ে উঠে। ভাবজগতের অনুরাগ থেকে আত্মা ক্রমশঃ তত্ত্ব বা দর্শনসম্বন্ধীয় হয়ে ওঠে। প্লেটোর এ ধারণাকেই 'প্লেটোনিক প্রেম' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

Materialism—জড়বাদ।

জড়বাদ জড়কেই জগতের একমাত্র সত্তা বলে মনে করে। এ জগতের সব কিছুই জড় থেকে উদ্ভূত। প্রাণ বা মনের উৎপত্তিও এ জড় থেকেই। গতি বা আকর্ষণ হচ্ছে জড়ের ধর্ম। জড়বাদ ও ভাববাদ হচ্ছে পারস্পরিক বিরুদ্ধ মতবাদ। জড়বাদের মতে জড় এবং ভাববাদের মতে একমাত্র মনই হল পরমসত্তা। জড়বাদী-দর্শনে জড়ই ভাববাদের মনের স্থান অধিকার করে আছে।

Monism—অদ্বৈতবাদ ঃ একেশ্বরবাদ।

এ মতবাদ অনুসারে, পরম সত্তা হল এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্ব-নির্ভর বা স্বয়ম্ভু। জগতের 'বহু' বস্তু ও সসীম মন স্ব-নির্ভর সত্তা নয়। তাদের অস্তিত্ব এ পরম সত্তার উপর নির্ভরশীল। অদ্বৈতবাদের বহুবিধ রূপ আছে ঃ (১) কেবল অদ্বৈতবাদ, (২) সাপেক্ষ অদ্বৈতবাদ ও (৩) মূর্ত অদ্বৈতবাদ।

Mysticism—রহস্যবাদ।

হৃদয়ের যে বৃত্তির দ্বারা তত্ত্ব-সাক্ষাৎ করা যায়, তাকেই সাধারণতঃ রহস্যবাদ বলা হয়। সাধারণ মানুষের নিকট এবৃত্তি রহস্যজনক বলেই এর এমন নাম। বহির্জগতের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যখন চরমতত্ত্বের ভাবনায় তন্ময় হয়ে পড়ি, তখনই আমাদের মনের এক সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে এবং চরমতত্ত্বের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ মিলন ঘটে। হৃদয়ের সঙ্গে চরম তত্ত্বে এ যোগসাধন ক্ষণিকের জন্যে হলেও তা মানবের জন্যে এক অপূর্ব আনন্দময় মুহূর্ত। হৃদয়ের এ অনুভূতিরই আরেক নাম হল রহস্যবাদ।

Nous—চেতস।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এ্যানাক্সেগোরাসের মতে, পরমাণুর কোন সঞ্চালক শক্তি নেই। তাঁর মতে, 'চেতস' নামক বিশেষ ধরনের এক পদার্থ পরমাণুর ভেতর গতি সঞ্চার করে থাকে। চেতস জড়াত্মক না আধ্যাত্মিক, এ সম্বন্ধে দার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে একথা অনিস্বীকার্য যে, এ্যানাক্সেগোরাসের এ 'চেতস' জড়বাদী প্রাচীন গ্রীকদর্শনের ভাবধারাকে ভাববাদের দিকে টেনে নিতে সাহায্য করেছে।

Outology—তত্ত্ববিদ্যা।

এ বিশ্বের পেছনে কোন শাশ্বত চিরন্তন সত্য রয়েছে কিনা, থাকলে তা এক না বহু, নাকি এক হয়েও বহু বা বহু হয়েও এক; তা'কি জড়াত্মক না আধ্যাত্মিক, তা'কি সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ—এ সব প্রশ্নের সমস্যা নিয়ে দর্শনের যে শাখা আলোচনা করে, তা'কেই তত্ত্ব-বিদ্যা বলা হয়। তত্ত্ব-বিদ্যা দর্শনেরই এক বিশেষ শাখা।

Pantheism—সর্বেশ্বরবাদ।

[Pan=all (সব) theos=God (ঈশ্বর)]

সর্বেশ্বরবাদ মতে, ঈশ্বরই সব এবং সবকিছুই ঈশ্বর। এই মত অনুসারে, জগত সৃষ্টির পর ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে জগতের অন্তর্বর্তী বা জগতের অন্তরে আছেন। ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। জগত ও ঈশ্বর এক। সমস্ত শান্তসত্তা ঈশ্বরের পরমসত্তায় মিশে আছে। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জগতের কোন পৃথক সত্তা নেই। ঈশ্বর পরম দ্রব্য। স্পিনোজা সর্বেশ্বরবাদের একজন প্রখ্যাত সমর্থক।

Quality—গুণ।

সাধারণ মানুষ গুণের আশ্রয়রূপে দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে। গুণের অবশ্য নিজস্ব কোন স্বকীয় সত্তা নেই। গুণ অর্থই হল কোন না কোন দ্রব্যের গুণ এবং কোন না কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে আছে। গুণের আধারকে দ্রব্য বলা হয় এবং বস্তু হল দ্রব্য ও গুণের সমষ্টি।

Rationalism—বুদ্ধিবাদ।

এ মতবাদ অনুসারে, বুদ্ধিই আমাদেরকে যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে। বুদ্ধিই জ্ঞানলাভের একমাত্র প্রধান উপায়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বস্তুর বাহ্যিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হলেও বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। বুদ্ধিই একমাত্র আমাদেরকে যথার্থ, শাশ্বত ও সনাতন জ্ঞান দান করতে সক্ষম। বুদ্ধিবাদীদের মতে, আমাদের বুদ্ধিতেই এমন কতগুলো ধারণা ও সত্য রয়েছে, যেগুলো স্বতঃসিদ্ধ, অবশ্যস্বীকার্য এবং সন্দেহাতীত।

Scepticism—সংশয়বাদ।

সংশয়বাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, মানুষের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ মোটেই সম্ভব নয়। তাঁদের মতে, মানবজ্ঞান আপেক্ষিক ও বিশেষ। আর এমন আপেক্ষিক ও বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা জগত-সত্তা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এমন আপেক্ষিক জ্ঞানের দ্বারা সার্বিক ধারণা করাও সম্ভব নয়। তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকেই সত্যের সীমারেখা বলে মনে করেন। প্রখ্যাত সংশয়বাদী হিউম মনে করেন, যা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাকেই শুধুমাত্র আমরা জানতে পারি। আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় বা সংবেদনেই সীমাবদ্ধ। দ্রব্য, মন ও ঈশ্বর এদের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না বলে সংশয়বাদীরা তাদের সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ সম্ভব নয় বলেই মনে করেন। মানব জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ-জগতে সীমাবদ্ধ বলে আমাদের পক্ষে সর্বজনগ্রাহ্য এবং নিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব।

Subjectivism—আত্মগত ভাববাদ।

এ মতবাদ অনুসারে, মনেরই শুধু সত্তা আছে; বাহ্যবস্তুর প্রকৃত সত্তা নেই। ধারণা ব্যতিরেকে বস্তুকে প্রত্যক্ষ জানা সম্ভব নয়। মন ধারণার বাইরে কোন অদৃশ্য অর্থাৎ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু নেই।

আমরা যা সাক্ষাৎভাবে জানি, তা' মনের ধারণা বৈ আর কিছু নয়। বাহ্যবস্তুর সত্তা মন বা ধারণার উপরই নির্ভরশীল। "অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর।" মনের প্রত্যক্ষণের উপরই বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। মন ও মনের ধারণা ছাড়া কোন বস্তুর প্রকৃত সত্তা নেই। এ মতবাদকেই আত্মগত ভাববাদ বলা হয়।

Substance—দ্রব্য।

গুণ যাকে আশ্রয় করে থাকে, সাধরণতঃ তাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্যকে গুণ থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয়। যেমন—টেবিল। টেবিলের গুণগুলো হচ্ছে, তার রং, আকার ও ওজন। টেবিলের দ্রব্যত্ব হল এ গুণগুলোর আধারবিশেষ। টেবিল বলে যদি একটা কিছু না থাকে, তবে গুণগুলো কোন্ আশ্রয়ে থাকতে পারে? টেবিলের গুণগুলো একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র থেকেও একই আশ্রয়ে গাঁথা রয়েছে। এ আশ্রয়ই হল দ্রব্য। দ্রব্যের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে।

Teleology—উদ্দেশ্যবাদ : পরিণতিবাদ।

Teleology শব্দটি গ্রীক শব্দ Telos থেকে গৃহীত। Telos শব্দের অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্য বা পরিণতি। উদ্দেশ্যবাদ মত অনুসারে, এ জীবজগত এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সৃষ্টি হয়েছে। এ জগত হচ্ছে এক নিয়ম ও শৃংখলার জগত। এখানে কোন অনিয়ম বা অরাজকতার স্থান নেই। কারণ, জগত একটা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই তার পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের প্রতি স্তরেই এক উদ্দেশ্য নিহিত —এর গতি পরিণতির দিকে।

Ultimate Reality—পরমসত্তা : চরমসত্তা।

সাধারণতঃ ভগবান বা ঈশ্বরকেই পরমসত্তা বলে অভিহিত করা হয়। জীবাত্মা এ পরমসত্তায় নিজেকে উৎসর্গ করতে সদাসর্বদাই ব্যস্ত। এ পরমসত্তাকে কেন্দ্র করেই মানব জীবন ধাবিত। এ পরম-সত্তায় মিলনেই মানবের সুখ-শান্তি ও পরমানন্দের বিকাশ ঘটে।

বিভিন্ন দার্শনিকগণ এ পরমসত্তাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন।

Virtue—মহত্ত্ব।

Virtue শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে বীরত্ব বা শৌর্য। কিন্তু গদর্শনে virtue শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। নৈতিক দর্শনে virtue শব্দের অর্থ হল মহত্ত্ব। মহত্ত্ব হল সদাভ্যাস। সদাচরণ অভ্যাসকেই মহত্ত্ব বলা হয়। মহত্ত্ব কোন জন্মগত বা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য নয়। মহত্ত্ব হল এক অর্জিত সম্পদ বা ধর্ম ; যা মানুষকে আদর্শসম্মত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পশুজীবনের ভোগ-বিলাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আদর্শসম্মত আচরণকে অভ্যাসে পরিণত করে মানুষ আদর্শ চরিত্র বা মহত্ত্ব অর্জন করে। আদর্শ চরিত্র বা সদাচরণের অভ্যাসই হল মহত্ত্ব।

Water as First Principle—আদি উপাদান হিসেবে পানি।

গ্রীস্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে প্রাচীন গ্রীস দেশের আইওনীয়া নামক দ্বীপের অধিবাসী সুবিখ্যাত থেলিস প্রচার করেন যে, "পানিই হচ্ছে বস্তুর আদি উপাদান।" পানি থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি এবং পানিতে সব কিছু লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু পানি অপরিবর্তনীয় রূপেই বিরাজ করছে। দ্বীপবাসী থেলিসের পক্ষে এরূপ চিন্তা স্বাভাবিক হলেও পানি থেকে যে কি উপায়ে বিভিন্ন জাগতিক বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে, তার কোন যথাযথ ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নি।

Xenophanes of Colophon—কলোফনবাসী জেনোফিনিস।

জেনোফিনিস আনুমানিক গ্রীস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পীথাগোরাসের সমসাময়িক এবং এ্যানাক্সিমেন্ডারের শিষ্য। তিনি একজন কবি ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি দেশ পরিভ্রমণ করতে ভালবাসতেন পঁচিশ বৎসর হতে সাতষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি গ্রীসের নানা জায়গা ঘুরে বেড়ান। বিরানব্বই বৎসর পর্যন্ত তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন বলে কথিত হয়। তিনি জাতীয় দেব-দেবীরপ্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। তিনি

তাঁর স্বাভাবিক মধুর ভাষায় একেশ্বরবাদ প্রচার করে গিয়েছেন। ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তিনি ধারণার দ্বারা জগতকে শাসন করছেন।

Yoga Philosophy—যোগদর্শন।

যোগ শব্দটি সাধারণতঃ মানস বা মনন সংযমকে বুঝায়। মহর্ষি পতঞ্জলের মতে, যোগ অর্থ হল চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা বিবেকক্রিয়ার সংযম। মহর্ষি পতঞ্জল যোগদর্শনের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারে এই দর্শনের নাম অনেক সময় 'পাতঞ্জল দর্শন' নামেও পরিচিত। বিবেক-জ্ঞানের মাধ্যমে যোগসাধনা করে ব্যক্তির মুক্তি কিভাবে সম্ভব, এই সুর সমগ্র যোগদর্শনে ছড়িয়ে আছে। যোগদর্শনে যোগ হল সমস্ত মানসিক কর্মের অবসান। মানসিক বর্ম অথবা চিত্তবৃত্তি নিরোধে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং অবিবেক-জ্ঞান দূর হয়ে বিবেকজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত কৈবল্য লাভ ঘটে। যোগসাধনে ব্রতী হয়ে কৈবল্য লাভ করাই হল যোগদর্শনের মূল তত্ত্ব। সকল প্রকার রহস্যময়তা দূর করে দিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্যানুসন্ধানের প্রেরণা দেয় এ যোগদর্শন।

Zeno of Elea—ইলিয়ার জেনো।

ইলিয়াবাসী জেনো ইলিয়াটিক্স সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৪৮৯ অব্দে তাঁর জন্ম। তিনি কবিতা রচনার মাধ্যমে দর্শনের পুষ্টিসাধনে সচেষ্ট হন। পারমানাইডিসের 'সত্তা' মতবাদে তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। তাঁর মতে, সত্তা এক; এর মধ্যে কোন বহু নেই। সত্তা অনড় ও অপরিবর্তনীয়; এর কোন গতি নেই। 'বহু' ও 'গতি' বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি দর্শনেতিহাসে এক প্রসিদ্ধ স্থান দখল করে আছে।

Zeno, the Stoics—জেনো।

জেনো খ্রীস্টপূর্ব ৩৪২ অব্দে এক ভেনিসীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈরাগ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতে, ঘটনামাত্রই স্বভাব বা

নিয়তির অধীন এবং স্বভাব বা নিয়তির মূলে অনন্ত প্রজ্ঞা। বিশ্বব্যাপী একমাত্র বিধি নিত্য বিরাজমান। সৃষ্টি মাত্রই এ বিধির অনুবর্তন করতে বাধ্য। এ বিধির বিধানে মানবের বিবেক-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত। বিবেক-বুদ্ধি এবং জাগতিক নিয়মে প্রকৃতগত পার্থক্য নেই। মূলতঃ এটাই হল জেনোর তত্ত্ব-দর্শনের প্রকৃত কথা।